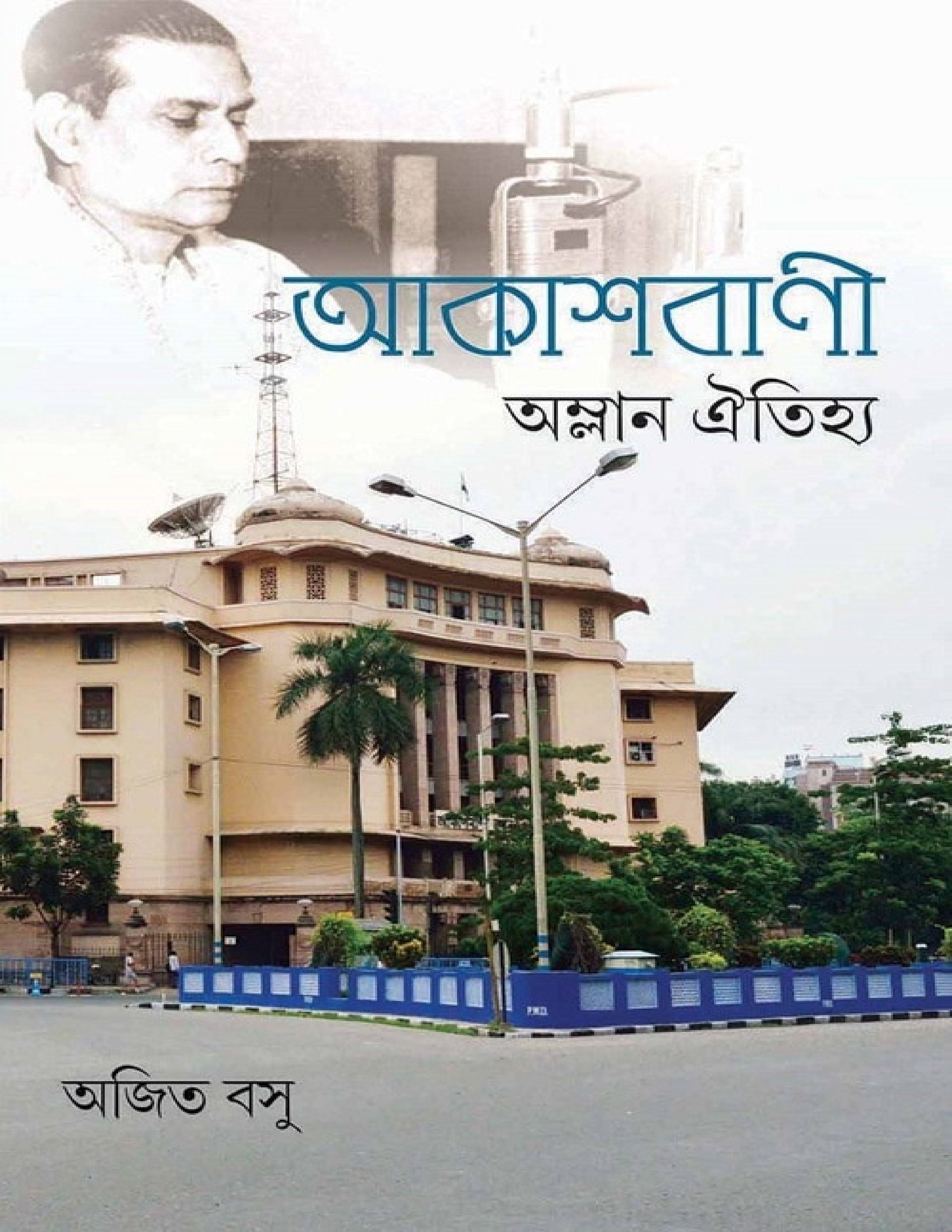


আকাশবাণী

অম্লান ঐতিহ্য

অজিত বসু

আকাশবাণী : অম্লান ঐতিহ্য

আকাশবাণী : অম্লান ঐতিহ্য

অজিত বসু

পা রু ল

পা রু ল

পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ মে, ২০১৫

ISBN 978 93 85555 06 0

বর্ণসংস্থাপক পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

মুদ্রণ চারু প্রেস ১১৩বি ধনদেবী খান্না রোড কলকাতা ৭০০০৫৪

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
বন্ধুবরেষু

প্রকাশকের নিবেদন

ছোটোবেলা থেকে বেতারই ভরিয়ে রাখত আমাদের বিনোদনের জগৎ। বিজন বসুর সংবাদপাঠ, ইন্দিরা দেবীর 'শিশুমহল', জয়ন্ত চৌধুরীর 'গল্পদাদুর আসর' পঙ্কজকুমার মল্লিকের 'সংগীত শিক্ষার আসর', শুক্রবার রাত ৮টার নাটক সব যেন আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর বেতারের জয়যাত্রা যখন শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই, তখনও নিশ্বাসে, স্পন্দনে, চেতনায়, মননে তার আদ্যন্ত উপস্থিতি। ভিসুয়াল মিডিয়ার দুরন্ত দাপটেও তার মহিমা ও দীপ্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেকালে বিনোদন মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল বেতার। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে বেজে উঠত বেতারের সিগনেচার টিউন। সেযেন এক অমোঘ আহ্বান। টানে, আজও টানে।

বেতারের পরই ছিল চলচ্চিত্র। আর ছিল উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন এবং আধুনিক গানের জলসা। পরাধীনতার জ্বালা ছিল। অবশ্য আমরা তো স্বাধীন ভারতেই জন্মেছি।

১৯৪৭-এ কলকাতার সোদপুর আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে ভাষণ দিলেন মহাত্মা গান্ধি। তখনও টেপ রেকর্ডিং চালু হয়নি। ডিস্কে রেকর্ড করা হল নিখুঁতভাবে। এ সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্র-অধিকর্তা অশোককুমার সেন। শ্রী সেনই প্রথম রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে আকাশবাণীতে গারস্টিন প্লেসে নিয়ে আসেন। তা ছাড়া বেতারের কর্মকান্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন, রবীন্দ্র তিরোধানের পর বেতার থেকে আবৃত্তি করেন 'রবিহারা', গানে সুর দিতেন, শেখাতেন ছাত্রছাত্রীদের।

কিন্তু বেতারের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠান হল প্রতিবছর মহালয়ায় প্রত্যুষে বীরেন্দ্র-বাণী-পঙ্কজ ত্রয়ীর অমর সৃষ্টি 'মহিষাসুরমর্দিনী'।

২

নানারকম কাজের ফাঁকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি টান, এ আমাদের মজ্জাগত। তাই বেতার সম্পর্কিত এই গবেষণার প্রস্তাবটি বিবেচনা করে আমরা এটি প্রকাশের পরিকল্পনা করি। গ্রন্থটি লেখক লিখেছেন চল্লিশ বছর গবেষণার পর। ১৯২৭ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত বেতারের নানা কর্মকান্ডের সরেজমিন তথ্য পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে, পাওয়া যাবে নানা পালাবদলের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা এক ইতিহাস, যা হয়তো বিস্তৃতভাবে অনেকেরই জানা নেই।

সর্বশেষ বিচারক পাঠক। তাঁদের ভালো লাগলেই সমস্ত সার্থক। ভালো লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

লেখকের কথা

ছোটোবেলা থেকে রেডিয়ো শুনতাম। বিশেষত নাটক, পরের দিন পরীক্ষা থাকলেও। শুনতাম বিজন বসু, বিভূতি দাস ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপাঠ। পল্লিমঙ্গল আসর, শিশুমহল, মহিলামহল, সাহিত্যবাসর (পরে নাম হয় 'শ্রবণী', তারপর 'অভিজ্ঞান', শেষে 'শ্রবণী' নামটিই ফিরে আসে) শুনতাম, শুনতাম 'গল্পদাদুর আসর'-এ জয়ন্ত চৌধুরীর ধারাবাহিক উপন্যাস পাঠ 'লালু ভুলু' এবং লীলা মজুমদারের 'মহিলামহল-এ' ধারাবাহিক উপন্যাস 'ঝাঁপতাল'—সেই অসামান্য পাঠ আজও কানে বাজে। প্রসঙ্গত বলি, এই গল্পদাদুর আসরের প্রথম গল্পদাদু ছিলেন যোগেশচন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের উকিল, মস্ত গোঁফ ছিল তাঁর, তিনি অনুষ্ঠান শুরু করতেন Calcutta Calling, Good Evening Children.... বলে।

'সাহিত্যবাসর' একসময়ে প্রযোজনা করতেন তৎকালীন 'সাহিত্য শলাহকার' প্রেমেন্দ্র মিত্র। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একবছরের জন্য নাট্যপ্রযোজক ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

তখনকার দিনে বাইরে থেকে অনেক ছেলেমেয়ে বেতারে গল্প, কবিতা, ছড়া পাঠাত। সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখে কাউকে কাউকে বেতারে পাঠ করে শোনাবার জন্য ডাকা হত। আবার এদের কেউ প্রয়াত হলে বেতারে শোক জানানো হত।

বেতার শুনে তখনকার অনেক ধনী ব্যক্তি বেতার নাটকে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার দিতেন। এমনি পুরস্কার পেয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

বীরেন ভদ্র তখন দশ হাতে কাজ করতেন। ঘোষণা, নাট্যপ্রযোজনা, মহিলামজলিশ কী নয়। আবার কোনো নির্ধারিত কথিকাকার অনুপস্থিত হলে সেই বিষয়ে তিনিই কথিকা বলে যেতেন, এমনকী রবীন্দ্রসংগীতের নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে গান পর্যন্ত গেয়ে দিতেন। ভাবতে পারেন!

বেতারের প্রথম যুগে সাহিত্যকদের মধ্যে অনুষ্ঠান করতেন সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, জলধর সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, মন্মথ রায় প্রমুখ। পরিমল গোস্বামী বেতারের নানা অনুষ্ঠানের ছবি তুলে রাখতেন। তখনকার 'বেতার জগৎ'-এর প্রচ্ছদে তৎকালীন বেতারকর্মীদের অনেকের ছবি ছাপা হয়েছিল, হুঁকোহাতে দাদাঠাকুরের ছবিও। প্রথমযুগের নাটকে প্রায় নিয়মিতই অভিনয় করতে আসতেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, নবদ্বীপ হালদার, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, রঞ্জিত রায় প্রমুখ।

স্ত্রী চরিত্রে বেতারে অভিনয় করতেন রাজলক্ষ্মী, উষাবতী, পদ্মাবতী, শান্তি গুপ্তা, প্রফুল্লবালা, আবীরবালা, চারুবালা, আঙুরবালা, নিভাননী, বেলারানি, সুহাসিনী, হরিমতী, কঙ্কাবতী, সাবিত্রী, রাধারাণী প্রমুখ। তারও আগে যখন বেতারে এত লোক ছিল না—তখন প্রয়োজনে সবাইকেই অভিনয় করতে হত। এমনি অভিনয় করেছেন বিজন বসু, বাণীকুমার থেকে কে নয়!

২

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনেক নিয়মকানুন তৈরি হয়েছিল সেকালের বেতারে। অনুষ্ঠান প্রচারের রেকর্ড রাখার জন্য শুরু হয়েছিল লগবুক লেখা। অনুষ্ঠানের মান ও শিল্পীদের পারফরম্যান্স সম্পর্কে রিপোর্ট দিত ডিউটি অফিসার, সেই রিপোর্ট প্রোগ্রাম মিটিং-এ চূড়ান্ত হলে তা শিল্পীদের ইনডেক্স কার্ডে নথিভুক্ত করা হত। এই

কার্ডেই লেখা থাকত শিল্পী কবে কবে কী অনুষ্ঠান করেছেন—লেখা থাকত অনুষ্ঠানের মান ও বুকিং ফ্রিকোয়েন্সি। ফলে কার্ডটি থেকেই শিল্পী সম্পর্কে সব কিছু জানা যেত।

শোনা যায়, এই সমস্ত নিয়মকানুন তৈরি করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অবসর নেওয়ার পরও তিনি এ কালের অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন, প্রয়োজনে নতুন প্রযোজককে কিছুটা অযাচিতভাবেই উপদেশ দিতেন। না দিয়ে পারতেন না।

আসলে সেযুগে ছিল প্রাণ, কিছু গড়বার আকুতি। একাগ্রভাবে নিজেকে যোগ্য করে তোলবার জন্য তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করতেন। এবং অনায়াসেই শ্রোতার মন জয় করে নিতেন।

আমাদের সৌভাগ্য আমরা পেয়েছিলাম প্রযোজক হিসেবে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি জি যোগ, গোপাল দাশগুপ্তকে। আমাদের চারপাশে ছিল দিকপাল সব সংগীতজ্ঞ -কেরামতউল্লাহ খাঁ, সাগিরুদ্দিন খাঁ, শ্যামল বোস, চন্দ্রকান্ত নন্দী, অলোকনাথ দে, গৌর গোস্বামী, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়লাল চৌধুরী, কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ। আর প্রথম দিকে সংগীতবিভাগকে অসাধারণ মানে উন্নীত করেছিলেন একা রাইচাঁদ বড়াল। তিনি যুক্ত ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিয়োর সঙ্গে। বেতার থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়মরক্ষার জন্য তিনি নিতেন মাত্র এক টাকা।

বেতারকে ভালোবেসে বেতারের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন প্রথম যুগের কর্মীরা। আজ তারা নেই। কিন্তু তাঁদের নিঃস্বার্থ অবদানকে সম্বল করেই এগিয়ে চলেছে বেতার সম্প্রচার-যা সাতাশি বছর পেরিয়ে চলেছে শতবর্ষপূর্তির দিকে।

কলকাতা বেতারের ঘোষক হয়েও চাকরির প্রথম দিন থেকে আমার নেশা ছিল এর ইতিহাস খুঁজে বেড়ানো। কত তথ্য পেয়েছি, কত প্রমাণ কত যাচাই, মূল্যায়ন এইভাবেই লেখা হল এই গ্রন্থ, যা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন পারুল প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রী গৌরদাস সাহা। তাঁর সহৃদয় আনুকূল্য নইলে এ গ্রন্থ বেরোত কিনা সন্দেহ।

আমার বহুকালের অকৃত্রিম সুহৃদ ও প্রিয়জন শ্রীবংশীবদন চট্টোপাধ্যায় আমাকে গৌরবাবুর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এই গ্রন্থপ্রকাশে তাঁর সহৃদয় প্রয়াস কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আশাকরি, আমার প্রিয় পাঠকবৃন্দ গ্রন্থটি সম্পর্কে আগ্রহী হবেন। ধন্যবাদ। নমস্কার।

সূচি

আকাশবাণী কলকাতা

বেতার সম্প্রচারের সূচনাপর্ব : এক নস্টালজিয়া

আজ নয়, এই মুহূর্ত নয়, এই ব্যস্ত কোলাহলমুখর ধূলিধূসরিত, মানুষে মানুষে ঠেলাঠেলি করে পথ চলা, যানজট, মিছিল, অবরোধ, অবস্থান ধর্মঘট এসব ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি বহুকাল আগে, ১৯২৭-এ, যে-বছরের ২৬ আগস্ট শুরু হয়েছিল কলকাতার বেতার সম্প্রচার। তখন পরাধীন দেশ, মানুষের এত ব্যস্ততা ছিল না, ছিল না নানান মিডিয়ার রমরমা—তাই বেতারই ছিল মানুষের মনোরঞ্জনের এক ও অদ্বিতীয় মাধ্যম—যা ঘরে ঘরে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যেত। অবশ্য বাংলা রঙ্গমঞ্চে তখন নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির মৌলিক চিন্তাভাবনায় নানা দিক থেকেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। চলচ্চিত্রও খুঁজছে তার পায়ের তলার মাটি।

তখন মানুষের একমাত্র স্বপ্ন ও শপথ ছিল দেশকে স্বাধীন করা। তখনকার কলকাতা ছিল শান্ত। ময়দান ছিল ফাঁকা, মনুমেন্টের পাশে হত সভা-সমিতি, আবার এই মনুমেন্টই ছিল ভবঘুরে বেকার যুবকদের বিশ্রামের জায়গা। গাড়ি বলতে ট্রাম, একতলা-দোতলা বাস ছাড়া ছিল মোটর গাড়ি এবং অসংখ্য ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশা। ১৯২৭-এর আগে বেতার সম্প্রচার হত হাইকোর্টের কাছে টেম্পল-চেম্বার বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোরে। ওই টেম্পল-চেম্বারে সেকালে গান গাইতেন হীরেন্দ্রকুমার বসু, আঙুরবালা, পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রমুখ। গান হত, নাটক, আবৃত্তি হত—কত কী! রাস্তা সন্ধের পর থেকেই ঝিমঝিম করত গ্যাসের আলোয়। তখন ইলেকট্রিক আসেনি। ছোটো ছোটো পড়ুয়া ছেলের দল হ্যারিকেনের আলোয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করত।

একটু এগিয়ে আসি—১৯২৯-এ। এই সময় থেকে বেরোতে আরম্ভ করে 'বেতারজগৎ'। দাম ছিল এক আনা। প্রচ্ছদে লেখা থাকত 'Organ of the Calcutta Station'। বেতারকে বলা হত 'ঘোষণা-মন্দির'। 'বেতারজগৎ'-এর বার্ষিক মূল্য ছিল একটাকা চোদ্দো আনা, ভি.পি. ২ টাকা দু-আনা।

তখনকার বেতারে সময় ঘোষণা হত কর্পোরেশনের ঘড়ি অনুসারে। এখন কিন্তু তা হয় না। এখন বিভিন্ন প্রচার কেন্দ্রে ঘড়ি মেলায় দিল্লির সঙ্গে, দিল্লি মেলায় গ্রিনউইচ মিন-টাইম থেকে।

তখন তো এত অনুষ্ঠান ছিল না, কিন্তু সীমিত এক ঘণ্টার ভারতীয় অনুষ্ঠানেই প্রচার করা হত কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, উচ্চাঙ্গসংগীত, হাসির গান, কৌতুক এবং আবৃত্তির নানা অনুষ্ঠান। গান গাইতেন হীরেন্দ্রকুমার বসু (ইনি সেকালে নাটক লিখতেন, নাট্যপরিচালনা করতেন এবং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতেন), আঙুরবালা, পঙ্কজকুমার মল্লিক, পুষ্পরানি চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মহম্মদ উনাস খাঁ, জ্ঞান ঘোষ, মিস প্রফুল্লবালা, মিস আভাবতী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মুস্তাক আলি খাঁ বাজাতেন সেতার এবং ভারতীয় অনুষ্ঠানের ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার বাজাতেন ক্ল্যারিয়োনেট।

'মহিলা মজলিশ' বলে মহিলাদের জন্য একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বিষ্ণুশর্মা এই 'মহিলা মজলিশ'-এ আলোচনা করতেন রকমারি রান্না নিয়ে। এ ছাড়া এই অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নিয়ে, ঐতিহাসিক ঘটনা, সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা হত। এই অনুষ্ঠানটি সেকালে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল শ্রোতার কাছে। এ ছাড়া ছিল ছোটোদের বৈঠক—যার পরিচালক ছিলেন গল্পদাদা যোগেশচন্দ্র বসু। ইনি ছিলেন হাইকোর্টের উকিল এবং নৃপেন মজুমদারের বন্ধু। গল্পদাদা আফিম খেতেন। বড়ো গোঁফ ছিল তাঁর। ইনি অনুষ্ঠান শুরু করতেন 'Calcutta Calling—Good Evening Children' বলে। ১৯৩৩-এ গল্পদাদার প্রয়াণের পর এই আসরের দায়িত্ব নেন ক্রমান্বয়ে তাঁর পুত্রদ্বয় কমল বসু এবং নির্মল বসু। গোড়া থেকেই ভারতীয় অনুষ্ঠানে যেমন ধর্মবিষয়ক কথাবার্তা প্রচার করা হত, তেমনি

ছিল ‘স্টেশন-অর্কেস্ট্রা’ বলে একটি অনুষ্ঠান, ছিল হাসির গান, আবৃত্তির অনুষ্ঠান এবং সন্ধে সাড়ে সাতটায় আবহাওয়ার বিজ্ঞাপন, সংবাদজ্ঞাপন, বাজারদর, পাট ও গানির দর ইত্যাদি। খবর পড়তেন বিজন বসু। এ ছাড়া কলকাতা কেন্দ্র থেকে তখন ওড়িয়া সংবাদ প্রচার করা হত—পড়তেন যতীন দাস।

ইউরোপীয় অনুষ্ঠানে পাম কোর্ট কনসার্ট, গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে রিলে করা হত। ‘উপাসনা’ বলে ইউরোপীয় আরও একটি অনুষ্ঠান রিলে করা হত সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল থেকে। ৮ ডিসেম্বর ১৯২৯-এ ছিল রাইচাঁদ বড়ালের পিয়ানোবাদন। এই সময়ে বেতারে ‘দি লিসনার্স ক্লাব’ বলে একটি ক্লাব গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীকালে এরই নাম হয় ‘বেতার নাটুকে দল’ বা ‘এ. আই. আর. আর্টিস্টস’। ১৯২৯-এর ২৭ নভেম্বর রবিবার প্রচার করা হয়েছিল নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘ঝড়ের হাওয়া’ নাটকটি। এর অধিনায়কত্বে ছিলেন অনাথ মুখোপাধ্যায়।

তখন চারটি পর্বে অনুষ্ঠান প্রচারিত হত—প্রাতঃকালীন, দ্বিপ্রাহরিক, বৈকালিক এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান—তখনও কিন্তু ‘অধিবেশন’ কথাটি চালু হয়নি। অনুষ্ঠান শেষে রোজই বলা হত God save the king। মনে রাখতে হবে, তখনও পর্যন্ত এই প্রচার ব্যবস্থা ছিল Indian Broadcasting Company-র অধীনে এবং কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন মি. জে. আর. স্টেপলটন। ১৯২৯-এর ৯ নভেম্বর, শনিবার গান গাইতে এসেছিলেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ও ধীরেন্দ্রনাথ দাস। এই ধীরেন দাস কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি বেতারনাটকে যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয়ও করেছেন।

এই সময়ের বেতারে বাংলা ও হিন্দি গানের পাশাপাশি প্রচার করা হত উর্দু হাসির গান এবং গজল। ১৯২৯-এর ১২ নভেম্বর প্রচার করা হয় কাজি নজরুল ইসলামের স্বকণ্ঠে আবৃত্তি। উচ্চাঙ্গসংগীত, বিশেষ করে ধ্রুপদ ও ধামার প্রচারে সেকালের বেতার কর্তৃপক্ষ খুবই সজাগ ছিলেন। ২২নভেম্বর ১৯২৯ এই সূত্রেই সংগীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাপদ চক্রবর্তীও এই সময় থেকেই বেতার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। নলিনীকান্ত সরকারও এই সূচনাপর্বে তাঁর হাসির গানের মাধ্যমে বেতার শ্রোতার প্রিয় হয়ে ওঠেন। গানের পাশাপাশি কথিকা বা সেকালের ভাষায় ‘বক্তৃতা’ করতে আসতেন যশস্বী সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা। ১৯২৯-এর ৯ ডিসেম্বর হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে এসেছিলেন রায় জলধর সেন বাহাদুর। ১২ ডিসেম্বর ১৯২৯ বেতারে স্বরচিত গল্প পাঠ করেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

প্রথমদিকে শুক্রবার রাত ৮টায় প্রচারিত হত বেতারনাটক। পরে সেটা শুক্রবারই রাত ৭-৪৫ মিনিটে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। এবং আরও পরে ৭-৩০ মিনিটে নাটক সম্প্রচার শুরু হয়। নাটক হত তিন ঘন্টা ধরে। রঙ্গমঞ্চ থেকে রিলেও করা হত মাঝে মাঝে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনেক নাটক সরাসরি মঞ্চ থেকে রিলে করা হয়েছিল।

বৈঠকি গান প্রচারের প্রয়াসও এই সময়ে খুবই লক্ষ করা যায়। বেতার সম্প্রচার এইভাবে সেই প্রাথমিক সূচনাপর্ব থেকে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা এবং পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আজকের এই জনপ্রিয় শক্তিশালী বিনোদন মাধ্যম হিসেবে নিজেকে শক্ত মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

এই প্রয়াসে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, হীরেন্দ্র বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বাণীকুমার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

প্রথমদিকে বাংলা গান বলে সব রকমের গানই প্রচার করা হত, পরে অবশ্য ধীরে ধীরে গানের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে তখনকার বেতারে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো সংবাদই পাওয়া যেত না—যতটা পাওয়া যেত বিদেশের খবরাখবর। মনে পড়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরী এইসময় নিয়মিত করতেন ‘ঘটনাপ্রবাহ’ বলে একটি অনুষ্ঠান। সাহিত্যিকদের মধ্যে বেতারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা অনুষ্ঠান করতেন সজনীকান্ত দাস, সুকুমার সেন, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব

বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, মন্মথ রায় প্রমুখ। দা ঠাকুর বা শরৎচন্দ্র পন্ডিত তখনকার বেতারে প্রায় নিয়মিতই অনুষ্ঠান করতে আসতেন। প্রথমদিকে তিনি 'ছোটোদের বৈঠকে' এবং পরে 'পল্লিমঙ্গল আসরে' অনুষ্ঠান করতেন। তাঁর কৌতুক এবং রসরসিকতা সেকালে কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিল।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'ছোটোদের বৈঠকে'র 'দাদুমণি'। ক্রমে 'বিদ্যার্থীমন্ডল' বলে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের একটি অনুষ্ঠান এবং 'পল্লিমঙ্গল আসর'ও পরিচালনা করতেন তিনি। তখনকার বেতারে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের পুরস্কৃত করতেন ধনী এবং সংস্কৃতিবান কেউ কেউ। এমনই পুরস্কার পেয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং আরও অনেকে। বেতারে সংকট দেখা দিলে সাধারণের পক্ষ থেকে কেউ কেউ বেতার সম্প্রচারকে চালু রাখতে আর্থিক সাহায্যও করেছেন বার বার।

বিনোদনের সেই পুরোনো দিনগুলিতে আমরা ছিলাম না। কিন্তু উৎসের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি সেই স্রোত কেমনভাবে বলিষ্ঠ হয়ে আমাদের সংস্কৃতিকে দীপ্ত এবং গৌরবান্বিত করে তুলেছে এবং সেই মূল্যবান প্রেরণা আমাদের আরও এগিয়ে যাবার দিকে কতখানি উৎসাহ জোগাচ্ছে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্র : উন্মেষ ও বিকাশ

১

ভারতের মধ্যে কলকাতায় প্রথম বেতারপ্রচার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয় ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 'পদার্থবিদ্যা' বিভাগে। ড. শিশিরকুমার মিত্র পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছোট্ট একটি ঘরে ট্রান্সমিটার বসিয়ে তাঁর এক সহকর্মীর সাহায্যে ওয়্যারলেসে কথিকা, সংগীত, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রচার করতে শুরু করেন। এই ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারে প্রথম উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছিলেন হীরেন বসু এবং পরে তিনি তাঁর নিজের লেখা গানও এই মাধ্যমে প্রচার করেন। সে-সময়ে এই সমস্ত অনুষ্ঠান শুনে শ্রোতারা নিয়মিত মতামত পাঠাতেন। ড. মিত্র এক বছরের মতো এই প্রয়াস চালানোর পর ব্যাপারটি ইংলণ্ডের বি.বি.সি. (British Broadcasting Corporation)-র নজরে আসে। ১৯২৬-এ বি.বি.সি.—বেতার সম্প্রচার ভারতে বাণিজ্যিকভাবে কতখানি সফল হওয়া সম্ভব, তা খতিয়ে দেখার জন্য মি. সি. সি. ওয়ালিককে পাঠান এবং মি. ওয়ালিক কলকাতা হাইকোর্টের সামনে টেম্পল চেম্বার (Temple Chamber) বিল্ডিং-এর সর্বোচ্চ তলে একটি বেতার ট্রান্সমিশন স্টুডিয়ো গড়ে তোলেন। এখান থেকে আবৃত্তি, নাটকের নির্বাচিত অংশ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত প্রচার হতে থাকে। এতে বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করতেন এবং তাঁদের গাড়িভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া হত। সেকালের সুখ্যাত প্রচার সংগঠক সুধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রথম শ্রোতাদের জন্য পরিবেশন করেছিলেন 'দেবতাদের মর্ত্যে আগমন' নামে একটি হাস্যরসাত্মক নাটক। এই নাটকের সংগীত পরিচালক ছিলেন হীরেন বসু। Calcutta Illustrated-এর লেখক John Barry (জন ব্যারি)-র প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, 'মার্কনি' কোম্পানি কলকাতার হেস্টিংস স্ট্রিটে একটি অফিস খোলে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের সমুদ্র উপকূলে পাহারারত ব্রিটিশ নেভিগেশন কোম্পানির নৌবহরকে বেতারযন্ত্রে সুসজ্জিত করা। স্থান সংকুলান না হওয়ায় কোম্পানিটি ১৯১৮-য় স্থানান্তরিত হয় টেম্পল চেম্বার্সে। ১৯২৮-এর ১৬ অক্টোবর মঙ্গলবার Statesman কাগজের Wireless Correspondent—Indian Broadcasting Company-র তদানীন্তন জেনারেল ম্যানেজার Eric Dunstan-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে লিখেছিলেন :

> Calcutta was selected as the first station in India for a broadcasting experiment. In May 1922, Mr F.E. Reshar, Managing Director of the Indian States and Eastern Agency Limited approached the Government of India with a view to the establishment of Broadcasting Services in this Country in the following years.

বিষয়টি বিবেচনার জন্য দিল্লিতে Broadcasting conference বসে। কোম্পানিকে অনুমতি দেওয়া হয়। স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছিল :

> Calcutta was the first city in India to seize this opportunity and the Radio Club of Bengal was formed on the invitation of J. Briggs and Mr. J.R. Stepleton with a small transmitting station at Temple Chambers.

জন ব্যারি লিখেছিলেন :

> It will be of interest to note that the first broadcasting transmitter, known as 5 A.F. was installed here in 1923.

রেডিয়ো ক্লাব অফ বেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কলকাতা কেন্দ্র প্রথম অনুষ্ঠান করে ১৯২৩-এর নভেম্বর মাসে (West Bengal Information and Mass Communication Directory, Govt. of West Bengal, P-79)।

টেম্পল চেম্বারে 'মার্কনি' কোম্পানির অফিসে যে বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার কর্তা ছিলেন জে. আর. স্টেপলটন। পরে বি.বি.সি. কলকাতায় স্থায়ীভাবে ব্যবসা শুরু করলে এর অফিস স্থানান্তরিত হয় গারস্টিন প্লেসে। গারস্টিন প্লেস হল ডালহৌসি স্কোয়ার ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে ছোটো আদালতের বিপরীত দিকে দক্ষিণমুখো একটি রাস্তা, রাস্তাটি চলে গেছে এই বাড়ির সামনে দিয়ে। পুরোনো আমলের এই বাড়িটি মেরামত করে নিয়ে বেতার স্টুডিয়ো অফিস তৈরি করে নেওয়া হয়। জায়গাটি ছিল খুব নির্জন—পেছনের দিকে জর্জ চার্চের প্রকান্ড বাগান, আশপাশের বাড়ি থেকেও বিশেষ গোলমাল আসে না, এইসব বিবেচনা করেই জায়গাটা বেতারপ্রচারের আদর্শ স্থান হিসেবে কোম্পানি মনে করেছিলেন। দোতলা ও তিনতলা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল প্রথমে, তারপর ভারতের প্রথম 'কন্ট্রোলার অফ ব্রডকাস্টিং' মি. লায়নেল ফিল্ডেন (Lionel Feilden) সাহেবের আমলে ভারত সরকার পুরো বাড়িটাই ভাড়া নিয়ে নেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাস থেকে ১ নম্বর গারস্টিন প্লেসের বাড়িটা সাড়ে আটশো টাকা মাসিক ভাড়ায় পাঁচ বছরের জন্য লিজ নেওয়া হয়েছিল। এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের বাড়িটা ছিল তিনতলা। দোতলা-তিনতলা বেতার সম্প্রচারের জন্য ভাড়া নেওয়ার সময়ে একতলাটা ছিল ফিপসন অ্যাণ্ড কোম্পানির দখলে। দোতলার স্টুডিয়োটা ছিল বেশ বড়ো—এখানে গানবাজনা ও নাটকের অভিনয় হত। তেতলার স্টুডিয়োটা ছিল ছোটো, গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো, সংবাদ ঘোষণা ও বক্তৃতা প্রচার হত এখান থেকে। আর দোতলার স্টুডিয়োর আশপাশের ঘরগুলোকে নানারকম কাজে ব্যবহার করা হত। কোনোটি ছিল স্টেশন ডিরেক্টরের অফিসঘর, আবার কোনোটি ব্যবহার করা হত কলকাতা বেতার কেন্দ্রের দফতর হিসেবে। শিল্পীদের জন্য আলাদা দুটো বিশ্রামকক্ষ ছিল—একটা ভারতীয় প্রোগ্রামের শিল্পীদের জন্য, আর একটা ইউরোপীয় প্রোগ্রামের শিল্পীদের জন্য। স্টেপলটন সাহেব কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পার্ট টাইম স্টেশন ডিরেক্টর থাকার সময়েই একতলাটা খালি হয়ে যায় এবং গোটা বাড়িটাই কলকাতা বেতার কেন্দ্রের দখলে চলে আসে। তখন এই এক নম্বর গারস্টিন প্লেসে আটটি স্টুডিয়ো তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। আর কন্ট্রোল রুমটাও তেতলা থেকে একতলায় নামিয়ে আনা হয়েছিল। পরে ১৯৫৮-এর ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অফিস ইডেন গার্ডেনে চলে আসার পর এখানে ১৪টি স্টুডিয়ো ছিল। বর্তমানে এফ. এম. প্রচারতরঙ্গ চালু হওয়ার পর আরও দুটি স্টুডিয়ো বেড়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে আকাশবাণী ভবনে স্টুডিয়োর সংখ্যা হল ১৬। মোটামুটি আমরা চাকরিতে থাকাকালীন দেখেছি ২ নম্বর স্টুডিয়ো থেকে প্রচার করা হত কলকাতা 'ক'-এর অনুষ্ঠান, ৪ নম্বর স্টুডিয়ো থেকে কলকাতা 'খ'-এর অনুষ্ঠান এবং ১৩ নম্বর স্টুডিয়ো থেকে 'বিবিধ ভারতী'র বিজ্ঞাপন কার্যক্রম। ২ নম্বর সংলগ্ন স্টুডিয়ো থেকে অনেক ভি.আই.পি.-র বক্তৃতা বা সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা হত। ৫ নম্বর স্টুডিয়োতে হত নাটকের রিহার্সাল এবং রেকর্ডিং। প্রসঙ্গত বলা যায় এই ৫ নম্বর স্টুডিয়োতেই রেকর্ড করা হয়েছিল ১৯৯৪ সালে প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক শম্ভু মিত্রের ১৫টি সাক্ষাৎকার—যা আকাশবাণীর আর্কাইভস-এ সংরক্ষিত আছে। এই ৫ নম্বর স্টুডিয়োতেই প্রতিদিন বসত সুধীর সরকার পরিচালিত 'পল্লিমঙ্গল আসর'। এ ছাড়া ইন্দিরা দেবী পরিচালিত 'শিশুমহল'ও এই স্টুডিয়ো থেকেই সরাসরি প্রচার বা রেকর্ড করা হত। কিন্তু ৫ নম্বর স্টুডিয়ো মূলত নাটকের রিহার্সাল বা রেকর্ডিং-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বড়ো স্টুডিয়ো হওয়ার দরুন এই স্টুডিয়োতে বহু লোক বসে রিহার্সাল করতে পারত এবং দুটি বড়ো ঝুলন্ত মাইক্রোফোনে একসঙ্গে বহু লোক অভিনয় করতে পারত। ২নম্বর স্টুডিয়োর পাশে একটি ছোটো ঘরে শুধু সংবাদ পাঠই হত। সংবাদ না থাকলে এখানে কথিকা, সাক্ষাৎকার এসব রেকর্ড করা হত। এ ছাড়া ছিল Continuity Booth। প্রয়োজনে কখনো কখনো এখান থেকেও সংবাদ প্রচার করা হত। তা ছাড়া দুটি রিলের মাঝখানে কোনো ছোটো অনুষ্ঠান

থাকলে সেটি এই C.B. থেকেই প্রচার করা হত। অনেকসময় আবার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণাও এখানে থেকে করা হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান আকাশবাণী ভবনে বেতার সম্প্রচার শুরু হওয়ার সময়ে সকালের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী ঘোষণা করেছিলেন ভুবন মুখোপাধ্যায়। এই ভুবন মুখোপাধ্যায় হলেন সেকালের পল্লিমঙ্গল আসরের সেই বিখ্যাত 'কাশীনাথ'। বস্তুত এই কাশীনাথ এবং গোবিন্দর ঝগড়া অতীতের 'পল্লিমঙ্গল আসর'কে মাতিয়ে রাখত।

গারস্টিন প্লেসে 'বেতারজগৎ'-এর দফতর ছিল মূলবাড়িটার দোতলায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার পর এই দফতরটি স্থানান্তরিত হয় ফটকের পাশের গ্যারাজ ঘরটায়।

দোতলার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দু-ধারে ছিল ওয়েটিং রুম—একটি সাহেবদের জন্য, আর একটি ভারতীয়দের জন্য। ভারতীয়দের ওয়েটিং রুমে ছিল গোটা তিনেক মোটা গদি-আঁটা বসবার বড়ো চৌকি ও দেওয়ালে দু-জোড়া করে হেডফোন লাগানো। অপেক্ষমান শিল্পীরা বা দর্শনপ্রার্থী জনসাধারণ সেগুলি কানে দিয়ে যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান শুনতে পান তার জন্যই এই ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে আকাশবাণী ভবনের ওয়েটিং রুমেও চ্যানেল সিলেক্ট করে অনুষ্ঠান শোনার ব্যবস্থা ছিল অপেক্ষমান ব্যক্তিদের জন্য।

এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ২৫০ টাকা মাসিক ভাড়ায় বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গিয়েছিল কাশীপুর অঞ্চলে টালা পার্কের গায়ে। এই জায়গাটা পাঁচ বছরের জন্য লিজ নেওয়া হয়েছিল এবং বেতার সম্প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রান্সমিটারটি বসানো হয়েছিল এখানেই।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁদের উপস্থিতিতে বেশ ঘটা করেই এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের বাড়িতে ভারতের দ্বিতীয় বেতার কেন্দ্রটির উদ্বোধন হয়েছিল ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট। দ্বারোদঘাটন করেছিলেন বাংলার তৎকালীন গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। এই স্ট্যানলি জ্যাকসনকে ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের দিন সেনেট হলে বীণা দাস নামে এক ছাত্রী রিভলবার থেকে গুলি করেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গভর্নর বেঁচে যান এবং ন-বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন বীণা দাস।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমে ছিল ভাষণপর্ব এবং পরে বিচিত্রানুষ্ঠান। ভাষণপর্বে বক্তা ছিলেন স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন এবং ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুলতান চিনয়। অনুষ্ঠানের সবটাই ছিল ভারতীয় প্রোগ্রাম। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের স্টেশন ডিরেক্টর বিলেত থেকে সদ্য আসা বি.বি.সি.-র কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহেব সি.সি. ওয়ালিক-এর ব্যবস্থাপনায় নানা রুচির শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য পাঁচমিশালি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এই দিনে। ভারতীয় অনুষ্ঠানে গানে অংশগ্রহণ করেন আঙুরবালা, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, প্রফুল্লবালা ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হাসির গান গেয়েছিলেন সিতাংশুজ্যোতি মুখোপাধ্যায় (বকুবাবু) এবং বক্তা ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। নৃপেনবাবু বাঁশি বাজিয়েছিলেন এবং বাংলায় খবর বলেন রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। বেতার চালু হয়ে গেল।

এর আগে এদেশে বেতার সম্প্রচারকে নিয়মিত ও স্থায়ী করার অভিপ্রায় ও সংকল্প নিয়ে তৎকালীন বোম্বের সে-সময়কার কয়েক জন ব্যবসায়ী মিলে Indian Broadcasting Company নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন করে সেকালের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের বোম্বে ও কলকাতা—এই দুটি শহরে দুটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। দুটি বেতার কেন্দ্রই ১৯২৭-এ চালু হয়েছিল—২৩ জুলাই বোম্বে বেতার কেন্দ্রের এবং ২৬ অগাস্ট কলকাতা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছিল। এই বেতার কেন্দ্র দুটি যাতে ভালোভাবে চলে, তার জন্য কর্তৃপক্ষ বেতার সম্প্রচারের কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কয়েক জন সাহেবকে অনেক বেশি টাকা মাইনে দিয়ে 'বি.বি.সি.' থেকে নিয়ে এসে উঁচু পদে বসিয়েছিলেন। E.C. Dunston হয়েছিলেন Indian Broadcasting Company-র জেনারেল ম্যানেজার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন V.A.M. Balo,

বোম্বের স্টেশন ডিরেক্টর হয়েছিলেন L.B. Page, কলকাতার স্টেশন ডিরেক্টর হয়েছিলেন সি.সি. ওয়ালিক এবং কলকাতার স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন এফ.এ.কব।

বছর খানেক কী বছর দেড়েক স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চলার পর সমস্যা দেখা দিল। বি.বি.সি.-র চাকরি ছেড়ে দিয়ে যে পাঁচ জন সাহেব Indian Broadcasting Company-তে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা ১৯২৮-এর ১০ অক্টোবর কোম্পানিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের সকলের মাইনে বাড়াতে হবে, দু-একজনকে কিছু বাড়তি সুযোগসুবিধাও দিতে হবে, তা না হলে এস. এস. রণপুরা জাহাজে তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ওই পাঁচ জন সাহেব ১৯২৮ সালের ১ ডিসেম্বর এস. এস. রণপুরা জাহাজে বোম্বে থেকে স্বদেশে যাত্রা করেছিলেন এবং এঁদের সঙ্গেই দেশে ফিরে যান প্রথম স্টেশন ডিরেক্টর সি. সি. ওয়ালিক। তাঁর জায়গায় 'মার্কনি' কোম্পানি কলকাতা অফিসের বড়োসাহেব J.R. Stepleton হন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পার্টটাইম স্টেশন ডিরেক্টর।

আসলে ক্রিস্টাল সেট বা অন্যরকম রেডিয়ো সেটের চাহিদা যাচাই করে দেখার জন্য 'মার্কনি' কোম্পানি কলকাতায় একটা ছোটো বেতার স্টেশন খুলেছিলেন। এজন্য বড়োসাহেব Stepleton তাঁর ফ্ল্যাটের দুটি ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই দুটো ঘরের মধ্যেই ছিল কন্ট্রোল রুম, স্টুডিয়ো সব কিছু। ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'মার্কনি' কোম্পানির এই খুদে রেডিয়ো স্টেশনটি চালু ছিল। প্রতিদিন সন্ধে বেলায় দু-ঘণ্টার অনুষ্ঠান প্রচার করা হত—এক ঘণ্টা বাংলা অনুষ্ঠান এবং বাকি এক ঘণ্টা ইউরোপিয়ান প্রোগ্রাম। বাংলা বা ভারতীয় প্রোগ্রাম চালাতেন মার্কনি কোম্পানির বড়োবাবু অমরকৃষ্ণ বসু, যিনি তাঁর পরিচিত লোকেদের ডেকে ডেকে গান গাওয়াতেন বা বক্তৃতা দেওয়াতেন। ইউরোপিয়ান প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিলেন বড়োসাহেব জে. আর. স্টেপলটন। মার্কনি কোম্পানির এই বেতার কেন্দ্রের অধ্যক্ষও ছিলেন তিনিই। যেহেতু তিনি পূর্ণ সময়ের জন্য মার্কনি কোম্পানিতে আগে থেকেই কাজ করছিলেন, সেইহেতু তিনি আংশিক সময়ের জন্য কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেছিলেন—প্রতিদিন বেলা একটা-দেড়টায় টেম্পল চেম্বার্সে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যেতেন, আবার আসতেন বিকেল পাঁচটার পর, আটটা পর্যন্ত কাজ করে চলে যেতেন, ফের আসতেন রাত সাড়ে ন-টায়, অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অফিসে থেকে যেতেন, স্টুডিয়ো ঘুরে ঘুরে সম্প্রচারের কাজকর্ম দেখতেন। টেম্পল চেম্বারে মার্কনি কোম্পানির ছোট্ট স্টুডিয়োটি করার উদ্দেশ্য ছিল বেতারের যন্ত্র ও হেডফোন বিক্রি করা। নতুন একটা বিস্ময়কর আবিষ্কারের চমকে তখন বহু লোক হেডফোন ও যন্ত্র কিনতেন। দাম অল্পই ছিল। দশ টাকায় পাওয়া যেত সেটটি, ব্যাটারির প্রয়োজন ছিল না, এবং লাইসেন্স-ফি জমা দেবার জন্য পোস্ট অফিসে ছুটতে হত না। ছাদের ওপর দুটি বাঁশ খাটিয়ে এরিয়ালটাকে যন্ত্রের সঙ্গে তার দিয়ে যুক্ত করলেই আওয়াজ পাওয়া যেত।

আকাশবাণী কলকাতার পুরোনো দিনের এক কর্মচারী তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় ওই সময়ে গড়ের মাঠে ছোটো একটি তাঁবু ফেলে এক বেতার কোম্পানির সাহেবরা বেতার শোনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই তাঁবুতেই তারিণীচরণের চাকরি জুটে যায়। তিনি তখন এক মেগাফোনের চোঙা দিয়ে লোক ডেকে বিংশ শতাব্দীর এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কিন্তু কয়েক মাস পর কিছু কার্যসিদ্ধি হতে কোম্পানি তাঁবু গোটালেন এবং তারিণীবাবুর চাকরি শেষ হয়ে গেল। অবশ্য সাহেবরা তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, পাকাপাকিভাবে একটি বেতার কোম্পানি খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে, সেখানে তিনি চাকরির চেষ্টা করতে পারেন। তারিণীবাবু এরপরে দীর্ঘকাল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে চাকরি করেছিলেন।

স্টেপলটন সাহেবের আমলেই কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল—তাঁর আমলেই অনুষ্ঠানসূচির নানা নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা গিয়েছিল। স্টুডেন্টস-আওয়ার ফর কলেজ বয়েজ, বাংলা ও ইংরেজিতে চিলড্রেন কর্নার, তিন ঘণ্টার নাটকের অভিনয় এবং ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, গান-বাজনার জলসা ইত্যাদি বাইরের অনুষ্ঠানের রিলে এ সমস্তই তাঁর আমলেই শুরু হয়েছিল। তাঁর আমলেই কলকাতা

বেতার কেন্দ্রের বাংলা পাক্ষিক মুখপত্র ‘বেতারজগৎ’ প্রকাশনার সূচনা হয়েছিল। তাঁর আমলেই কলকাতা কেন্দ্রের সম্প্রচার-সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল। ‘মহিলা মজলিশ’ও তার আমলে শুরু হয়েছিল এবং ‘মহিলা মজলিশ’ পরে ‘মহিলামহল’ অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। যাই হোক, এই স্টেপলটন সাহেবের আমলেই ভারতবর্ষের বেতার সম্প্রচার-এর পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি হাত থেকে ভারত সরকারের হাতে চলে এসেছিল এবং ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিল।

১৯৩০ সালের ২ মার্চ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ‘ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি’ অর্থসংকটে পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সে-বছরেই ১ এপ্রিল থেকে বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল এবং তখন এর নাম রাখা হয়েছিল ‘Indian State Broadcasting Service’। মাঝের পুরো মার্চ মাসটা লিকুইডেটর সরকারি খরচে কলকাতা ও বোম্বে বেতার কেন্দ্র চালু রেখেছিলেন। কিন্তু সমানে লোকসান হতে থাকায় ১৯৩১-এর ৯ অক্টোবর সরকার Indian State Broadcasting Service বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে প্রবল গণবিক্ষোভের ফলে ওই বছরই ২৩ নভেম্বর সরকার সাময়িকভাবে বেতার সম্প্রচার চালু রাখতে সম্মত হন। ভারত সরকার ১৯৩২-এর ৫ মে সরকারি পরিচালনায় বেতার সম্প্রচার পাকাপাকিভাবে চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে এক দিনের জন্যও বেতার সম্প্রচারে ছেদ পড়েনি।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থায় টালমাটাল অবস্থা দেখাযায়। আর্থিক সংকটের জন্য বেতার সম্প্রচার ঢিলেঢালাভাবে চলতে থাকে। এইসময়ে Service-কে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য দুটি উল্লেখ্য ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এক ১৯৩০-এর Indian Tariff (Wireless Broadcasting Amendment Act) অনুযায়ী বেতার সংগ্রাহক সরঞ্জামের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করে শতকরা ৫০ ভাগ নির্দিষ্ট করা হয়। এবং পরের বছরই Indian Telegraph Act অনুযায়ী বিনা লাইসেন্সে রেডিয়ো সেট রাখা আইনত দন্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে Indian State Broadcasting Service-এর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং সরকার বেতার সম্প্রচারকে আরও সম্প্রসারিত করার কথা চিন্তা করতে থাকেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই সময়ে কলকাতা শহরে কোন বাড়িতে বিনা লাইসেন্সে রেডিয়ো সেট আছে তা খুঁজে বার করার জন্য নিয়মিত ‘ডিটেক্টর ভ্যান’ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। বেতার সম্প্রচারকে সমৃদ্ধ করতে ১৯৩৫-এর অগাস্টে B.B.C-র লায়োনেল ফিল্ডেন (Lionel Feilden) ভারতে আসেন এবং Controller of Broadcasting হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ফিল্ডেন বেতারের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞের সহায়তার কথা বিশেষভাবে অনুভব করেন এবং তারই ফলে B.B.C.-র খ্যাতনামা গবেষক ইঞ্জিনিয়ার H.L. Kirke ১৯৩৬ সালের ২৩ জানুয়ারি ভারতে আসেন। ফিল্ডেন এবং কিরকে যৌথভাবে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন, যা পরে সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এর ১৯ অগাস্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে C.W. Goyder-এর নিয়োগের পর। ১৯৩৭-এ All India Radio শ্রমমন্ত্রণালয় থেকে যোগাযোগ দফতরের অধীনে চলে আসে এবং পরে ১৯৪১-এ ‘তথ্য ও প্রচারমন্ত্রক’ নামে একটি নতুন দফতরের নিয়ন্ত্রণে আসে। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-এ এটি একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রকে পরিণত হয়।

ফিল্ডেন এবং কিরকের উদ্ভাবনীশক্তি এবং Goyder-এর সংশোধনসমৃদ্ধ AIR Network-এর কাঠামোর মূল বিষয়গুলি ছিল কিছু প্রধান কেন্দ্রে মিডিয়ামওয়েভ রেডিয়ো স্টেশন স্থাপন করা। কেন্দ্রীয় স্টেশন দিল্লিকে অতিরিক্ত হিসেবে শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়, যাতে সমস্ত স্টেশনের সঙ্গে তার সংযোগ থাকে। স্থির হয়, কলকাতা ও মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) দ্বিতীয় শ্রেণির সার্ভিস দেবে রিমোট এলাকাসমূহে।

১৯৩৫-এ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারে এবং যুক্ত প্রদেশের এলাহাবাদে প্রাইভেট বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই দুটি কেন্দ্র থেকে গ্রামাঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠান করা হত। পরে এই স্টেশনগুলি AIR Network-এর আওতায় আসে। বস্তুত এইখান থেকেই পল্লি অনুষ্ঠানের সূত্রপাত। ১৯৩৯-এ AIR বিদেশের শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠানপ্রচার শুরু করে। ১৯৪০-এ যুদ্ধের কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য ফিল্ডেন ভারত ছেড়ে চলে যান এবং All India Radio-র কর্ণধার হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন Prof. A.S.

Bokhari। ১৯৪৩-এ প্রধান কর্মকর্তার পদের নামও 'Controller of Broadcasting' থেকে পরিবর্তিত হয়ে হয় Director General। Prof. Bokhari দু-বছর AIR-এর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের নেতৃত্ব দেন। তারই চেষ্টায় অনুষ্ঠানের শিল্প সৌকর্য এবং দক্ষতা বাড়ে, যার জন্য প্রাথমিক যুগে বেতারের সুনাম হয়েছিল।

১৯৪৭-এর অব্যবহিত পরে বেতারপ্রচার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি Pilot Project নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক স্বতন্ত্র ভাষাভাষী এবং সাংস্কৃতিক অঞ্চলে একটি শক্তিসম্পন্ন মিডিয়ামওয়েভ ট্রান্সমিটারসমেত স্টুডিয়ো এবং প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি করে বেতার কেন্দ্র গড়ে তোলা। এই সময়ে AIR-এর সম্প্রচারণ কর্মসূচিও পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সমবেতভাবে বেতার-অনুষ্ঠান শোনার জন্য সরকার থেকে রেডিয়ো সেট সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। পরে ট্রানজিস্টার-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭০ নাগাদ এই কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

'The Indian State Broadcasting Service' এই নামকরণটি হয় ১৯২৬-এর ২৬ অগাস্ট। ভারতবর্ষে এই কোম্পানি গঠন করেন সুবিখ্যাত পার্শি ব্যবসায়ী মি. এফ. এম. চিনয় সাহেব। তিনি B.B.C.-র কয়েক জন কর্মীকে এখানে উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তখন অফিসে সাহেব-মেমই ছিল বেশি। তা ছাড়া নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুবেশ ভৌমিক, মি. আহমেদ, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দু-চার জন ছিলেন। প্রোগ্রাম বিভাগে নৃপেনবাবু স্বয়ং এবং তাঁর এক বন্ধু রাজেন সেনগুপ্ত ছাড়া স্থায়ীভাবে আর কেউ ছিলেন না। স্টেশন ডিরেক্টর ও ইংরেজি অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সি.সি.এন. ওয়ালিক, তাঁর সহকারী ছিলেন মি. চ্যাপম্যান এবং ইউরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন মিস আঙ্গার, মিস গ্রালব্রেথ প্রমুখ। রাজেন সেনগুপ্ত (১৯১১-য় শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের হাফব্যাক) এবং নৃপেনবাবু সন্ধেবেলা প্রোগ্রাম ঘোষণা করতেন। রাজেনবাবু এ ছাড়াও রয়টার ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ইংরেজিতে যে খবর পাঠাত, তা অনুবাদ করে পড়তেন।

ভারতে বেতার সম্প্রচারের পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে Lionel Feilden (লায়োনেল ফিল্ডেন) 'কন্ট্রোলার অফ ব্রডকাস্টিং' হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন ১৯৩৫-এর ৩০ অগাস্ট। সেই বছরই ১ মার্চ ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিল্প ও শ্রম দফতরের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই 'কন্ট্রোলার অফ ব্রডকাস্টিং'-এর পদ সৃষ্টি করেছিলেন এবং ফিল্ডেন সাহেব প্রথম সেই পদে যোগ দিয়েছিলেন।

পরের বছর ১৯৩৬-এর ১ অগাস্ট All India Radio জেনিভার Union International de Radio-diffusion সংস্থার অন্যতম নিয়মিত সহযোগী সদস্য (Regular Associate Member) হয়েছিল।

এর আগে ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি শুভ নববর্ষের দিন ব্রিটিশ ভারতের তৃতীয় বেতার কেন্দ্র দিল্লি বেতার কেন্দ্র চালু হয়েছিল। দিল্লি কেন্দ্রের জন্য ১৪ সদস্যের উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হয়েছিল ১৯৩৬-এর ২১ অগাস্ট। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক বি.এন. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. এস. কে. সেন, পন্ডিত হাকসার, শিবরাজ বাহাদুর, গুলাম মহম্মদ, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি, শ্রীমতী কে. কৃষ্ণরাও, অধ্যাপক মির্জা মহম্মদ সইদ, রাজা চরণজিৎ সিং, স্যার এম. ইয়াসিন খাঁ, লালা শ্রীরাম, রায়বাহাদুর রাম কিশোর, ড. জাকির হুসেন —এই তেরো জন এবং পদাধিকার বলে চতুর্দশ সদস্য ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার। এই উপদেষ্টা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন দিল্লি বেতার কেন্দ্রের অধিকর্তা। ১৯৩৯-এর ১০ এপ্রিল মাদ্রাজ ও কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জন্য দুটি পৃথক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কলকাতা কেন্দ্র ১৯২৭ সালের ২৬ অগাস্ট এবং মাদ্রাজ কেন্দ্র চালু হয়েছিল ১৯৩৮-এর ১৬ জুন—এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্নর লর্ড আর্সকিন। ১৯৩৯ সালের ২৮ আগস্ট দিল্লি বেতার কেন্দ্রের জন্য নতুন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরে ওই বছরের ৭ নভেম্বর বোম্বে বেতার কেন্দ্রের জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী Controller of Broadcasting Service তাঁর পদাধিকারবলে প্রতিটি উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। এবং প্রতিটি কেন্দ্রের অধিকর্তা

পদাধিকারবলে সেই কেন্দ্রের উপদেষ্টা কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন। এবারে অবশ্য প্রতিটি কমিটিতে ছোটো করে পাঁচ জন করে সদস্য রাখা হয়েছিল।

১৯৩৫-এর জুনে Indian State Broadcasting-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় All India Radio।

Indian State Broadcasting Service (ISBS) থেকে All India Radio কেমন করে হল তা লায়োনেল ফিল্ডেন-এর ১৯৬০-এ প্রকাশিত আত্মজীবনী 'The Natural Bent'-এ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফিল্ডেন লিখছেন :

> I had liked the title ISBS (Indian State Broadcasting Service) which to me seemed not only unweidly but also tainted with officialdom. After a good deal of cogitation—which may seem ridiculous now, but these apparently simple and obvious things do not always appear easily—I had concluded that All India Radio would give me not only protection from the clamses which I most feared in the 1935-Act, but would also have the suitable initials AIR. I worked out a monogram which placed these letters over a map of India, and it is now about the only thing which remains of me in India. But when I mooted this point, I found that there was immense opposition in the secretariat to any such change. They wanted ISBS and they thought it fine. I realised that I must employ a little unnatural tact. I cornered Lord Linlithgow after a viceregal banquet and said plaintively that I was in a great difficulty and needed his advice (He usually responded well to such an opening.) I said I was sure that he agreed with me that ISBS was a clumsy title. After a slight pause, he nodded his long head wisely. Yes, It was rather a mouthful. I said that perhaps it was a pity to use the word Broadcasting at all, since all Indian had to say 'broadcasting'—'broad' was for them an unpronounceable word. But I could not, I said, think of another title, could he help me? 'Indian State', I said was a term which, as he well knew, hardly fitted into the 1935 Act. It should be something general. He rose beautifully to the bait, 'All India?' I expressed my astonishment and admiration. The very thing. But surely not 'Broadcasting'? After some thought he suggested 'Radio'? Splendid, I said—and what beautiful initials : The Viceroy concluded that he had invented it and there was no more trouble. His pet name must be adopted. Thus All India Radio was born.'

পরে ১৯৩৮-এর ৫ অগাস্ট রবীন্দ্রনাথ 'আকাশবাণী' শিরোনামে একটি কবিতা শান্তিনিকেতন থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন কেন্দ্র-অধিকর্তা অশোককুমার সেনের কাছে।

কবিতাটি হল :

ধরার আঙিনা হতে ওই শোনো
উঠিল আকাশবাণী।
অমর লোকের মহিমা দিল যে
মর্ত্যলোকেরে আনি।
সরস্বতীর আসন পাতিল
নীল গগনের মাঝে,
আলোক-বীণার সভামন্ডলে
মানুষের বীণা বাজে।

সুরের প্রবাহ ধায় সুরলোকে
দূরকে সেনেয় জিনি
কবিকল্পনা বহিয়া চলিল
অলখ সৌদামিনী।
ভাষা-রথ যায় পুবে-পশ্চিমে
সূর্যরথের সাথে,
উধাও হইল মানব চিত্ত
স্বর্গের সীমানাতে।

সম্ভবত এই কবিতাটি কেন্দ্র করেই Indian State Broadcasting Service-এর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় ‘আকাশবাণী’। প্রাপ্ত আর একটি তথ্য থেকে জানা যায় বেতারের আদিযুগে মহীশূর বেতার কেন্দ্রের নাম রাখা হয়েছিল ‘আকাশবাণী’। পরবর্তীকালে এর থেকেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আকাশবাণী নামটি গ্রহণ করা হয়ে থাকতে পারে।

২

১৯৬৬ থেকে ২০০০—এই ৩৪ বছর প্রথমে আকাশবাণী কলকাতার সাধারণ বিভাগে এবং পরে বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন সম্প্রচার বিভাগে কাজ করার সুবাদে বেতারপ্রচার ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৬৬-তে আমি যখন বেতারে যোগদান করি, তখন কেন্দ্র-অধিকর্তা (Station Director) ছিলেন দক্ষ প্রশাসক এবং বেতার সম্প্রচার সম্পর্কে কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থের প্রণেতা পি.সি. চট্টোপাধ্যায়। পরে তিনি আকাশবাণীর ডিরেক্টর জেনারেলও হয়েছিলেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের নিপুণ পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এই সময়ে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীকালে কেন্দ্র-অধিকর্তা হিসেবে এসেছিলেন সুদেব বসু, পি. এস. ভাটিয়া, পি.ভি. কৃষ্ণমূর্তি, দিলীপকুমার সেনগুপ্ত, দিলীপকুমার বিশ্বাস, ক্যয়সার কালান্দার, মি. কুমার, আর.এন. দাস, নির্মলকুমার সিকদার, ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার, অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী, ডি. কে. রাভা, অরুণকুমার বিশ্বাস, আশিসকুমার সেন, স্বপ্না মন্ডল, অমল মন্ডল, প্রদীপকুমার মিত্র প্রমুখরা।

‘বিবিধ ভারতী’ কলকাতা কেন্দ্রের কেন্দ্র-অধিকর্তা ছিলেন মীরা মজুমদার, এস. কে. গাঙ্গুলি, প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বিশ্বাস, বাসুদেব বসু, অরুণকুমার বিশ্বাস এবং আরও অনেকে।

উল্লেখ্য অফিসারদের মধ্যে ছিলেন সুধীন চট্টোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ, সবিতাকুমার মিত্রমুস্তাফি, বিভাস বসু, সুনীল মিত্র, মি. বড়ুয়া, এন. ঘোষ, উষা ভট্টাচার্য, পুষ্প বন্দ্যোপাধ্যায়, এস.এল. সিনহা, এস.আর. দাস প্রমুখ।

প্রযোজক পদে বৃত ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (নাটক বিভাগ), জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (লঘু সংগীত), ভি.জি. যোগ (উচ্চাঙ্গসংগীত), গোপাল দাশগুপ্ত (লঘুসংগীত), বুলবুল সরকার (পাশ্চাত্যসংগীত), কবিতা সিংহ (স্পোকেন ওয়ার্ড), বেলা দে (মহিলামহল এবং শিশু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত), সুধীর সরকার (পল্লি বিভাগ)। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছাড়াও নাট্য প্রযোজনা করতেন বাণীকুমার, সরল গুহ, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীধর ভট্টাচার্য, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত মুখোপাধ্যায় এবং অনিয়মিতভাবে বর্তমান লেখক। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও একসময় এক বছরের জন্য আকাশবাণীর নাট্যপ্রযোজক ছিলেন। সাহিত্য বিভাগে ‘সাহিত্য শলাহকার’ হিসেবে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ‘মহিলামহল’ বিভাগের সহকারী প্রযোজিকা ছিলেন লীলা মজুমদার। তখনকার দিনে বেতারের প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানই ছিল গুণমানে অসাধারণ।

তখন জীবনীমূলক, সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং কৌতুকধর্মী—সব রকমের নাটকই প্রচার করা হত। অসাধারণ অভিনয়সম্পদে এইসব নাটক সমৃদ্ধ ছিল। সেকালের উল্লেখ্য নাটকের মধ্যে ঋত্বিক ঘটকের

‘জ্বালা’ নাট্যপ্রযোজনার কথা শ্রোতারা কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। ‘বিবিধ ভারতী’ কেন্দ্রে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘ফটিকচাঁদ’ ধারাবাহিকের কথাও বহু শ্রোতার আজও মনে আছে। মনে আছে অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে প্রচারিত বিজয় তেন্ডুলকরের ‘চোপ আদালত চলছে’ এবং ‘সন্ধানী আলো’-র কথা। সেকালে বিদেশি কাহিনি বা নাটক অবলম্বনেও বহু বাংলা নাটক হত।

বেলা দে-র পরিচালনায় ‘মহিলামহল’ ছিল দুপুর বেলার একটি অত্যন্ত উপভোগ্য অনুষ্ঠান। বেতারের আদিযুগে এই অনুষ্ঠানটির নাম ছিল ‘মহিলা মজলিশ’। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরে এর পরিচালক ছিলেন ‘বিষ্ণুশর্মা’ ছদ্মনামে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তখনও এই অনুষ্ঠানটি খুব জনপ্রিয় ছিল। এখানে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ‘সোম দত্ত’ ছদ্মনামে নিয়মিত ভাষণ দিতেন নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে।

সন্ধেবেলায় সুধীর সরকারের পরিচালনায় ‘পল্লিমঙ্গল আসর’ ছিল পুরোনো যুগের আর একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কাশীনাথ (ভুবন মুখোপাধ্যায়) এবং গোবিন্দ-র (মোহিতবাবু) ‘ঝগড়া’ শ্রোতারা খুবই উপভোগ করতেন। কাশীনাথ-গোবিন্দ ছাড়া এই আসরে অংশগ্রহণ করতেন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি কথায় কথায় ম্যাকফারসন সাহেবের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন), পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় (মঙ্গলময়), অজয় বসু (মোহনলাল) এবং শ্রীধর ভট্টাচার্য। পল্লিমঙ্গল আসরে তখন সুধীর সরকার রচিত হাস্যরসাত্মক নাটক হত প্রায়ই—যাকে কাশীনাথ-গোবিন্দ বলতেন ‘র‍্যাক্টো’। ভারি জমজমাট ছিল সেকালের এই অনুষ্ঠান। সত্যি মনে হত, ‘পল্লিমঙ্গল আসর’ আরও যদি একটু বেশিক্ষণ চলত!

‘মজদুরমন্ডলীর আসর’-কে জনপ্রিয় করার পেছনে সত্যচরণ ঘোষ মহাশয়ের অবদান ছিল অপরিসীম। বর্তমান লেখক দীর্ঘকাল এই আসরে ‘অনন্ত’ ও ‘বসন্ত’ চরিত্রে নিয়মিতই অংশগ্রহণ করতেন। ‘বিদ্যার্থীদের জন্য’ নামে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অনুষ্ঠান হত। এটি পরিচালনা করতেন মুরারি সেনগুপ্ত। তিনি আকাশবাণীর স্থায়ী কর্মী ছিলেন না।

‘সাহিত্যবাসর’ অনুষ্ঠানে গল্প-কবিতা পাঠ, ছড়া-প্রবন্ধ পাঠ নিয়মিতই হত। অনুষ্ঠানটির পরিচালিকা ছিলেন কবিতা সিংহ। কেন্দ্র-অধিকর্তা দিলীপকুমার সেনগুপ্তের আমলে এই অনুষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে ‘শ্রবণী’ রাখা হয়। পরে একসময় নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় ‘অভিজ্ঞান’। পরে আবার ‘শ্রবণী’ নামটিই ফিরে আসে।

কবিতা সিংহ সে-সময়ে ‘পুনশ্চ’ ও ‘মালঞ্চ’ বলে দুটি অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতেন। এই ‘মালঞ্চ’ অনুষ্ঠানে তিনি প্রযোজনা করেছিলেন একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান—‘ডি.এল. রায়ের গানে পাশ্চাত্য প্রভাব’। এতে উদাহরণ সহযোগে গান গেয়েছিলেন দিলীপকুমার রায়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে শান্তিনিকেতনে গৃহীত সাহানা দেবীর একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকারের কথা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

কিন্তু উল্লিখিত দুটি অনুষ্ঠান আজ আর আকাশবাণীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেকালে শনিবার এবং রবিবার দুপুরে একঘণ্টাব্যাপী প্রচার করা হত ‘অনুরোধের আসর’। এ আসরটি তখনকার শ্রোতাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে ‘রবীন্দ্রসংগীতের অনুরোধের আসর’ পরিবেশন করতেন অমিয় চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া ‘নজরুলগীতির অনুরোধের আসর’-এরও প্রবর্তন হয়েছিল। নজরুলগীতি শিক্ষার আসর পরিচালনা করতেন সুপ্রভা সরকার।

এখনকার ‘গল্পদাদুর আসর’ আগে ছিল ‘ছোটোদের বৈঠক’। কলকাতা বেতারের প্রথম যুগে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট যোগেশচন্দ্র বসু ‘গল্পদাদা’ ছদ্মনামে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে ‘বিদ্যার্থীমন্ডল’, ‘পল্লিমঙ্গল আসর’ ও ছোটোদের আসর পরিচালনা করতেন ‘দাদুমণি’ হিসেবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এরপরে ‘গল্পদাদুর আসর’ পরিচালনা করেছেন জয়ন্ত চৌধুরী। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর এই পরিচালনা অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিল। জয়ন্ত চৌধুরীর পরে এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নেন পার্থ ঘোষ। অনেক বছর নিয়মিতভাবে এই অনুষ্ঠানটি করার পর পার্থ ঘোষের জায়গায় পরিচালক হিসেবে আসেন মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়। শোনা যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চট্টোপাধ্যায় একসময় গল্পদাদুর আসর পরিচালনা করতেন। প্রতি রবিবার ইন্দিরা দেবীর পরিচালনায়

'শিশুমহল' ছিল সেকাল থেকে একালে বহু শ্রোতারই একটি প্রিয় অনুষ্ঠান। ইন্দিরা দেবী অনুষ্ঠান শুরু করতেন 'ছোটো সোনা বন্ধুরা ভাই আদর আর ভালোবাসা নাও' এই কথা বলে। সাপ্তাহিক এই অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হত প্রতি রবিবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে। শিশুমহলের পাশাপাশি রবিবার কলকাতাখ-এ বেলা ১২.৩০ মিনিটে প্রচারিত হত শিশুদের জন্য ইংরেজিতে একটি চমৎকার অনুষ্ঠান 'কলিং অল চিলড্রেন'। এটির পরিচালিকা ছিলেন বুলবুল সরকার। 'শিশুমহল'-এর পরেই থাকত পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় 'সংগীত শিক্ষার আসর'।

ষাট-সত্তরের দশকে 'ছোটোদের আসর' বলে সন্ধে ৬.৩০ মিনিটে একটি অনুষ্ঠান হত। এটির পরিচালক ছিলেন যোগেশচন্দ্র বসুর পুত্র নির্মল বসু।

ইন্দিরা দেবী 'শ্রীভবন' বলে মেয়েদের জন্য আর একটি অনুষ্ঠান করতেন রবিবার সন্ধে ৬.৩০ মিনিটে। এটিও সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ছিল।

সেকালের কেন্দ্র-অধিকর্তা দিলীপকুমার সেনগুপ্ত বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে 'রেডিয়ো কার্টুন' বলে একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান উপহার দেন শ্রোতাদের। আর এক কেন্দ্র-অধিকর্তা পি. ভি. কৃষ্ণমূর্তি প্রযোজনা করেছিলেন 'সং অফ ইন্ডিয়া' নামে সেকালের উজ্জ্বলতম একটি অনুষ্ঠান।

'সংগীত শিক্ষার আসর' বলে একটি অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল পরিচালনা করেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। সহযোগী শিক্ষার্থী হিসেবে এ অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে থাকতেন অম্বুজকুমার মল্লিক। এটা শেষের দিকে। তার আগে চার-পাঁচ জন শিক্ষার্থী থাকতেন। শোনা যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও নাকি একসময় এই অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলেন। পঙ্কজকুমার মল্লিকের প্রয়াণের পর এই আসরের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সুবিনয় রায় এবং বিমলভূষণ।

সংগীত শিক্ষার আসরের পাশাপাশি 'নজরুলগীতি শিক্ষার আসর' বলেও একটি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয় আশির দশকের শেষের দিকে। এর পরিচালিকা ছিলেন সুপ্রভা সরকার। 'এ মাসের গান' ছিল সেকালের বেতারের একটি সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান। এই 'এ মাসের গান'গুলিই পরে 'রম্যগীতি'তে সংকলিত হত।

তিরিশের দশকে আকাশবাণী কলকাতার ঐতিহাসিক নিবেদন 'মহিষাসুরমর্দিনী'। বাণীকুমার ছিলেন এই অনুষ্ঠানের রচয়িতা। তিনি তাঁর বন্ধু পন্ডিত অশোককুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় অনুপম ভাষাবিন্যাসে বেতারপ্রচারের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেন। 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের সুরকার ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং শ্লোকাবৃত্তি করতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। প্রথম দিকে সরাসরি (Live) প্রচারের যুগে মহালয়ার আগের দিন রাতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যেত। পরে, টেপ প্রচারের সময়েও দীর্ঘকাল দেখেছি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহালয়ার আগের দিন রাতে স্টুডিয়োতে উপস্থিত থাকতেন। 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি রি-মেক করা হত প্রতি দু-বছর অন্তর। এবং অনুষ্ঠান প্রচারের আগে এক মাস ধরে সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিক বিভিন্ন শিল্পীদের ট্রেনিং দিতেন। এতে সময় থেকে সময়ান্তরে কিছু কিছু গানের রদবদল ঘটানো হত, নতুন গানও সংযোজিত হত। ধীরে ধীরে এই অনুষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মনেও অপূর্ব আবেদন নিয়ে আসে। এরই ফলে, হিন্দিতে রূপান্তরিত করেও এই অনুষ্ঠানটি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। 'মহিষাসুরমর্দিনী'র ঘোষণায় প্রথম দিকে থাকতেন জয়ন্ত চৌধুরী ও কাজি সব্যসাচী। পরে দীর্ঘকাল ঘোষণায় ছিলেন দিলীপ ঘোষ। তারপরে অবশ্য এই অনুষ্ঠানের ঘোষণায় সিনিয়র ঘোষকদের অনেকেই অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন।

১৯৩৪-এর আগে মহালয়ার দিনে প্রচারিত হত বাণীকুমার রচিত 'শারদীয় বন্দনা'। পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরে সুরেন্দ্রনাথ দাস-এর যন্ত্রীসংঘের সহযোগে এই মহনীয় অনুষ্ঠানটি প্রথম প্রচারিত হয় ষষ্ঠীর প্রভাতে এবং পরে স্থানান্তরিত হয় মহালয়া দিবসে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বলতেন, 'আমি পাঠ করি না, পুজো করি।' 'মহিষাসুরমর্দিনী'র রেকর্ডিং-এর দায়িত্বে থাকতেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র একই ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার নিয়ে অনেক শ্রোতাই

দীর্ঘকাল অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। এরই জন্য ১৯৭৬-এর ২৩ সেপ্টেম্বর 'মহিষাসুরমর্দিনী'র পরিবর্তে 'দেবী দুর্গতিহারিণীম' নামে একটি নতুন অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এটি রচনা করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কলকাতা ও বোম্বের স্বনামধন্য শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—

শ্লোকপাঠ : ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায় ও ড. রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

গ্রন্থনায় : উত্তমকুমার, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ ও ছন্দা সেন।

সংগীতকার : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত। কণ্ঠসংগীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অসীমা ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও শ্যামল মিত্র। রেকর্ডিং নিখুঁত করার জন্য এইচ. এম. ভি.-র স্টুডিয়ো ভাড়া করা হয়েছিল। লতা মঙ্গেশকরের গান বোম্বের সেরা স্টুডিয়োতে রেকর্ড করা হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাপক আয়োজন ও সতর্কতা সত্ত্বেও নতুন অনুষ্ঠানটি দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত শ্রোতার কাছে একটুও গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব হয়নি। পরে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল পুরোনো 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটিকেই এবং ওই দিনই অন্য কোনো এক সময়ে।

৩

গুরুত্বের ক্রম হিসেবে আকাশবাণীতে সর্বোচ্চ স্থান সংবাদের। তারপর নাটক ও পরে সংগীত। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পথিকৃৎ বাংলা সংবাদ পাঠকের গৌরবান্বিত আসনটি বিজন বসুর। তিনি বেতারে এসেছিলেন 'চিত্রাসংসদ' থেকে এবং শোনা যায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রই নাকি তাঁকে বেতারে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এই লোকটি কি সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে বলে? বড়ো সুন্দর বলে তো!' বিজনবাবুই প্রথম সংবাদ পাঠকের কণ্ঠ, বাচনভঙ্গি, ভাব ও পরিবেশনায় এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রাখেন তাঁর সংবাদ পাঠের মাধ্যমে। তাঁর সংবাদ পাঠ সেকালে তুঙ্গ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আজও পরবর্তী প্রজন্মের সংবাদ পাঠকরা তাঁরই প্রবর্তিত ধারার দ্বারা ব্যাপকভাবেই অনুপ্রাণিত। আর ছিলেন 'চিত্রগুপ্ত' ছদ্মনামে মনমোহন ঘোষ। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও উপভোগ্য অনুষ্ঠান ছিল 'বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ'।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে পুরোনো যুগে ওড়িয়া ভাষায় খবর পড়তেন যতীন দাস। তিনি ওড়িয়ায় খবর পড়লেও তাঁর বাচনভঙ্গি এবং ভাষা বাংলার খুব কাছাকাছি থাকত বলে তা সহজেই বোঝা যেত।

আকাশবাণীতে ঘোষকদের বলা হত 'মাদার অফ দি স্টেশন'। কিন্তু এই মর্যাদার আসনটি তাঁরা কখনোই পাননি, কারণ তাঁরা অনেককাল পর্যন্ত 'স্টাফ আর্টিস্ট' হিসেবে মাসিক চুক্তিতে কাজ করতেন। পরে তিন বছর এবং পাঁচ বছরের চুক্তিতে ঘোষক-ঘোষিকাদের নিয়োগ করা হত। আরও পরে, ১৯৬৭ সালে স্টাফ আর্টিস্টদের ৫৮ বছরের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। এ ব্যবস্থা বলবৎ হয় তদানীন্তন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির হস্তক্ষেপে। এই সময়ে জুনিয়র-সিনিয়র হিসেবে তাঁদের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট বেতনক্রম বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীকালে ঘোষকদের জন্য একটি 'সিলেকশন গ্রেড'-এরও বন্দোবস্ত হয়। তার বেশ কয়েকবছর পরে ঘোষকদের জন্য 'টপ-গ্রেডের' ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮২ থেকে স্টাফ-আর্টিস্টদের নিয়মিত সরকারি চাকুরে হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রমোশনের ক্ষেত্রে ঘোষক-ঘোষিকাদের জন্য কোনো 'রিক্রুটমেন্ট রুল' আজও করা হয়নি। ফলে সারা চাকুরিজীবনে সরকারি নীতি অনুযায়ী অন্তত দুটি প্রমোশন পাওয়া আজ পর্যন্ত অনেক ঘোষক-ঘোষিকার ভাগ্যে জোটেনি। অথচ অন্যান্য স্টাফের ক্ষেত্রে এ সুযোগ সবাইকেই ঢালাওভাবেই দেওয়া হয়েছে। এই বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য অনেক ঘোষক-ঘোষিকারা একরকম বঞ্চিত হয়েই চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। বিপরীত দিকে সংবাদ পাঠকরা অনেক জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও প্রমোশন এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা পেয়েছেন অনায়াসেই। আরও একটা দুঃখের ব্যাপার, পুরোনো যুগের অনেক ঘোষক ১৯৯৮ সালের আগে অবসর নেওয়ার কারণে পেনশন

থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে এক দুর্বিষহ আর্থিক সংকটের মধ্যেই কেটেছে তাঁদের শেষ জীবন। অবশ্য ১৯৯৮ সালে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী নিয়মিত কিছু ঘোষক ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

বেতারের আদি যুগে ঘোষক-ঘোষিকাদের মধ্যে ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, জয়ন্ত চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কাজি সব্যসাচী, ইন্দিরা দেবী (প্রথম নিয়মিত মহিলা ঘোষিকা। আকাশবাণীতে যোগদান করেন ১৯৪৪ সালে।) স্মৃতিকণা বসু ও ভুবন মুখোপাধ্যায়। পরে একে-একে আসেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, গৌরী ঘোষ, পার্থ ঘোষ, সত্য চৌধুরী, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও বর্তমান লেখক। এঁদের মধ্যে অনেকেই কখনো কখনো বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রে বদলি হয়েছেন।

এর পরবর্তীকালে ঘোষক-ঘোষিকা হিসেবে আসেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী, সুন্দর চট্টোপাধ্যায় (ধৃতিমান), ক্ষৌণীশ বাগচি, হেনা খান্না, সুভাষ লাহিড়ী, দিলীপ দত্ত, বিমল মান্না, ছন্দা সেন, আইভি রাহা, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি চন্দ, দেবাশিস বসু, অরুণাংশু বিশ্বাস, কুমকুম দে, কমল গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শুচিস্মিতা গুপ্ত, রত্নাবলী সাহা, বরুণ দাস, মৈত্রেয়ী চৌধুরী ও অনুপ সরকার। এর মধ্যে অরুণাংশু বিশ্বাস ও বিভূতি চন্দ যোগদান করেছিলেন 'যুববাণী' বিভাগে। পার্থপ্রতিম চৌধুরী, সুন্দর চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ লাহিড়ী, দিলীপ দত্ত 'বিবিধ ভারতী' বিভাগে অল্প দিন চাকরি করেই অন্য চাকরিতে চলে যান। ইংরেজিতে ঘোষণায় একসময় ছিলেন বরুণ হালদার, ওয়াই. সি. গুপ্ত, সারা সত্যনাথন (অস্থায়ী), মিস চেকো (অস্থায়ী), ডিন গ্যাসপার, আইটা জৈন (অস্থায়ী), পরে সত্তরের দশকে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে আসেন রত্না সেন এবং আশির দশকে রঞ্জন মিত্র। 'সাঁওতালি' বিভাগ শুরু হওয়ার পর এই ভাষায় ঘোষণার জন্য নিযুক্ত হন নিভা টুডু, প্রয়াত সুশীল হেমব্রম এবং রাবণ বাস্কে। সাঁওতালী-সংবাদ পাঠে ছিলেন হরপ্রসাদ মুর্মু।

ষাট-সত্তরের দশকে বেতার সম্প্রচার নিয়ে নিয়মিত সমালোচনা বেরোত আনন্দবাজার পত্রিকায় (আকাশবাণীর খবর), যুগান্তরের 'অথ বেতার কথা', বসুমতীতে 'বেতার সমালোচনা' এবং স্টেটসম্যানে 'রেডিয়ো রিভিউ'তে। এই সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বেতার সমালোচনা পড়ে তখনকার কর্তৃপক্ষ কড়া ব্যবস্থা নিতেন।

৪

বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৮-এর ১৫ অক্টোবর। এর আগে এই কেন্দ্রে প্রচার করা হত হিন্দি গান, দক্ষিণী সংগীত, নাটক, ঝলকি এবং কথিকা। রেডিয়ো-সিলোনে প্রচারিত জনপ্রিয় চটুল গানের প্রতি ভারতের বৃহত্তর শ্রোতা ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে দেখেই প্রতিযোগিতামূলকভাবেই ভারতে সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। প্রথমে তৎকালীন বোম্বে ও মাদ্রাজে, পরে কলকাতায় এবং আরও অনেক জায়গায়। এই সার্ভিসের অনুষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পাঠানো অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে সংকলিত হত। পরে এইসব অনুষ্ঠান তীব্র গতিসম্পন্ন রেকর্ডারে কপি করে বিভিন্ন স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এইজন্য বিবিধ ভারতীকে 'লাইব্রেরি সার্ভিস' হিসেবেও গণ্য করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৫ অক্টোবর বিবিধ ভারতীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম-এর উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধরমবীর সিনহা এবং স্টুডিয়ো থেকে উদ্বোধনী ঘোষণা করেছিলেন সৌমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

তখন বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন প্রচারের পাশাপাশি অনেক নাটক ধারাবাহিক প্রচার করতেন। সে-সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল 'বোরোলিনের সংসার', 'অমর কাহিনি আরব্য রজনি', 'ভুলিয়ো না ভারতবাসী', 'অগ্নিগর্ভ জালালাবাদ', 'পথের পাঁচালী' ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান। এ ছাড়া ছিল 'হাওয়ামহল' অনুষ্ঠানে প্রচারিত 'ঝলকি'।

বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রটি সাধারণ বিভাগের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করার জন্য বিশেষ প্রয়াস নেন বিদ্যুৎকুমার সাহা ও অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী। তাঁরাই 'প্রভাতী', 'চয়ন', 'বর্ণালী', 'মনের মতো গান',

‘বিচিত্রা’ ইত্যাদি গ্রামোফোন রেকর্ডভিত্তিক স্থানীয় অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। শ্রোতাদের চিঠিপত্র নিয়ে আলোচনার আসরের নাম হয় ‘পত্রলেখা’।

প্রথমদিকে সকালে ৬.০৫ মিনিটে ‘বন্দনওয়ার’ বলে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হত। সকালে ‘সংগীত-সারিতা’ এবং দুপুরে ‘অনুরঞ্জনী’ বলে দুটি অনবদ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান হত। সন্ধেবেলা হত ‘সান্ধ্যগীত’। তা ছাড়া ছিল ‘মন চাহে গীত’, ‘আপ কি ফরমাইশ’, ‘মনোরঞ্জন’ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। হিন্দিতে চিঠির উত্তরের আসরের নাম ছিল পত্রাবলি—এটিও সে-সময়ের খুবই উপভোগ্য অনুষ্ঠান ছিল। আর ছিল ‘ইন সেমিলিয়ে’ নামে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান। ছিল ‘জয়মালা’ সন্ধে ৭.০৫ থেকে ৭.৪৫ মিনিট পর্যন্ত শনিবার বাদে রোজই। শনিবার ৭.০৫ মিনিটে হত ‘বিশেষ জয়মালা’। এটি পরিবেশন করতেন চলচ্চিত্র বা সাংস্কৃতিক জগতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা। পরবর্তীকালে বাংলা অনুষ্ঠান ‘বিশেষ চয়ন’-এও চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসতেন। এ ছাড়া কলকাতা সাধারণ বিভাগের থেকে ভিন্ন ধরনের ‘Talk show’ অনুষ্ঠান শুরু করা হয় বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রে। এর নাম দেওয়া হয় ‘কথাকলি’। এই অনুষ্ঠানটি ক্রমশই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। বিবিধ ভারতীর সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকত স্থানীয় বা সর্বভারতীয় বিজ্ঞাপনদাতাদের অনুষ্ঠান। কিন্তু বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রের সম্প্রচারে অন্যান্য বিবিধ ভারতী কেন্দ্রের মতো পেশাদারিত্ব তেমন ছিল বলে অনেক সময়েই মনে হত না। তবু বিবিধ ভারতী শুনতেন এবং আজও শোনেন অনেক শ্রোতাই। এবং তাঁদের এই সম্প্রচার ভালোই লাগে। তবে কলকাতা কেন্দ্রে ‘টক-শো’ শুরু হওয়ার পর বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠানের ‘লিসনিং’ যে কিছুটা ঘা খেয়েছে, একথা বলতেই হবে।

৫

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ‘যুববাণী’ বলে একটি নতুন সার্ভিস চালু হয়। এতে উদ্বোধনী ঘোষণা করেছিলেন বিভূতি চন্দ। ৩০ বছরের নীচে যাঁদের বয়েস, তাঁরাই ‘যুববাণী’তে অনুষ্ঠান করতে পারবেন বলে স্থির হয়। প্রথম দিকে এই চ্যানেলে দুর্ধর্ষ অনুষ্ঠান করেছিলেন আনন্দশঙ্কর এবং আরও কয়েক জন গুণী শিল্পী। পঙ্কজ সাহা এবং জগন্নাথ বসুও প্রথমদিকে এই সার্ভিসে অনেক নাট্য প্রযোজনা করেছেন। তা ছাড়া তরুণরা ‘জবাব চাই’ বলে একটি অনুষ্ঠানে প্রায়ই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনেক বিতর্কিত বিষয় এবং সমালোচনামূলক নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। যুবক-যুবতীদের লেখা নাটক বেতারস্থ হত তাঁদেরই প্রযোজনায়। এ ছাড়া হত নানা ধরনের নতুন নতুন অনুষ্ঠান। সে-সময়ের ‘যুববাণী’-র প্রযোজক প্রদীপকুমার মিত্র এই সার্ভিসটিকে জনপ্রিয় করার জন্য তখন খুবই পরিশ্রম করতেন। প্রচার করা হত যুবক-যুবতীর লেখা গল্প, কবিতা ও নাটক। আবৃত্তির অনুষ্ঠানও হত মাঝে মাঝে। কিন্তু ক্রমশ এই সার্ভিস গতানুগতিকতার আবর্তে পড়ে প্রথমদিককার জৌলস ও গুরুত্ব বজায় রাখতে তেমন সক্ষম হয়নি। এর একটি কারণ বোধ হয় যথার্থ গুণী যুবক-যুবতীদের বয়স ৩০ পেরিয়ে যাওয়া। তাঁদের জায়গায় তেমন করে যোগ্য কেউ এই বিভাগের হাল ধরতে পারেননি।

৬

১৯২৭-এর ২৬ আগস্ট থেকে আকাশবাণী কলকাতা পেরিয়ে এসেছে ৮৭টি বছর। পিছনে তাকিয়ে দেখতে পাই আদিযুগের বেতারে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা এই প্রচারমাধ্যমটিকে জনপ্রিয় করতে কত অমানুষিক পরিশ্রম-না করেছেন! মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন :

> সে-যুগে মাইনে ছিল না। তবু আমরা আসতাম। কাজ করতাম যখন যেমন দরকার হত। নিজের পয়সায় টিফিন করতাম। একদিন কী ভেবে যেন ক্যান্টিনে বলে দিলাম, বিলটা বড়োসাহেবকে পাঠিয়ে দিতে। বড়োসাহেব তো বিল পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, এই বিল তুমি পাঠিয়েছ? বললাম, হ্যাঁ। প্রশ্ন করলেন, কেন পাঠিয়েছ? বললাম, পয়সা ছিল না। অথচ খিদে পায় যে! উত্তরে নৃপেনবাবু বলেছিলেন, আচ্ছা খেয়ো, কিন্তু চলে যেয়ো না।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বলতেন, একখানা করে ইট গেঁথে গেঁথে এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছি। আজ যে-রীতিতে প্রশাসন চলে, তার অনেক কিছু তিনিই ঠিক করে দিয়েছিলেন। যেমন কোন শিল্পীর পারফরমেন্স কেমন হল, প্রচারিত নাটক, রূপকানুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার-এর গুণমান কেমন—সব মার্ক করে দেবেন ডিউটি অফিসাররা। পরে সকালের প্রোগ্রাম মিটিং-এ এইসব বিষয় আলোচনা করে অনুষ্ঠানের গুণমান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অনুষ্ঠান প্রচার কবে কী হয়েছিল তার রেকর্ড থাকবে ডিউটি রুমের লগবুকে। শিল্পীরা কবে কী অনুষ্ঠান করলেন এবং তার মান কীরকম, এসব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নজর রাখার জন্য 'ইনডেক্স কার্ড'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা এখনও বলবৎ আছে। এবং এই ইনডেক্স কার্ডের ভিত্তিতে শিল্পীর ভ্যালুয়েশন বিচার করে তাঁর গ্রেডেশন হবারও সম্ভাবনা থাকত।

এইসমস্ত নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্বদের বিভিন্ন অবদান, নিঃস্বার্থ সেবায় অতীতের আকাশবাণী যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি তাঁদের প্রদর্শিত পথ বা অবদানে আকাশবাণীর আজকের কর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তবেই আকাশবাণী তার পুরোনো গৌরব ফিরে পাবে।

ধ্বনিতরঙ্গ : রেশ, মূর্ছনা ও মুরতি

১

জীবনের মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক—কোথায় যেন অপলক নয়নে আমার নিঃসঙ্গ তাকিয়ে থাকা! সেকি বেদনা? সেকি আমার আমিকে খুঁজে খুঁজে দিশেহারা আকুল প্রাপ্তির মধ্যে সুপ্তি? সেকি আনন্দ? নিশীথ রাতের ঝম ঝম অঝোর বর্ষণ? আমি খুঁজি আমার বেদনাকে, আমাকে, আমার সুখ-দুঃখকে—প্রাত্যহিক জীর্ণতার বুকে এ যেন কোন এক ঝালাই—সেআসে সংগীত হয়ে—আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে আসে নাটক হয়ে—আমার জীবনকে নানা তারে বাজায়।

এই বায়বীয় ক্ষুধা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আছে। প্রত্যেকটি মানুষ চাইছে প্রখর জীবনের চাহিদা থেকে শিল্পের মধ্যে মুক্তি পেতে। এ ক্ষুধা তাকে অনন্ত দুঃখের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোথায় যেন কার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়—এক আচ্ছন্নতা প্রাণের সকল মুদ্রিত পাপড়ি খুলে গন্ধের মতো ছড়িয়ে পড়ে। যা নিয়ে অঙ্কের হিসেবে লাভ নেই—কিন্তু প্রাপ্তির হাতে অঢেল অঝোর যা ঝরে পড়ছে—তা যেন আমাকে নিয়ে বিশ্বের আনন্দের মধ্যে নাচছে! যে-আনন্দ, দুঃখ, বিষাদ, বিচ্ছেদ, সুখ, তৃপ্তির সম্মিলনে আমার নির্জন আত্ম-আবিষ্কার! কোন পর্দার আড়ালে অস্থির হাওয়ার দাপটে একঝলক আলো!...

আমি দেখি, বোধের নানা তরঙ্গের রঞ্জনদ্যুতি বয়ে যার আমার চৈতন্যে। আমি নিজেকে হারিয়ে নিজেরই অপরূপের মুখোমুখি।

ঘর যেমন রঙে রাঙিয়ে তুলি, বদ্ধতার হাঁফ কাটাতে যেমন জানলা খুলি, তেমনি হঠাৎ যেন কোন নিদ্রিতকে চোখ মেলতে দেখি—দেখি, প্রাপ্তির জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে আমার দুঃখ, সুখ, বেদনা সব একাকার আলো হয়ে আছে।

আমার ভেতরে ঘুরছে কত কী—দুঃখ, শোক, বেদনা, বিচ্ছেদ, ব্যথা, সুখ—নানা অভিজ্ঞতা সন্ধানী-আলোর মতো ঘুরছে। যে ভেতরে বসে আছে, তাকে চিনি না, তাকে জানি না—অথচ সে-ই তো আমার অস্তিত্বের মধ্যে নানা মূর্তি গড়ছে, ভাঙছে। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত আমার দেখার জগৎকে বিস্তৃত করছে, আলোকে আলোকিত করছে মন, আবার বোধের গভীরে তার অপূর্ব লীলায়িত হাতছানি। এই মানসিক ক্ষুধা মেটানো এবং সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য 'বহু জন হিতায় বহুজন সুখায় চ'-র লক্ষ্য সামনে রেখে ভারতে বেতারপ্রচার শুরু হয়েছিল।

১৯২৩-এর নভেম্বর ভারতের মধ্যে কলকাতায় সর্বপ্রথম একটি 'রেডিয়ো ক্লাব' গড়ে ওঠে। ১৯২৪-এর জুন মাসে কলকাতা রেডিয়ো ক্লাবের মতো আরও দুটি 'রেডিয়ো ক্লাব' গড়ে ওঠে তৎকালীন বোম্বে এবং মাদ্রাজে। এখান থেকে তখন দিনে আড়াই ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। কিন্তু আর্থিক অসংগতির জন্য 'মাদ্রাজ রেডিয়ো ক্লাব' ১৯২৭ সালের অক্টোবরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯২৭-এর ২৩ জুলাই সর্বপ্রথম নিয়মিত বেতার সম্প্রচার শুরু হয় বোম্বে (অধুনা মুম্বই) থেকে এবং এরই এক মাস পরে কলকাতায় নিয়মিতভাবে বেতারপ্রচার আরম্ভ হয় ১৯২৭-এর ২৬ আগস্ট।

তখন এই সমস্ত কোম্পানি গড়ে তুলেছিলেন The Indian State Broadcasting Company। এই কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে একটি লাইসেন্স পেয়েছিলেন। শুরুর সময় কোম্পানির মূলধনের পরিমাণ ছিল দেড় মিলিয়ন টাকা, অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা। ক্রমশ দেখা যায়, কোম্পানির মাসিক খরচ আয়ের তুলনায় অনেক কম। ফলে কোম্পানি খরচ কমিয়ে ফেলে। লাইসেন্সের (যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছিল সেট

পিছু দশ টাকা) সংখ্যা কমে যাওয়ায় সমস্যা আরও তীব্র হয়। কোম্পানি সরকারের কাছে ঋণের জন্য দরখাস্ত করেন, কিন্তু তাও নাকচ হয়ে যায়। ফলে ১৯৩০ খ্রি. নাগাদ কোম্পানি উঠে যায়। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে গঠনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বহু আবেদন করা হয়। সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লি-র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শ্রম ও শিল্পদফতরের মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি পেশ করেন এবং এই প্রচার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখার জন্যে অনুরোধ করেন। ১ এপ্রিল ১৯৩০ থেকে বেতারপ্রচার ব্যবস্থা শ্রম ও শিল্পমন্ত্রকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তখন এর নাম দেওয়া হয় The Indian State Broadcasting Company। রবীন্দ্রনাথের ‘আকাশবাণী’ নামে প্রচারিত এক কবিতা থেকে পরে নামকরণ হয় ‘আকাশবাণী’।

২

নৃপেন মজুমদার গড়ে তুলেছিলেন ‘বেতার নাটুকে দল’। আগে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট সময়সীমার ছোটো ছোটো দু-একটি নাটক প্রচারিত হত এবং প্রায়ই একই নাটক প্রত্যেক মাসে অভিনীত হত—এগুলি পরিচালনা করতেন সিতাংশুজ্যোতি মুখোপাধ্যায় (বকুবাবু) এবং এতে অংশগ্রহণ করতেন নৃপেনবাবু, যোগেশবাবু (গল্পদাদু), বকুবাবু, প্রফুল্লবালা, আবিরাবালা প্রভৃতি শিল্পীরা। সে-নাটকের মান খুব উন্নত ধরনের ছিল না। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ‘সীতা’ নাটক বহুবার প্রচারিত হয়েছে। আজ এক ঘণ্টা, পরের সপ্তাহে আর এক দিন দ্বিতীয় অঙ্ক এক ঘণ্টা—এইরকম করে অভিনয় হত। স্টেজ থেকে রিলে করার সময় দর্শকদের চ্যাঁচামেচি থেকে শুরু করে প্রম্পটিং পর্যন্ত সবই শোনা যেত।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেখলেন যে, বেতারের জন্য স্টেজের নাটক এইভাবে দীর্ঘকাল রিলে করে শোনানো যাবে না। এজন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রিলে বন্ধ করে প্রতি সপ্তাহে নতুন নাটক পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। নতুন নাটকে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, চারুশীলা, সরযূবালা দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ভুপেন রায় প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের বেতারে নিয়ে এলেন।

৩

তখনও ‘বেতারজগৎ’ সৃষ্টি হয়নি। নৃপেনবাবু বললেন, একখানা বাংলা প্রোগ্রামের কাগজ বার করলে কেমন হয়? বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, অবিলম্বে কাগজ বার করা দরকার আমাদের অনুষ্ঠান প্রচারের জন্যে। বেরোল ‘বেতারজগৎ’ ১৯২৯-এর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে। দাম ধার্য হল এক আনা। প্রসঙ্গত বলা যায়, ‘বেতারজগৎ’-ই হল বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় ভাষার মুখপত্র। অন্যান্য কাগজগুলি এর পরে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই সমস্ত কাগজই ছিল পাক্ষিক। বেতারজগৎ-এর প্রচারসংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ। ১৯৮৬ সালে এর প্রচারসংখ্যা ছিল ৮০,০০০।

পরে মন্ত্রিসভার এক সাব-কমিটি এই সমস্ত কাগজের কার্যধারা বিশ্লেষণ করে বলেন যে, যেহেতু এইসমস্ত কাগজ আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী নয় এবং অদূর ভবিষ্যতেও তার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেহেতু এগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এই সুপারিশের ফলেই ১৯৮৬-র জানুয়ারিতে ‘বেতারজগৎ’-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

‘বেতারজগৎ’-এর নামকরণ করেছিলেন বীরেন রায় মহাশয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির)। তাঁর পরে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যশস্বী হাসির গানের রচয়িতা ও গায়ক নলিনীকান্ত সরকার। পরে সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী বেতারজগৎ-এর সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। তারপর সম্পাদক হিসেবে একে-একে আসেন অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ বসু এবং অসীম সোম।

গুরুত্বের ক্রম হিসেবে আকাশবাণীতে সর্বোচ্চ স্থান পায় ‘সংবাদ’। তারপর নাটক ও সংগীত। এরপরে অন্যান্য অনুষ্ঠান।

দিল্লি থেকে সর্বভারতীয় বাংলা সংবাদ দীর্ঘকাল যোগ্যতার সঙ্গে পড়েছেন বিভূতি দাস, অসিতভূষণ দাস, ইভা নাগ, নীলিমা সান্যাল এবং দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আকাশবাণী কলকাতার R. N. U. (Regional

News Unit) যাঁদের অবদানে ৬০-৭০-এর দশকে প্রচন্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে, তাঁরা হলেন সংবাদ পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়; সংবাদ ভাষ্যকার প্রণবেশ সেন ও নির্মল সেনগুপ্ত এবং 'সংবাদ বিচিত্রা'-র প্রযোজক উপেন তরফদার। সত্তরের দশকে বর্তমান লেখকও দীর্ঘকাল সংবাদ পাঠ এবং সংবাদ বিচিত্রার গ্রন্থনা করে শ্রোতা ও বিদগ্ধজনের ভূয়সী প্রশংসা পান। পরে তরুণ চক্রবর্তীও সংবাদ পাঠক হিসেবে ধীরে ধীরে শ্রোতার মনে স্থান করে নেন। এই মুহূর্তে আর একজনের কথা মনে পড়ছে—তিনি হলেন প্রয়াত তরুণ সংবাদ পাঠক গৌতম বসু (আসল নাম বলরাম বসু)। ইনি হলেন নাট্যপ্রযোজক জগন্নাথ বসুর দাদা। ষাট-সত্তরের দশকে উপেন তরফদার প্রায় একক প্রচেষ্টায় 'সংবাদ বিচিত্রা'-কে রাতারাতি অসাধারণ জনপ্রিয় করে তোলেন। সে-সময়ে তাঁর সহযোগী এবং গ্রন্থিক হিসেবে ছিলেন বর্তমান লেখক। এরপর 'সংবাদ বিচিত্রা' প্রযোজনা করেছেন দেবদাস মুখোপাধ্যায়। 'রিজিয়োনাল নিউজ ইউনিটে' বর্তমানে অস্থায়ী ভিত্তিতে বেশ কিছু রিপোর্টার ও প্রযোজনা-সহকারী নিয়োগ করা হয়েছে। বুলেটিনের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। সকালে ৬-২০, ৭-৪০ এবং ৯টায়, দুপুরে গ্রামীণ সংবাদ বেলা ১২-৩০ মিনিটে, এরপর দুপুর ২-৩০ মিনিটে। দু-স্তরে সংবাদ প্রচার করা হয়—এক, স্থানীয় সংবাদ, দুই, আন্তর্জাতিক সংবাদ। সংবাদ বিভাগ এ ছাড়া বেশ কয়েক বছর 'বিচিত্র সংবাদ' বলে একটি ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করতেন। এটি প্রচারের দায়িত্ব ছিল বরুণ মজুমদারের ওপর। সংবাদ বিভাগ যুবকদের জন্যও যুববাণী-সংবাদ পরিবেশন করেন দিনে দু-বার—সকালে ও রাত্রে। দুটোই ৮-৩৫ মিনিটে। এ ছাড়া সপ্তাহে দু-দিন সংবাদ সমীক্ষা এবং প্রতিদিন রাত্রে সংবাদ পরিক্রমা প্রচারিত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে, যেমন নির্বাচনের সময়, জাতির সংকটমুহূর্তে বুলেটিনের সংখ্যা বাড়ে। নির্বাচনের সময় প্রতি ঘণ্টায় সংবাদ দেওয়া হয়, তা ছাড়াও থাকে সংক্ষিপ্ত 'ফ্ল্যাশ'। এই সমস্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও আকাশবাণী কলকাতার 'রিজিয়োনাল নিউজ ইউনিট' নিয়মিত পরিবেশন করে আসছেন 'সংবাদদর্পণে'। এটি Off-Broadcast রেকর্ড করে পরে অনুবাদ করে পড়া হয়।

সংবাদ পাঠে স্বতন্ত্র এবং আবেগমিশ্রিত একটি অতুলনীয় ঘরানার সৃষ্টি করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় প্রণবেশ সেন রচিত 'সংবাদ পরিক্রমা' পড়ে তিনি নাকি 'দশ ব্যাটেলিয়ন সৈন্যর কাজ করেছিলেন'—এ মন্তব্য করেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান। এই সময় বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ বক্তৃতা এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচিত একটি গান দিয়ে অপূর্ব একটি 'সংবাদ বিচিত্রা' প্রযোজনা করেন উপেন তরফদার। এই গানটি গেয়েছিলেন অংশুমান রায়। পরবর্তীকালে H.M.V. এই গানের রেকর্ডটি প্রকাশ করেন। সবশেষে বলি, সে-যুগের বেতারে কী অফিসার কী স্টাফ আর্টিস্ট—সকলেই একই সঙ্গে পেশাদার, দক্ষ ও কর্মে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। এখন এর যে কিছুটা অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

৪

আকাশবাণী কলকাতার দ্বিতীয় জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, নাটক। সুধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং হীরেন বসুর পরবর্তীকালে বেতারনাট্য প্রযোজনায় অগ্রণী ভূমিকা নেন বাণীকুমার এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তখন ব্যাপকভাবে শব্দ প্রক্ষেপণার ব্যাপারটি কণ্ঠে করতেন সুখ্যাত কমেডিয়ান অজিত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৭-য় প্রথম এফেক্টসম্যান (Effectsman) হিসেবে নিয়োগ করা হয় নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়কে। রেকর্ড থেকে তিনি এফেক্ট দিতেন এবং অভিনেতাদের পরবর্তী Action করার জন্য ইঙ্গিত করতেন। প্রযোজক স্টুডিয়োর প্যানেলে বসে একাধারে যন্ত্রীবৃন্দ, এফেক্টম্যান এবং অভিনেতৃদের ইঙ্গিতের দ্বারা বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। একটি নাটক করতে তখন এতগুলি লোকের মনঃসংযোগ (concentration) এবং সতর্কতার প্রয়োজন হত। একটু অসাবধান হলেই বিপত্তি ঘটত। এই অসুবিধার মধ্যেও কিন্তু সেকালে মাঝে মাঝে সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব হত। 'সীতা' নাটকের পরেও 'আরোগ্য নিকেতন' এবং 'ক্ষুধা' বিশ্বরূপা মঞ্চ থেকে রিলে করা হয়েছিল। অবশ্য সে-সময়ের দিকপাল সব অভিনেতা-অভিনেত্রীই বেতারে নিয়মিত অভিনয় করতেন। ফলে, অভিনয়নৈপুণ্যে নাটকগুলি সহজেই জমে যেত।

বাণীকুমার এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্বরচিত মৌলিক নাটকের পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যশস্বী সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ যেমন প্রচার করতেন, তেমনি প্রসিদ্ধ ক্লাসিক নাটকগুলিও প্রযোজনা করতেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, হাস্যরসাত্মক নাটক—সবই প্রচার করা হত।

ধীরে ধীরে নাট্যপ্রযোজক হিসেবে এলেন সলিল সেন, প্রফুল্ল রায় এবং নির্ভয় বসু। সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও এক বছর আকাশবাণী কলকাতার নাট্যপ্রযোজক পদে বৃত ছিলেন। ১৯৫২-র কিছু পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রচার-প্রযোজক (Publicity Producer) হিসেবে বেতারে যোগদান করেন যশস্বী নাট্যকার মন্মথ রায়। সবিতাব্রত দত্ত এবং শম্ভু মিত্রও বেতারের প্রথমযুগে তাঁদের গ্রুপ থিয়েটারের পক্ষে মাঝে মাঝেই নাট্যপ্রযোজনা করতেন।

ক্রমশ আরও অনেক প্রযোজক নাট্য প্রযোজনা করতে এগিয়ে এলেন। এঁরা হলেন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অতুল মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধর ভট্টাচার্য, সরল গুহ এবং সুদেব বসু।

পরবর্তীকালে নাট্যপ্রযোজক হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, বাসুদেব বসু, জয়ন্ত চৌধুরী, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনতা রায়, অজিত মুখোপাধ্যায়, সূর্য সরকার জগন্নাথ বসু, সমরেশ ঘোষ ও বর্তমান লেখক।

বেতার নাট্যকার হিসেবে প্রথমযুগে এসেছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুশীল মুখোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত ও মহেন্দ্র গুপ্ত। এর পরবর্তীকালে বেতার নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় (সুখচর) বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, প্রসূন মিত্র, সন্তু বসু, রমেন গঙ্গোপাধ্যায়, জহর দাশগুপ্ত, সমর চৌধুরী, অলক ভট্টাচার্য প্রমুখ। 'আকাশবাণী বার্ষিক পুরস্কার' ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর জগন্নাথ বসু, সূর্য সরকার এবং সমরেশ ঘোষ কয়েক বার প্রথম পুরস্কার পান। সমরেশ প্রযোজিত 'মৃত্যুহীন প্রাণ' সাইপ্রাস থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পায়।

নাট্যবিভাগ আয়োজিত আর একটি হাস্যরসাত্মক অনুষ্ঠান ছিল 'রূপ ও রঙ্গ'। এতে রঙ্গব্যঙ্গমূলক ছোটো ছোটো স্কেচ প্রচার করা হত। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়মিত এই অনুষ্ঠানে 'বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট' পড়তে আসতেন। কমিকও হত। যতদূর মনে পড়ে, অনুষ্ঠানটি মাসে একটিমাত্র রবিবারে প্রচারিত হত। শ্রীধর ভট্টাচার্য ছিলেন এই অনুষ্ঠানের গ্রন্থিক।

এ ছাড়া গ্রুপ থিয়েটারগুলির জনবন্দিত প্রযোজনাগুলিও বেতারোপযোগী করে নিয়মিতই সত্তরের দশক থেকে আজ পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে আসছে। বর্তমানে কারিগরি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রযোজনার সুযোগসুবিধা অনেক বেড়েছে। ফলে প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারছেন প্রযোজকরা এবং শব্দমাধ্যমকে খুশিমতো ব্যবহার করতে পারছেন। ফলে প্রযোজনা দিনে দিনে পুরোনো যুগের খোলস ছেড়ে বিষয়বস্তু ও বিন্যাসে ক্রমশই আধুনিক হয়ে উঠছে।

৫

সংগীতের ক্ষেত্রে আকাশবাণী অনন্য হয়ে উঠতে পেরেছিল যাঁদের জন্যে তাঁরা হলেন, কাজি নজরুল ইসলাম, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, ভি.জি. যোগ, তারকনাথ দে, দীপালি নাগ, দক্ষিণামোহন ঠাকুর, গোপাল দাশগুপ্ত, কেরামতউল্লাহ খাঁ, মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ।

বিভিন্ন ধরনের গান ছাড়াও সংগীত বিভাগ 'স্বাধীনতা দিবস', 'জন্মাষ্টমী', 'দুর্গা পূজা', 'সরস্বতী পূজা' ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সংগীতালেখ্য প্রচার করত নিয়মিতভাবেই।

এ ছাড়া ছিল 'রমাগীতি' যার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় 'মহিলামহল', 'গল্পদাদুর আসর', 'শিশুমহল', 'রম্যগীতি', 'মজদুরমন্ডলীর অনুষ্ঠান', 'পল্লিবেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান', 'অঙ্কন' ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সিগনেচার টিউনগুলির অধিকাংশই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং অলোকনাথ দে-র রচনা।

প্রযোজকবৃন্দ ছাড়া আকাশবাণী কলকাতায় সংগীতকার হিসেবে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন—কেরামতউল্লাহ খাঁ, মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খাঁ, অলোকনাথ দে, কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ, প্রিয়লাল চৌধুরী (শিশুবিভাগ) প্রভৃতি।

প্রযোজক না হয়েও আকাশবাণীতে যাঁরা অসাধারণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র বসু (গল্পদাদু), জয়ন্ত চৌধুরী (গল্পদাদুর আসর) নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (দাদুমণি), পার্থ ঘোষ (গল্পদাদুর আসরের পরিচালক), সত্যচরণ ঘোষ ('মজদুরমন্ডলী' অনুষ্ঠানের পরিচালক), প্রদীপ দে (ফার্ম অফিসার—'কৃষিকথার আসরে'র পরিচালক), মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবন মুখোপাধ্যায় (পল্লিমঙ্গল আসরের 'কাশীনাথ') মোহিতবাবু (পল্লিমঙ্গল আসরের 'গোবিন্দ'), বরুণ হালদার (মিউজিক্যাল ব্যাণ্ডবক্সের নিবেদক), ইন্দিরা দেবী ('শিশুমহলে'র পরিচালিকা) প্রমুখ। কলকাতা কেন্দ্রের স্টেশনে ডিরেক্টর হিসেবে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন—ভিক্টর পরাণজ্যোতি, বি. কে. নন্দী, পি. সি. চট্টোপাধ্যায়, পি. এস. ভাটিয়া, কল্যাণ দাশগুপ্ত, পি. ভি. কৃষ্ণমূর্তি, দিলীপকুমার সেনগুপ্ত, দিলীপকুমার বিশ্বাস, কায়সর কালান্দার, অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী, শরৎচন্দ্র বিশ্বাস, ত্রিদিব মালাকার, মলয়বিকাশ পাহাড়ি এবং বি.আর. কুমার।

৬

ঘোষকদের কথা কিছু বলি। আগে ঘোষকরা শুধু ঘোষণাই করতেন, গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত চাপিয়ে দিত পিয়োন। তা ছাড়া, সে-যুগে সরাসরি (Live) প্রচার হত বেশি। কিন্তু 'টেপ' ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ঘোষককে ঘোষণা ছাড়াও অন্যান্য অনেক কাজ করতে হয়। 'টেপ' শুনে অনুষ্ঠান আরম্ভের CUE ঠিক করে রাখতে হয়, রেকর্ড CUE করতে হয়, ফেডার বক্স Operate করতে হয়, এ ছাড়া ঘোষণা তো আছেই। 'বিবিধ ভারতী' বিভাগে ঘন ঘন বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ঘোষককে খুবই সতর্ক থাকতে হয় প্রতিটি মুহূর্তে।

ঘোষকদের সবসময়ই তীব্র মনঃসংযোগ এবং সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। শেষ মুহূর্তের কোনো ভুল তিনিই আবিষ্কার করে শুধরে নিতে পারেন। অনুষ্ঠানের যাবতীয় সৌকর্য প্রাথমিকভাবে ঘোষকের ঘোষণার দ্বারাই উপযুক্ত পরিমন্ডল গড়ে তোলে। তাঁকে সব দিকে লক্ষ রাখতে হয়, অনুষ্ঠানের চরিত্র সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়, এবং তাঁর কাজ হল ঘোষণার দ্বারা ওই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে যাওয়া। বর্তমান ঘোষকবৃন্দ সংস্কৃতি জগতের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। কাজি সব্যসাচী, জয়ন্ত চৌধুরীর পরে ঘোষণার ভিন্ন স্বাদ অনেকেই এনেছেন এবং একটি স্বতন্ত্রধারার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবু অনেকেই কাজি সব্যসাচী বা জয়ন্ত চৌধুরীকে আজও ভুলতে পারেন না। বোধ হয় ওই মাপের broadcaster খুব কমই তৈরি হয়।

পুরোনো যুগে দাদাঠাকুর বা দা-ঠাকুরের বেতারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর রসিকতা প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। একটি দৃষ্টান্ত : NEWS মানে কী? দাদাঠাকুর বলতেন, North East West South—অর্থাৎ ব্যাপ্ত পরিমন্ডল।

বেতারের প্রথমযুগের অনেকেই আজ নেই। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রয়াত, ইন্দিরা দেবীও। পরবর্তীকালে গুণী শিল্পীরাও অবসর গ্রহণের দিকে এগিয়ে চলেছেন। যথার্থ উত্তরসূরি তেমন তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় না। এখনই সে-বিষয়ে ভাববার উপযুক্ত সময়। অনুষ্ঠানের মান-উন্নয়নের জন্য যোগ্য প্রতিভার অন্বেষণে এখনই তৎপর হতে হবে। বাংলার মাটিতে তার কোনোদিন অভাব হয়নি, হবেও না।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দীর্ঘকাল কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নাট্যপ্রযোজক পদে বৃত ছিলেন। নাট্যপ্রযোজক হিসেবে তাঁর অবদানের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী রীতিমতো যশস্বী হয়ে ওঠেন। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি এবং বাণীকুমারই বেতার নাটকের মজবুত ভিতটি গড়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী প্রযোজকরা প্রায় সকলেই তাঁর (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের) কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন এবং তাঁরই গড়া রাস্তায় বিজয়নিশান উড়িয়েছেন। শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষা ছিল নিখুঁত। তিনি ঠিক বুঝতেন কোন চরিত্র কাকে দিয়ে ঠিক হবে। শিল্পীদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। শেষের দিকে তাঁর প্রযোজনা সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। কারিগরি

কলাকৌশল সম্পর্কে তিনি উদাসীনই ছিলেন বলা যায়। তাঁর প্রাণ ছিল অভিনয়। সেটাকেই তিনি জীবন্ত করতে চাইতেন।

১৯৩০-এ বেতার নাটুকে দলে যোগদান করেন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পূর্বোক্ত বিশিষ্ট অভিনেতাবৃন্দ। এই সময়ে বছরে ৭২টি নাটক প্রযোজিত হয়—এর মধ্যে ২৪টি অপেরা এবং বাকি পূর্ণাঙ্গ নাটক।

১৯৩৪-এ অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'শরৎ শর্বরী' নামে একটি অনুষ্ঠান হয় এবং এর প্রথম বছরের অনুষ্ঠানে হীরেন বসুর নাট্যরূপায়িত 'বৈকুণ্ঠের উইল' পরিবেশিত হয়। হীরেন বসু-কৃত এই নাট্যরূপটি শরৎচন্দ্রের ভালো লেগেছিল এবং এজন্য তিনি হীরেন বসুকে তাঁর সমস্ত রচনার বেতার-নাট্যরূপ করার লিখিত অনুমতি দিয়েছিলেন।

৭

বেতারনাট্য প্রযোজনায় এরপর অগ্রণী ভূমিকা নেন বাণীকুমার এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সংলাপ শব্দপ্রক্ষেপণ, সংগীতানুষঙ্গ ইত্যাদির সাহায্যে শ্রুতিমাধ্যমে একটি নাটককে কীভাবে চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়, সে-ব্যাপারে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করতে শুরু করেন তাঁরা। বাণীকুমার এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্বরচিত মৌলিক নাটকের পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের উপন্যাস ও ছোটোগল্পের নাট্যরূপ যেমন প্রযোজনা করতেন, তেমনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বনফুল প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটক বেতারোপযোগী করেও প্রযোজনা করতেন।

বাণীকুমারের অজস্র সুখ্যাত প্রযোজনার মধ্যে 'ইন্দিরা', (বঙ্কিমচন্দ্র), 'বিরাজ বউ' (শরৎচন্দ্র), 'দত্তা (শরৎচন্দ্র), 'পল্লিসমাজ' (শরৎচন্দ্র) 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (রবীন্দ্রনাথ), 'সন্দিগ্ধ' (শ্রীশচন্দ্র বসু) প্রভৃতি উল্লেখ্য।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র দীর্ঘকাল ছিলেন 'আকাশবাণী' কলকাতা কেন্দ্রের নাট্যপ্রযোজক। প্রকৃতপক্ষে তিনি ও বাণীকুমারই বেতারমাধ্যমে নাট্য প্রযোজনার সার্থক রূপকার ও স্রষ্টা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর উল্লেখ্য প্রযোজনা : কৃষ্ণকুমারী (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), ঘরে বাইরে (রবীন্দ্রনাথ), প্রলয়, (শচীন সেনগুপ্ত), বিল্বমঙ্গল (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), চিত্তচকোর, সাক্ষী (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত), তটিনীর বিচার (শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত), কবি (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), শ্রীমধুসূদন (বনফুল), রাজা রামমোহন (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), কালরাত্রি, মহাকবি গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি। সংগীতে নাট্য-আবহ সৃষ্টির পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবেই ছিল তৎকালীন ভারতীয় অনুষ্ঠানের ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের। তিনি ছিলেন কুশলী ক্ল্যারিয়োনেট শিল্পী। নৃপেনবাবু ছাড়া রাইচাঁদ বড়াল, তারকনাথ দে (সংগীত পরিচালক অলোকনাথ দে-র বাবা), পঙ্কজকুমার মল্লিক, হীরেন বসু, দক্ষিণামোহন ঠাকুর, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ দিকপাল সংগীতকার অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে নাট্য-আবহ সৃষ্টি করতেন।

বোমাবর্ষণের এফেক্টের ব্যাপারে একটি মজার গল্প শুনেছিলাম সাউণ্ড-উইজার্ড অজিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। অজিতবাবু তখন মুখে এবং অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে সরাসরি এফেক্ট প্রচার করতেন। একবার বাণীকুমার বললেন, এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ হচ্ছে—এই এফেক্টটা করতে পারবি? অজিতবাবু বললেন, হ্যাঁ। একটা সাইকেলের চাকা লাগবে—আর বড়ো বালি ভরতি ঠোঙা একটা। আনা হল সব। অজিতবাবু এরপর মুখে এরোপ্লেনের আওয়াজ করতে করতে ঘুরন্ত সাইকেলের চাকার শিকে কাগজ চেপে ধরলেন। তারপর বালি ভরতি ঠোঙা দুম করে ফাটিয়ে দিলেন। এতে চমৎকার এফেক্ট হল। এত জোর শব্দ হল যে, স্টেশন ডিরেক্টর (ভিক্টর পরাণজ্যোতি) ছুটে এসে বললেন, হোয়াট হ্যাপেন? তারপর পুরো ঘটনাটা তাঁকে বলা হলে তিনি হেসে চলে গেলেন। সমরেশ ঘোষও নাটকের প্রয়োজনে একসময় তিমি মাছের বিভিন্ন শব্দ রেকর্ড করেছিলেন। বাসুদেব বসুও নেফা-সিরিজের জন্য হাতির বিভিন্ন মুডের শব্দচিত্র রেকর্ড করেছিলেন। এর পরের দিকে প্রযোজনা সহকারী অজিত মুখোপাধ্যায় এবং শুভ্রপ্রকাশ দে-ও বহু নতুন নতুন শব্দমালা রেকর্ড করেছেন। বর্তমানে কারিগরি ব্যবস্থা খুবই উন্নত হওয়ার ফলে নাট্যপ্রযোজকেরা খুশিমতো চমকপ্রদ

নাট্যমুহূর্ত তৈরি করতে পারছেন অনায়াসে এবং অনেকসময় এইসমস্ত কারিগরি কৌশলে নাটক প্রাণময় হয়ে উঠছে।

এখন প্রযোজক একটি এফেক্ট-এর ওপর প্রয়োজনে তিনটি এফেক্ট পর্যন্ত চাপিয়ে দিতে পারেন। কোনো এফেক্টকে ভেঙে নতুন শব্দমালা সৃষ্টি করতে পারেন—কোনো সংগীতের এফেক্টকে দ্বিগুণ গতিতে চালিয়ে বা ফিডব্যাক করিয়েও প্রয়োজনীয় নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারেন। আবার কোনো সংলাপকে কারিগরি কৌশলের মাধ্যমে বহুগুণিত করে তীব্র নাট্যাবেগ সৃষ্টি করাও প্রযোজকের পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়।

বেতারে 'ভোর' বোঝাতে ব্যবহার করা হয় পাখির কলকাকলি, গ্রামের 'ভোর' বোঝাতে মুরগির ডাক এবং পাখির কিচিরমিচির, রাত্রি বোঝাতে কুকুরের ডাক, ঝিঁঝি, 'নীরবতা' বোঝাতে ঘড়ির টিক-টিক শব্দ অথবা ঝিঁঝির শব্দ, জঙ্গল বোঝাতে জন্তুজানোয়ারের চিৎকার, সাঁওতাল পরগনার কাহিনি হলে মাদল এবং সাঁওতালি-সংগীত পশ্চাৎপটে নাট্যাবেশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আজকাল সিনথাসাইজারে অনেক নাটকের এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে—তা ছাড়া রিদম, বক্সেও সংগীতের ভিন্ন মাত্রা সৃষ্ট হয়। স্যাকসোফোন ও ভাইব্রোফোনে টুকরো টুকরো সংগীতানুষঙ্গও অপরূপ ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে পারে নাটকে।

অনেক সময়েই প্রযোজক সংগীত পরিচালককে দিয়ে নাটকের একটি 'থিম মিউজিক' তৈরি করে নেন। এতে প্রথম থেকেই নাটকের মুডটির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন শ্রোতারা। পাশ্চাত্য যন্ত্র ছাড়াও সেতার, সরোদ, বাঁশি, ম্যাণ্ডোলিন, ক্ল্যারিয়োনেট, জলতরঙ্গ, গিটার, পাখোয়াজ, তবলা, এসরাজ, তারসানাই প্রভৃতি যন্ত্রেও প্রয়োজনীয় নাট্যসংগীতানুষঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং তাতে ভারতীয় ভাবটি ভালো ফুটে ওঠে। কিন্তু এখনকার বেতারনাটকের প্রযোজকেরা পাশ্চাত্য যন্ত্রই বেশি পছন্দ করছেন। এই বশ্যতার ফলে অনেক প্রযোজনাই ভারতীয় চরিত্র যে হারাচ্ছে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। প্রযোজকবৃন্দ একদিকে যেমন গ্ল্যামার-আর্টিস্টদের দিকে ঝুঁকছেন, তেমনি ঝুঁকছেন কমার্শিয়াল সংগীতানুষঙ্গের দিকে। এর ফল অনেকক্ষেত্রেই মারাত্মক হয়ে উঠছে। বস্তুত অনেক প্রযোজনাই এইভাবে গ্ল্যামার আশ্রয় করে বাঁচতে চাইছে।

সংগীতানুষঙ্গের ক্ষেত্রে জরুরি কথা হল, সংগীত পরিচালক, যিনি কোনো নাট্য প্রযোজনায় কাজ করবেন, সংগীতের সঙ্গে তাঁর নাট্যবোধ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁকে মনে রাখতে হবে নাট্যরসকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই তিনি সংগীত রচনা করছেন। সেজন্য তাঁকে সবসময়ে প্রযোজকের চিন্তাকে অনুসরণ করতে হবে। সংগীত পরিচালকের প্রচারিতব্য নাটকটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এজন্য সংগীত রচনার আগে নাটকের পুরো scriptটি তাঁর পড়ে নেওয়া দরকার। নাটকের প্রয়োজনে বিশুদ্ধতা ভুলে সংগীতকে ভেঙে নানা আকার দিতে হবে এবং কখনোই একথা ভুললে চলবে না যে, সব ছাপিয়ে গড়ে উঠছে একটি 'নাট্যসংগীত' যা তার পরিস্ফুটনকে সহায়তা করছে।

বেতারনাটকে সংগীত পরিচালক হিসেবে সেকাল থেকে একালে কাজ করেছেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাইচাঁদ বড়াল, হীরেন বসু, তারকনাথ দে, পঙ্কজকুমার মল্লিক, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ, অনল চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়লাল চৌধুরী, প্রবীর মজুমদার, অলোকনাথ দে এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এঁরা সকলেই নাট্যসংগীতানুষঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে সফল। তবে সংগীতানুষঙ্গে আধুনিকতার হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন অলোকনাথ দে, প্রবীর মজুমদার ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ এবং প্রিয়লাল চৌধুরীর কথাও উল্লেখ করতে হবে—সত্তরের দশকে বহু নাটকে তাঁরা অপূর্ব সংগীতানুষঙ্গ রচনা করেছিলেন। কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণের সংগীতে সুখ্যাত হয়ে ওঠে 'সংশয়', 'জিপ দুর্ঘটনা' এবং 'স্ত্রীর পত্র'। প্রিয়লাল চৌধুরী ছিলেন মূলত শিশুনাট্যের সংগীত পরিচালক—এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর অতুলনীয় সংগীতে 'শিশুমহল' ও গল্পদাদুর আসরের অনেক নাটক প্রাণ পেয়েছিল। এই মুহূর্তে মনে পড়েছে তাঁর সংগীতসমৃদ্ধ 'পলাতক আলো' এবং 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' নাটক দুটির কথা।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সংগীত পরিচালক হিসেবে বিখ্যাত করে তোলেন সংগীতবহুল বেতারনাটক ‘অন্তরা’-কে।

অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরারোপিত সংগীতবহুল নাটক ‘তমসা’ সেকালের একটি অনবদ্য প্রযোজনা। অলোকনাথ দে সংগীতানুষঙ্গ রচনা করেছিলেন ‘সেপ্টোপাসের খিদে’, ‘তিমি তিমিঙ্গিল’ ‘কালনেমি’, ‘রবিবার’, ‘এই আঁধারে’, ‘নিশিপাওয়া’ প্রভৃতি নাটকে। সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি দু-বার আকাশবাণীর বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হন। প্রবীর মজুমদার সংগীতের মাধ্যমে অপূর্ব নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করেছিলেন ঋত্বিক ঘটকের কিংবদন্তিপ্রতিম বেতার-প্রযোজনা ‘জ্বালা’য়। সম্ভবত ‘স্ট্রাইকার’ নাটকেও সংগীত পরিচালক ছিলেন তিনিই।

সংগীতানুষঙ্গ যেমন নাট্যাবর্ত এবং মুড সৃষ্টি করে, তেমনি প্রয়োজনে সংকেতধর্মীও হয়ে উঠতে পারে। যেমন শব্দপ্রক্ষেপণা—সবসময়ে তা আক্ষরিক অর্থে বাস্তব না হয়ে সাংকেতিক ব্যঞ্জনঘন হওয়াও সম্ভব। যেমন হয়তো কোনো নাটকে একটি দৃশ্যে রয়েছে, যেখানে মূল্যবোধ ধসে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রযোজক ইচ্ছে করলে ধস নেমে যাওয়ার সাউণ্ড ব্যবহার করতে পারেন। অবলম্বনহীনতা, শেকড়হীনতা একটি গাছের হুড়মুড় করে ভেঙে পড়া শব্দের মধ্যে দিয়ে সংকেতায়িত হয়ে উঠতে পারে। কোনো দৃশ্যে সংলাপের মাধ্যমে হয়তো ঘনিয়ে উঠছে ঝোড়ো আবহাওয়া, সেক্ষেত্রে ঝড়ের শব্দ একঝলক বয়ে যেতে পারে অনায়াসেই। উদ্বেল আনন্দের মুহূর্তে উচ্ছল ঝরনা বা আছড়ে পড়া সমুদ্রের জলকল্লোল খুবই কার্যকরী হতে পারে। আবার হয়তো কোনো অন্তরঙ্গ বিবশ মুহূর্ত, সেখানে দূর থেকে আভাসে একটি ট্রেনের হুইসিল প্রয়োজনীয় নেপথ্য ভিত গড়ে তুলতে পারে। সংকেতায়িত করা যেতে পারে একটি ঘড়ির সুরেলা ঘণ্টাধ্বনিকে। পতিতালয়ের দৃশ্য বুনতে বেলফুল এবং হারমোনিয়ামের চটুল আওয়াজ বা বাইজির গান ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ‘কোর্ট’ বোঝাতে গুঞ্জন এবং জাজের হাতুড়িপেটা, ‘অফিস’ বোঝাতে টাইপরাইটারের খট-খট শব্দ। ‘স্টেশন’ বোঝাতে হট্টগোলের সঙ্গে ঘোষকের কণ্ঠ, রাত্রের স্টেশন বোঝাতে ক্লান্তকণ্ঠে ‘চা গরম’ হাঁক দৃশ্যপট রচনা করতে পারে। ‘গঙ্গার ধার বোঝাতে জাহাজের ভোঁ, ‘সন্ধ্যা’ বোঝাতে মন্দিরের শাঁখ ঘণ্টা, ‘রাত’ বোঝাতে কুকুরের ডাক ও ঝগড়া, ঝিঁঝি-র শব্দ, ‘মুসলিম’ আবহাওয়া বোঝাতে আজান, ‘বার’ (Bar) বোঝাতে চটুল পাশ্চাত্যসংগীত আজ পর্যন্ত বেতারের সব নাটকেই প্রচলিত প্রযোজনারীতি হিসেবে গ্রাহ্য।

কোনো দৃশ্য আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তকে Green-Flick বা G. F. হিসেবে চিহ্নিত করে নেওয়া হয়। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর চলে যাওয়ার মাঝে মাঝে পরিবেশের উপযুক্ত ইন্টারলিউড বা দৃশ্যান্তরের সংগীত। অবশ্য Green-Flick-Theory সবসময় না মানলেও চলে। অনেকসময় দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার মুহূর্তে এক বা দু-সেকেণ্ডের নীরবতা বেশ কাজ করে।

নীরবতা প্রসঙ্গে মনে পড়ে রেডিয়ো কার্টুনের একটি অনুষ্ঠান, যেখানে কার্টুনিস্ট ভুট্টোর জনসভার বিবরণ দিতে গিয়ে ৪৫ সেকেণ্ডের নীরবতা ব্যবহার করেছিলেন। দিলীপকুমার সেনগুপ্ত বেতারে এই ধরনের অনেক কার্টুন করে রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এইসব কার্টুনে সমাজ, রাজনীতি নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষপূর্ণ ২, ৩ বা ৫ মিনিটের অনুষ্ঠান হত।

সম্প্রতিকালে এই ধরনের ভিন্নরসের আর একটি অনুষ্ঠান ‘যদি’-র প্রবর্তন করেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী, মানুষের নাগরিক দায়িত্ব এবং বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যার ওপর স্কেচধর্মী এই অনুষ্ঠানও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে অল্প কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতিকালে পুরোনো ক্লাসিক হাস্যরসাত্মক রচনায় পুনরুদ্ধারের আর একটি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় ‘তুবড়ি’ অনুষ্ঠানে। নিয়মিত সাপ্তাহিক এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক ছিলেন সুভাষ দাস। শ্রীদাস ‘তুবড়ি’তে কিছু উপভোগ্য অনুষ্ঠান উপহার দিতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, নীরবতার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 'Silence in beauty'—এ প্রবচনটি ফিলমের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বেতারের ক্ষেত্রেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য বেতারে নীরবতার স্থায়িত্ব এক বা দু-সেকেণ্ডের বেশি হওয়া উচিত নয়, সম্পূর্ণ নীরবতার সুযোগ বেতারে খুবই কম।

একসময়ে বেতারে কয়েকটি সংগীতানুষঙ্গ বা শব্দ শ্রোতাদের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং এই চর্বিতচর্বণ বিরক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। নাটক নতুন হলেও তার ফ্রেশনেস বজায় রাখতে হলে শব্দ সংযোজনা ও সংগীতে নিত্য নতুনত্ব থাকা চাই। বোধ হয় এইরকম ভাবনা থেকেই কিছু কিছু নাটকের জন্য মিউজিক এফেক্ট তৈরি করে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। নাটককে সজীব হয়ে উঠতে হলে সংগীতানুষঙ্গ একান্তই দরকার। কিছু স্টক মিউজিক ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু লক্ষ রাখতে হবে, তা যেন বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে না পড়ে।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, সংগীতকারের যেমন নাট্যবোধ থাকা জরুরি, তেমনি প্রযোজকেরও সংগীত সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজন।

অনেক প্রযোজক, যেমন জয়ন্ত চৌধুরী ও প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় নাটকে বেশি শব্দানুষঙ্গ ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। জগন্নাথ বসুও দু-একটি নাটকে এমনই নিরীক্ষা করেছেন। এফেক্ট ব্যবহারের ব্যাপারে প্রযোজকের পরিমিতবোধের একান্ত প্রয়োজন, নইলে সংগীতের ভারে অভীষ্ট নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হবেই। আবার প্রযোজককে এদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন নাটকের চেয়ে সংগীত-এফেক্ট, প্রাধান্য না পায় বা সংগীতের জন্য নাটক সম্পর্কে শ্রোতা মনস্কতা না হারায়। তাই সংগীতানুষঙ্গ যেটুকু নইলে নয়, সেটুকুই ব্যবহার করা উচিত।

আবার অনেক প্রবীণ প্রযোজককে দেখেছি, পরিশ্রম বাঁচাতে একটি ৩০ মিনিটের সেতার বা সরোদের টেপ নিয়ে তারই বিভিন্ন জায়গা থেকে টুকরো টুকরো অংশ অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করতে। এতে বহু নাট্যমুহূর্ত সংগীত মূর্ছনার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। একই রাগভিত্তিক সংগীত বার বার ফিরে আসার দরুন একঘেয়েও হয়ে যেতে পারে।

বেতারে নাট্যসংলাপ রেকর্ডিং-এর সময় প্রযোজককে লক্ষ রাখতে হবে কখনোই কোনো কণ্ঠের পুরো ফ্লেভার যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। অনেক চরিত্র একসঙ্গে অভিনয় করার সময়ে এ ধরনের সমস্যা প্রায় দেখা যায়। কান্না, হাসি, কাশি চিৎকার কখনোই সোজাসুজি মাইক্রোফোনে রেকর্ড করা উচিত হবে না। এক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রী মুখখানা একটু side করে নিলেই blasting ভাবটা থাকে না এবং শুনতেও ভালো লাগে। প্রযোজককে প্রথমে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের সমতা পরীক্ষা করে নিতে হবে। দেখতে হবে প্রতিটি কণ্ঠের স্ফূর্তি আছে কি না, বা রেকর্ডিং-এ হামিং সাউণ্ড ডিস্টরশান আছে কি না—এজন্য পরীক্ষামূলকভাবে ফাইনাল রেকর্ডিং-এর আগে কিছুটা সংলাপ রেকর্ড করে দেখা ভালো। তারপর রেকর্ডিং-এর সময় প্রযোজককে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে অভিনেতা-অভিনেত্রী ঠিকভাবে স্ক্রিপ্ট পড়ছে কি না, কোনো জায়গা বাদ পড়ছে কি না বা কোনো সংলাপ উচ্চারণে ভুল হল কি না, বা কোনো সংলাপ বলার সময়ে ভাবের অভাব ঘটল কি না। এর কোনো একটা ঘটলেই প্রযোজকের উচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বাধা দিয়ে ব্যাপারটি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজককে নজর রাখতে হবে প্রযোজনা সহকারী ঠিকমতো রেকর্ড করছে কি না। কারণ তিনি অন্যমনস্ক হলেও নাটকের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ রেকর্ডিং নাও হতে পারে বা সংলাপের সঙ্গে যে প্রতিধ্বনি বা অন্য ধ্বনি নেবার কথা ছিল, তা না নেওয়াও হতে পারে।

কোনো সংলাপ ফেড আউট করার প্রয়োজন হলে প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে ফেডার বন্ধ করে তা করে নিতে পারেন। যেমন কেউ হয়তো কথা বলতে বলতে দূরে চলে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে স্টুডিয়োর ফেডারটি ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলেই ওই এফেক্ট এসে যাবে। জয়ন্ত চৌধুরীকে এভাবে তাৎক্ষণিক অনেক এফেক্ট সংলাপ রেকর্ডের সময়েই করে নিতে দেখেছি। কারিগরি ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি অনেক প্রযোজককে চমক

সৃষ্টির দিকে প্রলুব্ধ করে—কিন্তু মনে রাখতে হবে, অযথা চমক সৃষ্টির ফলে সমস্ত প্রয়াসটিই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নাটকে চমক সৃষ্টি হতেই পারে, কিন্তু চমকসৃষ্টি যেন নাটককে শিল্পমন্ডিত করে তোলে। প্রযোজকের এই দিকটিতে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেখানে অভিনয়ের জোর আছে, অভিনয়ই নাট্য পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, সেক্ষেত্রে বাহুল্য হিসেবে সংগীতের প্রয়োগ না করাই বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, যেখানে চলাটাই ছন্দময়, সেখানে নূপুর পরিয়ে নতুন করে ছন্দ সৃষ্টির কী দরকার? প্রযোজকের মুনশিয়ানা সেইখানে, যেখানে সামগ্রিকভাবে তিনি নাট্য পরিস্থিতিকে grip করতে পারছেন। সেটা কীভাবে করবেন সেটা প্রযোজকের নিজস্ব ব্যাপার। এ ব্যাপারে বাঁধাধরা কোনো নিয়ম বা ফর্মুলা নেই। প্রযোজকই নির্ধারণ করবেন কোন পথে কীভাবে চলে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছোবেন। এজন্যই প্রথম থেকে সবরকম বাহুল্য বর্জন করে চলা দরকার। তাতে নাটক যেমন গতি পাবে, তেমনি সেই গতি হবে অনায়াস, স্বচ্ছন্দ এবং শিল্পসৌন্দর্যে আকর্ষণীয়। চরিত্রের উপযুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনের সময় প্রযোজককে যথাযথ কণ্ঠ এবং অভিনয়দক্ষতার ওপর জোর দিতে হবে। কোনো চরিত্রে হয়তো ফ্যাসফেসে গলা দরকার, সেক্ষেত্রে নিটোল কণ্ঠ ব্যবহার করলে চরিত্র ফুটবে না। বস্তুত একমাত্র লিরিক্যাল ড্রামা ছাড়া অন্যত্র নিটোল স্বর্ণকণ্ঠের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে নাটকে সব রকমের কণ্ঠেরই প্রয়োজন আছে। কণ্ঠই বেতার নাটকে নাট্য-ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। শুধু দেখতে হবে সেই কণ্ঠের অভিনয়যোগ্যতা কতখানি। এই অভিনয়যোগ্যতা এবং কণ্ঠের চরিত্র বুঝে প্রযোজক তার কাস্টিং তৈরি করেন। এমনও হয় কোনো কোনো সময় ক্লোজ বুকিং থাকার জন্য হয়তো প্রযোজক তাঁর পছন্দমতো শিল্পীকে পেলেন না—বিকল্প শিল্পী হিসাবে যাঁকে পাওয়া গেল, তিনি শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রযোজকের চিন্তাকে রূপ দিতে পারলেন না—সেক্ষেত্রে এই খামতিটুকু পূরণ করার জন্য প্রযোজককে প্রযোজনাগত কিছু কৌশলের ওপর নির্ভর করতে হবে—এবং দেখা যায় অনেকক্ষেত্রে প্রযোজক প্রযোজনা-কুশলতায় ব্যাপারটাকে উতরে দিতে পারেন।

অভিনেতা-অভিনেত্রী যেভাবে অভিনয় করতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন, তাঁকে সেভাবে অভিনয় করার স্বাধীনতা দেওয়াই বোধ হয় সমীচীন—তাতে চরিত্রের স্বাভাবিকতা বজায় থাকে। তবে প্রযোজক হার্মনির স্বার্থে তাঁকে যতখানি আয়ত্তে আনা দরকার, তা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু সেটাও কঠোরভাবে নয়, কঠোরভাবে করতে গেলেই তা চাপানো ব্যাপার হয়ে যাবে—সুতরাং একটু-আধটু বিচ্যুতি প্রযোজককে ইগনোর করতে হবে। কণ্ঠ নির্বাচনের সময় প্রধান দুটি চরিত্রের কণ্ঠ যেন অভিন্ন না হয়, সেদিকে প্রযোজককে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তা না হলে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন চরিত্রকে শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা হতে পারে।

বেতারনাটক যেহেতু শব্দের মাধ্যমে গড়ে উঠছে, তাই সমস্ত অ্যাকশনগুলি পারম্পর্যে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে কি না, সে-বিষয়েও প্রযোজকের প্রখর দৃষ্টি থাকা দরকার। নাটক দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে গতি পাচ্ছে কি না, সেটা মুহুর্মুহু প্রযোজককে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। নাটকের কোনো অংশ 'বোর' করছে বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলে প্রযোজক এডিট করে সে-অংশ বাদ দিতে পারেন। নাট্যগতির স্বার্থে প্রযোজক নাটকের সিকোয়েন্স আগে-পরে করে নিতে পারেন। আবার প্রয়োজনে কোনো নাট্যসংলাপ বাদ দিয়ে নতুন সংলাপ লিখে নিতে পারেন।

কোনো সাহিত্যিক বা নাট্যকারের কোনো রচনা প্রযোজনা করার সময়ে প্রযোজকের সেই সাহিত্যিক বা নাট্যকারের রচনারীতি এবং জীবনদর্শন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকা একান্তভাবে দরকার—এবং তা থাকলে তবেই তিনি ওই সাহিত্যিক বা নাট্যকারসৃষ্ট চরিত্রকে ঠিক ঠিক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

নাটকে কোনো ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ থাকলে বা বহু পুরোনো আমলের কোনো কাহিনি হলে, সেই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান প্রযোজনার আগেই অর্জন করা দরকার। তাতে প্রযোজনার প্রাণ আসে।

দেশ-বিদেশের নাট্যঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে এবং সমসাময়িক নাট্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবণতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে প্রযোজকের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং প্রযোজনায় কুশলতাস্পর্শ মেলে।

অনেকসময় যান্ত্রিক বিকলতার দরুন খুব ভালো পরিকল্পনার প্রযোজনাও মার খায়। অনেকসময় এটা এত সূক্ষ্ম পর্যায়ে হয় যে, সম্পাদনার সময় তা প্রযোজকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তা ছাড়া অনেক টেপ-ডেকে আউটপুটের মধ্যেই একধরনের বিশ্রী ডিস্টরশান থাকে, সেটা সংলাপের সঙ্গে অবাধে মিশে সমস্ত সৎপ্রয়াসকেই বিনষ্ট করে ফেলে। এজন্য সম্পাদনা করার আগে মেশিনের ত্রুটিগুলি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার।

৮

এখন বলি, কীভাবে একটি নাট্য প্রযোজনা হয়। প্রযোজক প্রথমে মনোনীত নাটকটি পড়েন এবং প্রযোজনার নানা পরিকল্পনা করেন। প্রযোজক প্রযোজনার স্বার্থে স্ক্রিপ্টের কিছু অদলবদল করতে পারেন। তারপর সেই সংশোধিত স্ক্রিপ্ট টাইপ করতে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে প্রযোজক চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন করে, তাঁদের তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগে পেশ করেন। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী শিল্পীদের প্রযোজক-নির্ধারিত দিনে রির্হাসালে আসতে বলে চিঠি দেন। এরপর প্রযোজক শিল্পীদের নিয়ে রির্হাসালে বসেন এবং নাট্য-বিষয়বস্তু শিল্পীদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন এবং অভিনয়ে কোন জায়গায় তিনি কী চাইছেন, জানিয়ে দেন। পরে প্রযোজকের নির্দেশমতো বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ পাঠ করেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। প্রযোজক কোনো জায়গায় বাধা দিয়ে সংলাপ অভিনয় করে বুঝিয়ে দেন তিনি কী চাইছেন। এইভাবে সকলের অভিনয় সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছোলে প্রযোজক রেকর্ডিং-এর তারিখ সকলকে জানিয়ে দেন এবং অনেকসময় রেকর্ডিং-এর আগে মাইক্রোফোনে একপ্রস্থ রিহার্সালও হয়। (বলতে ভুলে গেছি, রিহার্সালের পর প্রযোজক প্রধান চরিত্রাভিনেতা বা অভিনেত্রীদের একটি করে স্ক্রিপ্ট-এর কপি বাড়িতে বসে পড়ে তৈরি হবার জন্য দেন।) এরপর রেকর্ডিং শুরুর আগে প্রযোজক প্যানেলে বসেন। তাঁর সামনে কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় এমন একটি স্টুডিয়োতে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ান অভিনেতৃবৃন্দ। প্রযোজক এরপর প্রথম দৃশ্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের level নিয়ন্ত্রণ করে নেন এবং সেইমতো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এগিয়ে-পিছিয়ে দাঁড়াতে বলেন। তারপর প্রযোজক ‘রেডি’ ‘সাইলেন্স’ বলে স্টুডিয়োর ফেডারটি তুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্টুডিয়োতে জ্বলে ওঠে লাল আলো। তাঁরা প্রস্তুত হন। এরপর প্রযোজক প্রযোজনা সহকারীকে টেপের রেকর্ডার টিপতে ইঙ্গিত করে অভিনেতৃদের অভিনয় শুরু করার নির্দেশ দেন।

সংলাপ রেকর্ডিং-এর সময় অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কোনো বাচনভঙ্গি প্রযোজকের অপছন্দ হলে তিনি বোতাম টিপে টকব্যাক-এ ড্রামা স্টুডিয়োর সংশ্লিষ্ট শিল্পীকে সংলাপটি কীভাবে বলতে হবে তা বুঝিয়ে দেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী তারপর সেইভাবেই সংলাপ বলেন, হয়তো আবার ভুল হয়, প্রযোজক আবার অভিনয় করে দেখিয়ে দেন, অভিনেতা-অভিনেত্রী আবার বলেন, এইভাবে যখন শিল্পীর অভিনয় প্রযোজকের মনমতো হয়, তখনই তিনি রেকর্ডিস্টকে রেকর্ড করার নির্দেশ দেন। অভিনয়ের কোনো অংশে কোনো গোলমাল থাকলেও প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে টকব্যাকে বলেন ‘কাট’ এবং রেকর্ডিস্টকে ওই অংশ ইরেজ করে নিতে বলেন। এরপর ইরেজ করা হলে প্রযোজক শেষ রেকর্ড করা সংলাপটি টকব্যাকে শিল্পীদের জানিয়ে দেন এবং শিল্পীরা পরবর্তী সংলাপ বলার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। সংশ্লিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীর সুবিধের জন্য স্টুডিয়োতে লাল আলো জ্বালা বা প্রযোজকের হাতের ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহ-অভিনেতাদের কেউ, যিনি সংলাপ বলবেন তাঁর কাঁধে বা হাতে মৃদু স্পর্শ করে তাঁকে অভিনয় করা সম্পর্কে সচেতন করেন, কেননা, তখন অভিনেতার দৃষ্টি থাকে স্ক্রিপ্ট-এর দিকে, লাল আলো বা প্রযোজকের ইঙ্গিতের দিকে নজর দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংলাপ বলার অসুবিধে হয়।

এমনও দেখা যায়, নাটকের কোনো অংশে হয়তো প্রাণমন ঢেলে অভিনয় করছেন কোনো শিল্পী, কিন্তু প্রযোজক দেখছেন অভিনয় ভালো হলেও তাঁর পরিকল্পনামতো হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে থামানো উচিত হবে না। সমস্ত দৃশ্যটি ‘টেক’ করে পরে শিল্পীকে আর একটি ‘টেক’-

এর জন্য পুনরায় অভিনয় করতে বলতে হবে। এমনও দেখা যায় প্রথম কাটের চেয়ে হয়তো দ্বিতীয় 'কাট' নিরেস হল—সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্বাভাবিকত্ব এবং শিল্পসৌন্দর্যের স্বার্থে প্রযোজক প্রথম কাটটিকেই 'ওকে' বলে চিহ্নিত করতে পারেন। বস্তুত স্ক্রিপ্ট আক্ষরিকভাবে অনুসরণ যে করতেই হবে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অনেকসময় অভিনয়ের আবেগে শিল্পী এমন সংলাপও বলে ফেলেন, যা হয়তো স্ক্রিপ্ট-এর সংলাপের চেয়ে অনেক প্রাণবন্ত। সেক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট যথাযথ অনুসরণ না করার দায়ে অভিনেতৃকে অভিযুক্ত করা ঠিক হবে না। কারণ চরিত্র ঠিক ঠিক ফুটে ওঠাই মূললক্ষ্য—এবং তা যদি একটু অন্য ধরনের সংলাপে ফুটে ওঠে, তা হলে অসুবিধেটা কোথায়? প্রযোজক অভিনেতৃদের নির্দেশ দেবেন ঠিকই, কিন্তু একই দৃশ্য তাঁর অপছন্দের জন্য বার বার অভিনয় করিয়ে শিল্পীকে ক্লান্ত করে তোলা কোনোমতেই উচিত হবে না। বিশেষত কঠিন দৃশ্য, যেখানে গলা ভাঙতে হয়, দমের প্রয়োজন খুব বেশি, সেইসব দৃশ্য বার বার অভিনয় করালে শিল্পী হয়তো তাঁর কণ্ঠের সৌকর্য হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং তার ফলে পরবর্তী কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশে তাঁর অভিনয় মার খেতে পারে। শিল্পীদের সঙ্গে প্রযোজকের আচরণ হতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। প্রযোজকের মনে রাখা দরকার এই শিল্পীরাই হলেন তাঁর পরিকল্পনার রূপকার। সুতরাং তাঁকে যেমন সবদিক দিয়ে শিল্পীদের সহযোগিতা করতে হবে, তেমনি শিল্পীদেরও উচিত প্রযোজককে সহযোগিতা করা। অনেকক্ষেত্রে এমন হয়, কোনো প্রযোজনায় হয়তো খুবই নামি কোনো শিল্পী এলেন, এবং প্রথম থেকেই তিনি প্রযোজককে অনুকম্পা এবং করুণার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন—এরকম সৌজন্যবিরোধী আচরণের ফলে প্রযোজকের মনঃসংযোগ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং শিল্পীর অনমনীয় মনোভাব প্রযোজনাকে পরিকল্পনাহীন, এলোমেলো করে তুলতে পারে। এজন্য মনে হয় খুব নামিদামি অহংকারী শিল্পীদের চেয়ে নিষ্ঠাবান কমনামি শিল্পীদের নিয়ে কাজ করাই বোধ হয় ভালো। এতে সামগ্রিকভাবে কাজ ভালো হয়। অবশ্য নামিদামি শিল্পীরা সকলেই এরকম নন, বেশিরভাগ শিল্পীরাই প্রযোজককে সহযোগিতা করেন। আবার প্রযোজকের এ মনোভাব থাকা উচিত নয় যে, তিনি সর্ববোদ্ধা এবং তাঁর মতো গুণী আর কেউ নেই। প্রযোজকের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় সম্পর্কে কোনো মনোবেদনাকর মন্তব্য করা কখনোই উচিত হবে না। বরং প্রযোজককে প্রতি মুহূর্তে শিল্পীদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। প্রযোজকের আচরণ হওয়া উচিত সৌজন্যপূর্ণ এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তাতে তিনি শিল্পীদের কাছ থেকে ভালো কাজ পাবেন। প্রকৃতপক্ষে প্রযোজনার সাফল্য নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে অভিনেতৃদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর। এবং এই বোঝাপড়া বজায় রাখতে চাই সকলের সঙ্গে সুষ্ঠু আদানপ্রদান এবং হার্দ্য বন্ধুত্বপূর্ণ সহমর্মিতা।

রেকর্ডিং চলাকালীন যেখানে সংলাপ ইকো বা প্রতিধ্বনিতে নিতে হবে, সেই অংশটি আগেই চিহ্নিত করে নেন প্রযোজক, এবং ওই সংলাপ 'টেপ' করার সময় ইকো-ফেডার দিয়ে প্রয়োজনীয় এফেক্টটি সরাসরি রেকর্ড করে নেন। কোনো কারণে ইকো-ফেডার দিতে ভুলে গেলে সম্পাদনার সময় দুটি টেপে একই সংলাপ তুলে নিয়ে প্রথম টেপটি চালানোর এক-দু সেকেণ্ড পরে দ্বিতীয় টেপটি চালিয়ে ইকোর মতো এফেক্ট পেতে পারেন। অবশ্য এটা পুরোপুরি ঠিক ইকো এফেক্ট-এর মতো হয় না—একটি সংলাপের পরে সেই সংলাপটিই ফিরে এসে প্রতিধ্বনিত কাছাকাছি এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারে। আবার ডবল প্যাচ কর্ড-এর মাধ্যমে একই চ্যানেলে দুটি প্যাচ-কর্ড দিয়ে ফিডব্যাক এফেক্ট-এর দ্বারা প্রযোজক ইকোর মতো বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে সংলাপ বহুগুণিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী একসঙ্গে অভিনয় করার সময় শব্দ জট পাকিয়ে যেতে পারে, সেইজন্য এইসব দৃশ্যে 'টেক' করার আগে প্রযোজককে স্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে কোন সময়ে কার কণ্ঠ প্রমিনেন্ট থাকবে, এবং অভিনেতৃদেরও নজর রাখতে হবে আবেগের টানে তিনি যেন অন্য অভিনেতৃর প্রয়োজনীয় সংলাপ চাপা দিয়ে না ফেলেন। এইসব দৃশ্যে 'ক্রাউড' (crowd) থাকলে তাঁদের অন্য জোনের (zone) মাইক্রোফোন ব্যবহার করার জন্য প্রযোজক নির্দেশ দিতে পারেন। এইসব দৃশ্য 'টেক' করার সময়ে তাই অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং প্রযোজক—দু-পক্ষকেই মনঃসংযোগ করে কাজ করতে হবে।

নাটকে কিছু কিছু তাৎক্ষণিক এফেক্ট সংলাপের সঙ্গে রেকর্ড করার সময় সহ-অভিনেতারা মূল অভিনেতাকে সাহায্য করেন, যেমন দেশলাই জ্বালার দৃশ্য থাকলে সহ-অভিনেতা কেউ সেটা শব্দ করে মাইক্রোফোনের সামনে জ্বালেন এবং যিনি সিগারেট ধরাচ্ছেন সেই অভিনেতা সুখটান এবং ধোঁয়া ছাড়ার অ্যাকশন করেন। হুঁকো খাওয়ার দৃশ্যেও এরকম করা হয়। এ ছাড়া ক্রাচ নিয়ে হাঁটা, চড় মারা, বেত মারা, এসব দৃশ্যেও সহ-অভিনেতাকে সাহায্য করেন অভিনেতৃদের কেউ।

এইভাবে রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পর প্রযোজক এবং প্রযোজনা সহকারী নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ও সংগীতের সমস্ত এফেক্ট সংগ্রহ করেন। তারপর বসেন সম্পাদনায়।

এডিটিং রুম-এ মোট চারটি টেপডেকের মাঝখানেরটিতে থাকে ব্ল্যাংক টেপ (যাকে বলা হয় মাদার টেপ)—যাতে অনুষ্ঠানটি সমস্ত শব্দানুষঙ্গসমেত তৈরি করা হবে। বাঁ-দিকের টেপ ডেকে থাকে সংলাপ, ডান দিকে তৃতীয় টেপ ডেকে থাকে সাউণ্ড এফেক্টস এবং চতুর্থ টেপ ডেকে থাকে মিউজিক এফেক্টস বা অন্য ন্যাচারাল এফেক্টস—দ্রুত কাজ করার জন্য অনেক সময়ে এই ন্যাচারাল এফেক্টসগুলি পঞ্চম টেপ ডেকে রাখা হয়। এরপর যেখানে যেমন দরকার তা সংযোজন করে প্রযোজকের পরিকল্পনা রূপ পেতে থাকে। এখনকার মেলট্রন টেপ ডেক-এ সম্পাদনা চলাকালীন সময়ের আঁচ পাওয়া যায়। ফলে অনুষ্ঠান প্রণয়ন কালেই প্রযোজক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাটকের কোনো অংশ কাটতে বা ছাঁটতে হবে কি না।

এইভাবে পুরো নাটকটি তৈরি হয়ে গেলে সমস্ত রোলের অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংগীত পরিচালক, সম্পাদক এবং প্রযোজকের নাম, অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব, প্রারম্ভিক কথা, অন্ত কথা এসব লিখে একটি নির্দেশপত্র তৈরি করে টেপবক্সের ভেতরে রেখে দিতে হয়। এ ছাড়া টেপে একটি ফ্ল্যাগ করে তাতেও অনুষ্ঠানের নাম, টেপ নম্বর, প্রচার তারিখ—এসব লিখে দিতে হয়। টেপবক্সে যে নির্দেশপত্র থাকে, তার একটি কপি স্ক্রিপ্ট-এর সঙ্গে গেঁথে দিতে হয়। এরপর টেপ জমা পড়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে—সেখান থেকে প্রচারের দিন বা দু-একদিন আগে ডিউটি রুম-এ চলে আসে। প্রচারের কিছুক্ষণ আগে চলে যায় স্টুডিয়োতে ঘোষকের কাছে।

বর্তমানে অবশ্য নাট্যানুষ্ঠান তৈরি করার পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে কম্পিউটারে, এতে অনুষ্ঠানের ঝকঝকে ভাব আরও বেশি পাওয়া যাচ্ছে।

৯

বেতারনাটক লেখবার সময় নাট্যকারকে সমস্ত নাটকটি শব্দের মধ্যে দিয়ে ভাবতে হবে। দৃশ্য, পরিস্থিতির বর্ণনা, চরিত্রের চেহারা এবং অ্যাকশন সংলাপের মধ্যে বুনে দিতে হবে। চরিত্রকে চেনার জন্য বার বার তাদের নাম সংলাপের মধ্যে থাকা চাই।

নাটকে হয়তো কেউ কারওর দিকে তাকিয়ে আছে—সেক্ষেত্রে ওই তাকিয়ে থাকার ব্যাপারটি সহ-অভিনেতা কারওর সংলাপে থাকতেই হবে, সেহয়তো বলবে, কী দেখছ অমন করে?

নিঃশব্দে কেউ কাঁদছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে বোঝাতে অন্য কোনো অভিনেত্রীর সংলাপে লিখতে হবে, কাঁদছ, দু-চোখ যে জলে ভেসে যাচ্ছে!

কারওর প্রস্থানকে দৃশ্যময় করতে সংলাপে লিখতে হবে, 'চলে গেল'!

নাটকের কোনো চরিত্র হয়তো জঙ্গলে মধুসংগ্রহ করতে যাচ্ছে। সেখানে সংলাপে জঙ্গলের কিছুটা বর্ণনা দর্শককে পরিস্থিতির সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করে।

কেউ হয়তো ছুরি দিয়ে কাউকে খুন করতে যাচ্ছে—সেখানে সহ-অভিনেতার সংলাপে মানানসই করে তা ঢুকিয়ে দিতে হবে, হয়তো সে বলবে, 'ছুরি বার করেছিস, তবে রে।' হয়তো তারপর সে অভিনেতার হাত মুচড়ে ছুরিটা কেড়ে নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে সংলাপে লিখতে হবে, 'হাত মুচড়ে ভেঙে দেব, ফ্যাল, ফ্যাল ছুরি'। সঙ্গে সঙ্গে অন্য অভিনেতা হয়তো 'উঃ' 'আঃ' ইত্যাদি যন্ত্রণার্ত আওয়াজ করবে।

কোনো চরিত্র হয়তো ঘুমোচ্ছে, এমন সময় অন্য চরিত্র প্রবেশ করছে, এক্ষেত্রে প্রবেশ করেই সেবলবে, 'ঘুমিয়ে পড়েছে, আহা, সারাদিন যা খাটে, বসি একটু মাথার কাছে...।'

এইভাবে সে যে মাথার কাছে বসবে, সেটা সংলাপের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কেউ হয়তো গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। অন্য কেউ হয়তো তাকে দেখছে। সেক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিটির অবস্থা অন্যজনের সংলাপের মধ্যে থাকা চাই।

এইভাবেই কেউ হয়তো কাউকে প্রণাম করছে। সেক্ষেত্রে যাকে প্রণাম করছে, তার সংলাপ হবে, 'থাক থাক, আর প্রণাম করতে হবে না। দীর্ঘজীবী হও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।' বেতার নাট্যকারকে মোটামুটিভাবে প্রয়োজনার রূপরেখাটি লিখে দিতে হবে—যেমন সিকোয়েন্সে কোথায় কী sound-effect থাকবে, কোথায় সংগীতের effect থাকবে ইত্যাদি। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকটি গতিসম্পন্ন হচ্ছে কি না সে-বিষয়েও নাট্যকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

চরিত্রাবলি ঠিক ঠিক ফুটে উঠছে কি না সে-বিষয়ে নাট্যকারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সংলাপের মধ্যে বাড়তি কোনো শব্দ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা বাদ দিতে হবে এবং সংলাপ এমন করতে হবে যাতে তা সহজেই শ্রোতার বোধগম্য হয়। দীর্ঘ সময়সীমার নাটকে ব্যাপক প্রস্তাবনার সুযোগ যেমন থাকে, তেমনি চরিত্রকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পরীক্ষিত করে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ থাকে। কিন্তু অল্প সময়সীমার নাটকে ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত এবং তীব্রভাবে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

বেতার নাটকে সেটের বর্ণনা যেহেতু সংলাপের মধ্যেই বুনে দেওয়া হয়, তাই আলাদা করে সেটের বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বেতার নাটক হচ্ছে টুকরো টুকরো দৃশ্যের সমাহারে একটি কাহিনির বিন্যাস ও পরিণতি। এদিক দিয়ে চলচ্চিত্রের সঙ্গে এর বেশ মিল লক্ষ করা যায়।

বেতার নাট্যকার হিসেবে প্রথম যুগে কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুশীল মুখোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, সলিল সেন, প্রফুল্ল রায়, মন্মথ রায়, অগ্নি মিত্র, প্রসূন মিত্র, বিমল রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় (সুখচর), প্রশান্ত চৌধুরী, জয়ন্ত চৌধুরী, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুশীল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, মন্মথ রায় এবং অগ্নি মিত্র নাট্যরূপের পাশাপাশি মৌলিক বেতারনাট্যও রচনা করতেন। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা' এবং 'ডাক দিয়ে যাই' নাটক দুটির কথা। এ নাটক দুটি সেকালে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটকে অকল্পনীয় মানের অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র। 'ডাক দিয়ে যাই' নাটকটি ছিল ডাকপিয়োনদের নিয়ে লেখা। বিধায়ক ভট্টাচার্যের আর একটি নাটক 'সরীসৃপ' আকাশবাণীর বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। এদের পরবর্তীকালে আকাশবাণী আয়োজিত বেতার-নাট্যরচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হন অতনু সর্বাধিকারী এবং রতনকুমার ঘোষ। আরও পরবর্তীকালে সত্তরের দশকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রচারমূলক বেতারনাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বভাবতই এঁরা বেতার-নাট্যকার হিসেবে ব্যাপকভাবে কাজ করার সুযোগ পান।

প্রথিতযশা নাট্যকারদের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও বহু সার্থক বেতারনাটক লিখে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। শোনা যায়, তিনি এ ব্যাপারে এত পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে, নাটকের সময়সীমা অনুযায়ী মেপে লিখে আনা তাঁর নাটক থেকে একটি লাইনও বাদ দেওয়া যেত না। তা ছাড়া সংলাপ রচনা ও বিন্যাসে তাঁর মুন্সিয়ানা ছিল উন্নত মানের। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে সংগীতবহুল নাটক 'অন্তরা' শ্রোতার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। প্রশান্ত চৌধুরী নাট্যরূপ করেছিলেন তাঁর স্বরচিত উপন্যাস 'ঘণ্টাফটক'-এর। সামন্ততান্ত্রিক কালের ওপর লেখা এ নাটকটিও সেকালের বহু শ্রোতার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শচীন সেনগুপ্তের মৌলিক বেতারনাটক 'তটিনীর বিচার' এবং 'প্রলয়' সেকালের শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। এরপরের যুগে নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন মনোজ মিত্র, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদুইন, রমেন লাহিড়ী, অনিল ভৌমিক, জহর দাশগুপ্ত, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধু গুপ্ত, সন্তু বসু, তৃপ্তি মিত্র, রমাপ্রসাদ বণিক, অংশুপতি দাশগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, সমর চৌধুরী, (তিমি তিমিঙ্গিল/কাহিনি : নারায়ণ সান্যাল) অলক ভট্টাচার্য, সমীর দাশগুপ্ত, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপদ দাশগুপ্ত, রঞ্জিৎকুমার সর্দার, অশোক

চট্টোপাধ্যায়, নরেন দত্ত, সুভাষ বসু, সৌমিত্র বসু, শেখরচন্দ্র বসু, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শংকর দাশগুপ্ত, নিরূপ মিত্র, মিহির সেন, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিনতা রায়, সৌম্যেন চৌধুরী (২টি নাট্যরূপ করেন), মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের (একটি নাট্যরূপ করেন) এবং বর্তমান লেখক। পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' গল্পের নাট্যরূপ দেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজস্র নাট্যরূপের মধ্যে এই মুহূর্তে বিশেষ করে মনে পড়ছে 'তামাকু সেবনের অপকারিতা' নাটকটির কথা।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতির মৌলিক বেতারনাট্য 'মোনাভনা', ও 'প্রসন্ন সকাল' শ্রোতাকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। জহর দাশগুপ্তর ভিন্নস্বাদের নাটক 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' পরিবেশিত হয়েছিল বেতার নাট্যোৎসবে। বেতারনাটকের ইতিহাসে এটি ছিল নিরীক্ষামূলক একটি অত্যাধুনিক নাটক। সমর চৌধুরী নাট্যরূপ দিয়েছিলেন নারায়ণ সান্যালের কাহিনি অবলম্বনে 'তিমি তিমিঙ্গিল' উপন্যাসের। এ নাটকটি ছিল স্বতন্ত্র স্বাদের একটি পরীক্ষামূলক প্রয়াস। এই নাট্য প্রযোজনা আকাশবাণীর বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান লাভ করে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ্য নাটকের মধ্যে আছে—'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'মৃত্যুসংবাদ', ও 'গন্ধরাজের হাততালি'। তিনি লিখতেন অ্যাবসার্ড নাটক। অলক ভট্টাচার্য লিখেছেন কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজের জীবনী অবলম্বনে মৌলিক নাটক 'মৃত্যুহীন প্রাণ'। এই নাটকটি ১৯৮৮ খ্রি. আকাশবাণীর বার্ষিক সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে।

সৌম্যেন চৌধুরী ২টি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন—প্রফুল্ল রায়ের কাহিনি অবলম্বনে 'মাটি আর নেই' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প অবলম্বনে 'পথভুলে'। মতি নন্দী দিয়েছিলেন নিজের কাহিনি 'স্ট্রাইকার'-এর নাট্যরূপ। এটিও সর্বভারতীয় পুরস্কার পায়।

সূচনার কাল থেকে বেতারনাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদিযুগ থেকে দীর্ঘকাল বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ কাহিনি এবং শচীন সেনগুপ্তের কিছু নাটক ছাড়া এক ধরনের ভাবপ্রবণতাই বেতারনাটককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অনেক পুরোনো ক্ল্যাসিক নাটকও তেমনভাবে বেতারে প্রচারিত হয়নি। সমসাময়িক যুগসমস্যা নাটকে বিশেষ প্রতিফলিত হয়নি। অধিকাংশ কাহিনি ছিল উদ্দেশ্যবিহীন, কাহিনির জন্যই কাহিনি। কিন্তু সেকালের নাট্যকারদের সামনে শিল্পগুণসম্পন্ন কাহিনির যে অভাব ছিল তা কখনোই বলা যায় না। কাহিনিবিন্যাসে নাট্যকারের বোধ ও ভাবনা তাই সীমিত গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সংলাপের মধ্যে পেলবতা যতটা লক্ষ করা যেত, ঋজুতা, বলিষ্ঠতা এবং বুদ্ধিদীপ্ততা তেমন পরিলক্ষিত হত না। ফলে বেতার নাটক বিষয়বস্তুর দিক থেকে যুগের প্রতিনিধিত্ব খুব-একটা করতে পেরেছে বলে মনে করা যায় না। কাহিনি নির্বাচনে সেন্টিমেন্টালিজমেরই প্রশ্রয় ছিল। দিকপাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর অসাধারণ অভিনয়ের জন্যেই এইসব নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল। অবশ্য রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতার মূলধনেই বেতারনাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সুতরাং ওই দুই মাধ্যমের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং প্রবণতার ছাপ স্বভাবতই বেতারনাটকের মধ্যে এসে গিয়েছিল। তা ছাড়া সেযুগটা ছিল পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটকের যুগ। অভিনয়সর্বস্বতাই শিল্পের অন্য শর্তগুলিকে আড়াল করে রাখত। তা ছাড়া বেতার-নাট্যকার হিসেবে সেযুগে যাঁদের পেয়েছি, তাদের অধিকাংশরই বেতার-নাট্যরচনার ক্ষেত্রে অসাধারণ কোনো প্রতিভা ছিল না। এই শিল্পমাধ্যমে—সেছিল তাঁদের শিক্ষানবিশির কাল। গুণগত উৎকর্ষের প্রতিযোগিতাও ছিল না একটুও। ঘটনাচক্রে যাঁরা কাছে এসে পড়েছিলেন, তাঁদেরই গড়েপিটে নিয়ে কাজ চালানো হত। শ্রোতাও মাধ্যমটিকে একটু একটু করে চিনছিলেন, সুতরাং তার প্রত্যাশাও খুব-একটা বেশি কিছু ছিল না।

এইভাবেই বেতারের অনেকটা কাল কেটেছে। তারপর ষাটের দশকের শেষের দিকে বিষয়বস্তুতে নানা বৈচিত্র্য এবং বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় পাওয়া গেছে। সেই রেশ ফুরিয়ে গিয়ে আবার বদ্ধ আবর্তের মধ্যে বিষয়বস্তু ঘুরপাক খেয়েছে দীর্ঘকাল; মাঝেমধ্যেই তার থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে কিছু মনে রাখার মতো বিষয়বস্তু। কিন্তু খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাঁচার পাখি বার বারই খাঁচায় ঢুকে পড়ে—বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বেতারনাটকে এই প্রবণতা বার বার লক্ষ করা গেছে। একদিন দু-দিনের জন্য ধনী হয়ে তা ফের ফকির হয়ে

গেছে। যোগ্য এবং প্রতিভাধর নাট্যকারদের বেতার সম্পর্কে অনীহা আছে, তাঁরা বেতারে আসতে চান না একথা সত্যি, কিন্তু কেন আসতে চান না সেটাও ভেবে দেখা দরকার। শিল্পশোভন প্রচারের স্বার্থে যে-করেই হোক এদের বেতারে নিয়ে আসা অবিলম্বে দরকার। একসময় এরকম প্রতিভাসম্পন্ন বেশ কিছু নাট্যকার বেতারে এসেছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তারা যে-কোনো কারণেই হোক সরে গেছেন। ফলে আবার সেই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

বেতার সম্প্রচারের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা মনে রেখে নাট্যকারকে এমন নাট্যবিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে, যা শ্রোতার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে। জাতীয় নীতির বিরোধী, উসকানিমূলক বা আক্রমণাত্মক কোনো রচনা বেতারে প্রচার করা উচিত হবে না। অশ্লীল প্রসঙ্গ এবং কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

বস্তুত মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, নীতি আদর্শের আশ্রয়, সুস্থ বিশ্বাসবোধ, মানুষের উত্তরণ, শান্তি ও প্রগতির বাতাবরণ, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ, গৃহকোণ থেকে জীবনের নানা প্রান্তের আর্থ-সামাজিক ও মানসিক সমস্যা, মানুষের অসহায়তা, বিপন্নতা—এ সবই বেতারনাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে। এ ছাড়া সাংকেতিক ও রূপকধর্মী নাটকেও সংকেত এবং রূপকের আড়ালে থাকা ইঙ্গিতটিও বিচারবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, যাতে তা শ্রোতৃমানসকে বিপর্যস্ত করে না তোলে।

বেতারনাটকে দেশের মহান ঐতিহ্যের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাপূর্ণ আবেদন থাকবে, তেমনি মহান ঐতিহ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রবণতাও থাকতে পারে।

বেতারনাট্যের মারফত শ্রোতা যেমন জাতির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ক্রমপরম্পরা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন, তেমনি এই জীবনযাত্রা কোন ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সে-সম্পর্কেও শ্রোতার সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। নাটকে নানা অন্ধকার দিক এনে তার থেকে মুক্তির উপায়টি নির্দেশিত হওয়া দরকার। ধ্বনির আয়নায় এমন জীবনের ছবি শ্রোতা যেন পায়, যা তারই জীবন, তারই প্রতিদিনের দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, সমস্যা। নাট্যকাহিনি যেন পল্লবিত লতার পর লতায় ফুলহীন পরিণতিহীন অসার সর্পিল গতি না পায়—বুঝতে হবে, ভাবতে হবে এই নাটক কাদের জন্যে প্রচার করা হচ্ছে।

এইসব কারণে আকাশবাণীতে প্রচারের আগে একটি স্ক্রিপ্টকে নানা দিক থেকে বিচার করে দেখা হয়। আপত্তিকর, জাতীয় নীতির পরিপন্থী, কুরুচিপূর্ণ বা হিংসা উদ্দীপক প্রসঙ্গ নাটক থেকে বাদ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে আকাশবাণীর নির্ধারিত নর্মসও আছে, যা কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। এমনকী বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত অনুষ্ঠানেও প্রতি পদক্ষেপে স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা আছে। স্ক্রিনিং-এর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এবং রসজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে একটি বিভাগের overall charge দিয়ে নিয়োগ করা বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন—বিশেষত বাণিজ্যিক বিভাগে। কারণ এখানে বিজ্ঞাপকদের সন্তোষের ওপর 'বিজনেস' নির্ভর করে। সাধারণ বিভাগেও স্ক্রিপ্ট মনোনয়নের ব্যাপারে পদাধিকারবলে নয়, যোগ্য এবং খ্যাতিমান কোনো নাট্যকার বা সাহিত্যিককে মাঝে মাঝে স্ক্রিপ্ট দেখার জন্য চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ করা যেতে পারে। তাতে শিল্পের গুণগত উৎকর্ষ যে বাড়বে সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, স্ক্রিনিং এর দায়িত্বাধিকারীর মনস্কতা এবং রসবোধের অভাবে অনেক সম্ভাবনাময় নাট্যমুহূর্ত বাদ চলে যেতে পারে বা অসাধারণ কোনো নাটক অপ্রচারিত থাকতে পারে। তা ছাড়া বেতারপ্রচারের 'সিরিয়াসনেস'-এর কথা ভেবে এ বিষয়ে আরও সতর্ক মনযোগ বিশেষভাবেই দরকার।

বেতার-নাট্যকারকে স্মরণ রাখতে হবে, তিনি কাদের জন্য নাটক লিখছেন এবং বেতারে কী প্রচার করা চলে বা চলে না। তাঁকে মনে রাখতে হবে, নাটকের দ্বারা তিনি যেমন শ্রোতার মনোরঞ্জন করবেন, তেমনি শ্রোতাকে শিল্পবোধে শিক্ষিত করে তুলবেন।

'মনোরঞ্জন' কথাটাও ব্যাপক সমীক্ষাসাপেক্ষ। শ্রোতার মনোরঞ্জন কীভাবে করা হবে? কী পেলে শ্রোতা খুশি হন, তাই ভেবে? নাকি, কী দিলে তাঁর রসগ্রহণের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়ে, তাই ভেবে। শ্রোতারও

রকমফের আছে। তাই আপোশমূলক দুটি ধারাই থাকতে পারে :

(১) মনোরঞ্জনমূলক (২) চিন্তামূলক। মনোরঞ্জন নাটকের পাশাপাশি সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তামূলক নাটকের আয়োজনও ব্যাপকভাবেই করা দরকার। শ্রোতাকে undermine করলে চলবে না। কারণ, ভালো প্রযোজনাকে তারিফ করার মতো বহু সমঝদার শ্রোতা আছেন।

দূরদর্শনে যেমন 'গভীর রাতের ছবি' কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, তেমনি বেতারেও Adult hour করা যেতে পারে—যেখানে স্পর্শকাতরতা বাদ দিয়ে গভীর মনস্তত্ত্বমূলক, জীবনধর্মী এবং রক্তমাংসে জীবন্ত নাটক পাওয়া সম্ভব। সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজনা করতে করতে ক্লান্ত প্রযোজকেরা এতে মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে পারেন। নাটকে কোনো ভুল তথ্য বা ভুল প্রসঙ্গের অবতারণা না হয়, সেদিকে নাট্যকার এবং প্রযোজককে কঠোরভাবে সতর্ক হতে হবে। এ ব্যাপারে সরেজমিনে সমীক্ষা বা ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জনের জন্য নাট্যকার ও প্রযোজকের সচেষ্ট হওয়া দরকার।

বেতার সম্প্রচারকে সুন্দর ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে বিভিন্নমুখী ধারায় তাকে প্রবাহিত করে জীবনের মর্মমূলে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। তবেই আসবে সত্যিকারের সার্থকতা।

১০

১৯৫৭ খ্রি. অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে প্রথম প্রচারিত হয় বাংলা নাটক 'প্রফুল্ল'। এতে অভিনয়াংশে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার এবং সরযূবালা। এরপর থেকে অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে বহু নাটক প্রচারিত হয়েছে—কিছুদিন আগে যে নাটকটি প্রচারিত হয়েছে তা হল 'মৃত্যুহীন প্রাণ'।

আকাশবাণী থেকে আগে প্রায়ই বিশেষ উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব হত। সেকালে ওই নাটকগুলি শোনার জন্য শ্রোতাদের মধ্যে অপরিসীম আগ্রহ দেখা যেত। তাঁরা কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতেন এবং প্রত্যেকটি নাটক মন দিয়ে শুনতেন। সেকালের এইরকম নাট্যোৎসবে শেক্সপিয়রের নাটক, রাজশেখর বসুর হাস্যরসাত্মক রচনা ছাড়াও নানা ধরনের নাটক হত। বেতারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যেও এইরকম একটি নাট্যসপ্তাহে সাতটি নাটক প্রচারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকীতেও সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রনাটক প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। 'কলকাতা ৩০০' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী কলকাতার ওপর লেখা নাটক প্রচার করা হয়েছিল।

রঙ্গমঞ্চ থেকে বেতারে সরাসরি নাটক প্রচারের ব্যবস্থাও হত মাঝে মাঝে। প্রথম রিলে করে শোনানো হয়েছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা'। এরপর 'শ্রীরঙ্গম' 'বিশ্বরূপা'য় রূপান্তরিত হওয়ার পরে 'আরোগ্যনিকেতন' এবং 'ক্ষুধা' সরাসরি মঞ্চ থেকে বেতারে প্রচার করা হয়। কিন্তু সমস্যা হল দৃশ্য-নাটকের অনেক ক্রিয়া শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে লাগল। কারণ বেতারে প্রচারিত হবে বলে মঞ্চনাটক তো আর সেইভাবে অভিনীত হত না—ফলে সংলাপে সূক্ষ্মতার অভাবে বোধগম্যতার দরজা খুলত না। সেকারণেই পরবর্তীকালে এই ধরনের রিলে বন্ধ হয়ে যায়।

নাট্যসিরিয়াল ও নাট্যধারাবাহিকও বেতারে আদি যুগ থেকে অনেক হয়েছে। বাণীকুমার করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র বসু রচিত নাটক 'সন্দিগ্ধ'। প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় করেছিলেন চিনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে 'নব অধ্যায়' ও ভারতের গৌরবগাথা সংবলিত 'শাশ্বত ভারত', শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজনা করেছেন 'দিশাহারার কড়চা', জগন্নাথ বসু করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে 'এই আমরা', বিমল করের 'সুখের খোঁজে', বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোথায় আলো' এবং সৈয়দ মুজতবা আলির 'পলাশপুরের পাঁচালি'।

এ ছাড়া মহিলামহলে পরিবেশিত হয়েছিল আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনি অবলম্বনে 'শশীবাবুর সংসার'।

১১

প্রথম যুগের অভিনেতা-অভিনেত্রীর পর বেতারে নায়কের ভূমিকা করে সুনাম অর্জন করেন বসন্ত চৌধুরী, নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (নহবত), শ্যামল ঘোষ, দিলীপ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সুবীর ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্তু মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, গৌতম চক্রবর্তী এবং জগন্নাথ বসু।

নায়িকার ভূমিকায় প্রতিভার পরিচয় রাখেন কেয়া চক্রবর্তী, শাঁওলি মিত্র, শ্রীলা মজুমদার, অনামিকা সাহা, নন্দিনী মালিয়া, মমতাশংকর, সুমিতা সান্যাল, জয়শ্রী সেন, বাসবী নন্দী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, বুলবুল চৌধুরী, সুলতা চৌধুরী, মীনাক্ষী গোস্বামী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস ও সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। টাইপ চরিত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (পি এল টি) অমর গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, চিন্ময় রায়, মনু মুখোপাধ্যায়, অসীম মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ রায়, ফকিরদাস কুমার, ধীমান চক্রবর্তী, ভাস্কর ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, সমর কুমার, অশোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অভিনেত্রীদের মধ্যে টাইপ চরিত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন গীতা দে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, শোভা সেন, মিতা চট্টোপাধ্যায়, মেনকা দাস, দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লতিকা বসু ও দীপালি চক্রবর্তী।

বসন্ত চৌধুরী, নির্মলকুমার ও দিলীপ রায় লিরিক্যাল নাটকের অবধারিত শিল্পী ছিলেন। কারণ এদের কণ্ঠে মেলোডি ছিল। শ্যামল ঘোষ, জগন্নাথ বসু ও সন্তু মুখোপাধ্যায়ও গীতিময় (Lyrical) নাটকে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখিয়েছেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (নহবত) সব ধরনের চরিত্র করতে পারতেন বলে বেতারে তাঁর সমাদর ছিল খুব। অজিতেশের খোলা আওয়াজ, বেতারনাটকে অপূর্ব আমেজ সৃষ্টি করত। বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় নৈপুণ্য ছিল রুদ্রপ্রসাদের। সুবীর ঘোষ 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে করেছিলেন নামভূমিকা। তাঁর কণ্ঠে পাশ্চাত্য ঘরানার ছাপ ছিল। দিলীপ রায়ের অনবদ্য কণ্ঠ এবং উচ্চাঙ্গের অভিনয় অনেক বেতারনাটককে সমৃদ্ধ করেছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একসময় বেতারে ঘোষক পদে বৃত ছিলেন—তিনি খুব কম নাটকে অভিনয় করেছেন—কিন্তু চলচ্চিত্রের মতো বেতারেও সেই সীমিত অভিনয়ের মধ্যেও তিনি তাঁর কুশলতার পরিচয় রেখেছিলেন। দীপঙ্কর দে এই অল্প কিছুদিন হল বেতারে অভিনয় করছেন। তাঁর সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ বেতার মাধ্যমের খুবই উপযোগী। অপর দিকে অনিল চট্টোপাধ্যায় খুবই গুণী অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও বেতারে বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। গৌতম চক্রবর্তীর বলিষ্ঠ এবং ঋজু কণ্ঠ তিরের মতো তীক্ষ্ণভাবে ভেদ করে যায় অব্যর্থ লক্ষ্য। অভিনেতা হিসেবে তিনি খুবই সাফল্য অর্জন করেছেন। অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ও বহু বেতার নাটকে তাঁর অভিনয় প্রতিভার পরিচয় রাখেন। বিশেষ করে মনে পড়ে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে ইন্দ্রজিৎ-এর ভূমিকায় তাঁর অতুলনীয় অভিনয়ের কথা। নায়িকাদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নাটকে কেয়া চক্রবর্তীর অনুপম অভিনয়ের কথা। ষাট-সত্তরের দশকে তিনি অনেক নাটকে অসাধারণ প্রতিশ্রুতির পরিচয় রাখেন। শাঁওলি মিত্র খুব অল্পবয়স থেকেই বেতার-নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন। তাঁর চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা বিস্ময়কর। 'কোনি' এবং 'জিপ দুর্ঘটনা' নাটকে তাঁর অতুলনীয় অভিনয়ের কথা শ্রোতা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। শ্রীলা, অনামিকা, মমতাশংকরও বেতার-অভিনেত্রী হিসেবে সফল। বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান মমতা চট্টোপাধ্যায়। বেতারের মধ্যবর্তীযুগে জয়শ্রী, বাসবী, বাসন্তী, সুমিতা, সুলতা, মীনাক্ষী, সাবিত্রী, শমিতা নায়িকা হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে অল্প কিছু নাটকে বুলবুল চৌধুরী এবং সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অভিনয় কুশলতায় শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

সাধারণ নাট্যবিভাগ ছাড়াও বেতারের অন্যান্য বিভাগেও বিভিন্ন সময়ে অনেক নাটক প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে।

মহিলামহলে পরিবেশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান', 'স্ত্রীর পত্র', 'পূজার বাজার' ইত্যাদি নাটক ও নকশা। শরৎচন্দ্রের বহু কাহিনির নাট্যরূপও এই বিভাগে প্রযোজিত হয়েছে।

পল্লিমঙ্গল আসরেও সুধীর সরকার রচিত, পরিচালিত ও অভিনীত হাস্যরসাত্মক এবং সিরিয়াস ধরনের অনেক নাটক প্রচারিত হয়েছে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' নাটকের কথা। তবে এই প্রযোজনাগুলি খুব উন্নতমানের ছিল না। উদ্দেশ্যবিহীন কাহিনি সর্বস্ব এই নাটকগুলি সস্তা বিনোদন ছাড়া আর কিছুই হয়নি। শিশুমহল, গল্পদাদুর আসর, ছোটোদের আসর, বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে ছোটোদের উপযোগী অনেক নাটক প্রচারিত হয়েছে এবং কখনো কখনো তার মধ্যে কিছু প্রযোজনা উন্নতমানের হয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগে বিজ্ঞানভিত্তিক অনেক নাটক নিয়মিতই প্রচারিত হচ্ছে। এই বিভাগে বেশ কিছু ভালো নাটক প্রযোজিত হয়েছে।

বিজ্ঞাপনদাতারাও নাট্যধারাবাহিক প্রচার করছেন। এঁরা সামাজিক নাটক যেমন করেন, তেমনি পুরাণ ও ইতিহাসভিত্তিক নাটকও করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের অনুষ্ঠানে নিয়মিত, আধঘণ্টা সময়সীমার অসংখ্য নাটক প্রযোজনা করে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন 'বোরোলীনের সংসার'। এ ছাড়া 'অমর কাহিনি আরব্য রজনি' শীর্ষক একটি নাট্য ধারাবাহিক দীর্ঘকাল প্রচারিত হয়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উদয় বসু নিবেদিত দেশপ্রেমমূলক নাট্যধারাবাহিকও পরিচ্ছন্ন প্রযোজনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া সাধকদের জীবনী অবলম্বনে 'ভুলিয়ো না ভারতবাসী' বলে একটি অনুষ্ঠান করেছেন অমিত রায়। এ ধারাবাহিকটিও শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বরুণ দাশ করেছেন 'অগ্নিগর্ভ জালালাবাদ' নামে একটি দেশাত্মবোধক ধারাবাহিক—এটিও শ্রোতার ভালো লেগেছিল। 'কলকাতা ৩০০' উপলক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার নামকরণের পিছনে যে ইতিহাস আছে, তা নিয়েও এক বিজ্ঞাপনদাতা অনুষ্ঠান করেছেন—এ অনুষ্ঠানও শ্রোতার কৌতূহল মিটিয়েছে।

১২

আদিযুগ থেকে বেতার চলচ্চিত্র এবং মঞ্চের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে আছে। এ নির্ভরতা আজও ঘোচেনি। এবং সম্ভবত এই কারণে এই শ্রুতিমাধ্যমকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করে স্বতন্ত্র ধরনের প্রযোজনা তেমনভাবে আজও হয়ে ওঠেনি। এর প্রধান কারণ নাট্যকাররা গুরুত্ব দিয়ে এই শিল্পমাধ্যমটি নিয়ে গভীরভাবে ভাবেননি। প্রযোজকরাও ভিন্নদৃষ্টিতে এর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেননি। বেতারনাটক এখনও পর্যন্ত তাই মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের প্রভাবদুষ্ট এক মিশেল ব্যাপার হয়ে আছে। যা শুধু নাটক হলেই হবে না, বেতারনাটককে প্রকৃত অর্থেই হতে হবে স্বাবলম্বী এক পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যম—যা মঞ্চনাটক নয়, চলচ্চিত্র আঙ্গিকের কোনো ব্যাপার নয়।

আর একটি জিনিস লক্ষ করবার, সাম্প্রতিক বেতারনাটক খুবই সীমিত গন্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঐতিহাসিক, জীবনীমূলক, সাংকেতিক, অ্যাবসার্ড নাটক, কাব্যনাট্যও তেমন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে না। আমরা যতটা এগিয়েছি, তার থেকে কেবলই পিছিয়ে আসছি। অবিলম্বে এর কারণ অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

গ্ল্যামারসর্বস্বতা বেতারনাটককে গ্রাস করতে বসেছে। বেতারনাটকের জনপ্রিয়তা কি তাহলে এই গ্ল্যামারের জন্য? ভাবতে হবে। ভাবা দরকার। প্রযোজকদের ইমাজিনেশনের দিগন্ত বাড়াতে হবে—একনিষ্ঠভাবে বিশেষ করে এই মাধ্যমের জন্যই তাঁদের নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। সস্তা জনপ্রিয়তার প্রলোভন ত্যাগ করে সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টির জন্য তাঁদের অনেক মনস্ক ও ধৈর্যশীল হতে হবে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর শতবর্ষের মধ্যেই বেতারনাটককে দৃঢ় ভূমির ওপর দাঁড়াতে হবে। সে-উদ্যোগ এখন শুরু না হলে খুবই মুশকিল।

বাণীকুমার : এক চিরায়ত কিংবদন্তি

১

বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য)-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর ২০০৭-এ বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরিতে এবং ২৯ নভেম্বর ২০০৭-এ বাংলা অ্যাকাডেমি সভাঘর-এ দুটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বাণীকুমার স্মরণ কমিটি—জানিয়েছেন বাণীকুমারের পুত্র নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য। বইমেলা ২০০৮-এ প্রকাশিত হয়েছে বাণীকুমারকে নিয়ে একটি স্মরণগ্রন্থ।

সকলেই জানেন বেতারের কিংবদন্তিপ্রতিম অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র রচয়িতা এই বাণীকুমার।

১৯৩০ খ্রি. 'বেতারজগৎ'-এ 'আমাদের কথা' সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল :

> 'আমাদের এ পক্ষের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্যাপার হচ্ছে আগামী রবিবার ১৫ জুন ৩২ জ্যৈষ্ঠ তারিখের প্রভাতি উৎসব। সেদিন প্রভাতে পাখি জাগার সময় থেকে আমাদের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে এবং শেষ হবে সাতটায়। ...অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহূর্তে কণ্ঠ বা যন্ত্র, যে-কোনো সংগীতই হোক-না কেন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। সেই জন্যেই আমরা এই উৎসবের আয়োজন করেছি এবং শ্রোতাবর্গকে সাদরে সেদিনকার অনুষ্ঠান শোনবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছি। প্রত্যুষে অনুষ্ঠানের এইরকম আয়োজন ভারতে ইতিপূর্বে আর হয়নি।'[১]

বেতারজগৎ থেকে জানা যায়, ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এইরকম আরও দুটি অনুষ্ঠান চালু করা হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে পূজাসংখ্যা 'বেতারজগৎ'-এ লেখা হয়েছিল :

> 'সোমবার ও বুধবারে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান বন্ধ হলেও আগামী ৮ অক্টোবর সোমবার মহালয়া দিবসে প্রাতঃকাল ৬টা থেকে সাড়ে-সাতটা পর্যন্ত উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কবি বাণীকুমার-রচিত শারদীয় বন্দনায় এই অনুষ্ঠানটি মুখরিত হয়ে উঠবে।'

এখানে লক্ষণীয় 'মহিষাসুরমর্দিনী'র কিন্তু উল্লেখ নেই।

১৯৩৬ সালের 'বেতারজগৎ'-এ প্রথম 'মহিষাসুরমর্দিনী'র উল্লেখ পাওয়া যায় :

> ৪ কার্তিক (২১ অক্টোবর) বুধবার ষষ্ঠাদিকল্প। ওইদিন আমরা একটি প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সেদিন ভোর ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। ''শ্রীশ্রী চন্ডী'' গ্রন্থের শ্রীদুর্গার মহিষাসুর বধ অবলম্বন করে কবি বাণীকুমার একটি গাথা রচনা করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠান শ্রীশ্রী দুর্গার মহিমাগাথা ও স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠবে।

পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয়ের সুরে সুরেন্দ্রলাল দাস মহাশয়ের যন্ত্রীসংঘের সহযোগে এই মহনীয় অনুষ্ঠানটি প্রথম প্রচারিত হয় ষষ্ঠীর প্রভাতে এবং পরে স্থানান্তরিত হয় মহালয়ার দিনে। ১৯৩৪-এর আগে মহালয়া দিবসে প্রচারিত হত বাণীকুমার রচিত 'শারদীয় বন্দনা'।

বাণীকুমার লিখেছেন, 'আমি সংস্কৃত রূপকের অন্তর্গত 'বীথি' (বা Oratorio) নাট্যরচনাশৈলী অনুসরণে নবভাবে 'মহিষাসুরমর্দিনী' প্রণয়ন করি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। বস্তুত মহাশক্তি বন্দনার এই অর্ঘ্য রচিত হয়েছিল ১৩৩৯ খ্রি. আশ্বিনের শুভ ষষ্ঠীর প্রত্যুষে। প্রণয়নকাল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ মানে ইংরেজি ১৯৩২ খ্রি. অক্টোবর। রচনা ও প্রচার সমার্থক ধরে নিলে ১৯৩৪ খ্রি. প্রকাশিত বেতারজগতের তথ্য এবং ১৯৬০-এ প্রকাশিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' গ্রন্থে উল্লেখিত বাণীকুমারের বক্তব্য—দুয়ে মিল নেই। 'বেতারজগৎ'-এর তথ্য ভুল এমন

কথা বাণীকুমার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। অতএব আমরা ধরে নেব বাণীকুমার রচিত 'শারদীয় বন্দনা' ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত একমাত্র দুর্গাষষ্ঠীর প্রত্যুষেই প্রচারিত হত।

অনুষ্ঠানটির বর্তমান রূপ একদিনে গড়ে ওঠেনি। বাণীকুমার প্রতি বছর রচনা পরিমার্জন করতেন, পঙ্কজকুমার সুরবৈচিত্র্যে অভিনবত্ব বাড়াতেন এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ গ্রন্থনার প্রতিটি শব্দ নিখুঁতভাবে উচ্চারণ করে ভাসিয়ে দিতেন ইথার তরঙ্গে।

'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতি আলেখ্যটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে তাঁর উপক্রমণিকায় বাণীকুমার লেখেন :

> মহিষাসুরমর্দিনী' আমার যৌবনের রচনা। কিন্তু মূল রূপটির বিশেষ ব্যতিক্রম না ঘটলেও এই গ্রন্থের বর্তমান রূপ বহুতর তথ্য, ভাবগর্ভ বিষয় এবং বেদ-পুরাণাদি-বিধৃত শ্লোকাবলি সংযোজনায় সমঅলংকৃত। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ মার্কন্ডেয় সপ্তশতী চন্ডীর সংক্ষিপ্তসার বললেও অত্যুক্তি হয় না, তদুপরি এর মধ্যে আছে মহাশক্তি সম্বন্ধে বৈদিক ও তান্ত্রিক তত্ত্বের ব্যঞ্জনা এবং এর অন্তরে নিহিত রয়েছে শাশ্বত ভারতের মর্মকথা। সেইজন্য এই বিষয়বস্তু যেরূপে সর্বজনের বোধগম্য ও মর্মস্পর্শী হয়, যথাসম্ভব সে-চেষ্টায় বিরাম রাখি নাই। মহর্ষির যে নিরুপম সৃষ্টি ভাব-সম্পূর্ণ ও অপ্রমেয় রসসুষমায় মন্ডিত, সেই অখিল চৈতন্যময়ীর অমৃতময় প্রাণময় পুণ্যগাথা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে ছন্দে-ভাষায় যতটুকু প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি—তা বহুবর্ষ ধরে সকল স্তরের ভিন্নরুচির লোক আপনাদের চিত্তধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মহাশক্তির অদ্ভুত লীলারস উপলব্ধি করে অভিভূত হয়েছেন, তার দ্বারা আমার সকল প্রয়াস সার্থক হয়েছে, আমি ধন্য হয়েছি।

'মহিষাসুরমর্দিনী' সম্পর্কে সহৃদয় গ্রাহকগণের অবগতির জন্য উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বৎসর বৎসর না হোক—এই গ্রন্থকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করবার আগ্রহে আমি বিবিধ বিষয়, স্তবস্তুতি, দেবীসূক্ত, নবরচিত গান সন্নিবেশ করেছি। অন্তত ছয়-সাত বার এই রচনার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মহাদেবী চন্ডিকার প্রায় সমূহ তত্ত্ব ও তথ্য সমাহারে এবং দেবীর নানাবিধ ভাব-রূপ-প্রকাশক গীতাবলি সজ্জায় এই 'মহিষাসুরমর্দিনী' সুসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

বাণীকুমারের জীবনের শুরু কবি ও গীতিকার হিসেবে। তার পরিচয় মেলে বেতারে তাঁর লেখা নাটক, সংগীতালেখ্য, সংগীত বীথি রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে। তা ছাড়াও রয়েছে তাঁর রচিত তিনটি গীতিসম্ভার 'স্বরলিপিকা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) এবং 'গীতবল্লকী'। এই তিনটি বই ৭৫টি ভিন্ন স্বাদের গানের ডালিতে ভরা, যার সুরারোপ করেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং 'গীতবল্লকী'তে কয়েকটি গানে রাইচাঁদ বড়ালের সুর আছে। বাণীকুমারকে চিনে নেওয়ার জন্য এগুলিই হল ঐতিহাসিক দলিল।

২

বেতার সম্প্রচারের একেবারে প্রথমদিকে কয়েক জন মিলে রেডিয়ো চালাতেন। তখন শ্রোতার সংখ্যা বিরাট ছিল না, অর্থও পর্যাপ্ত ছিল না, বহু কষ্ট করে ও অসাধারণ শ্রম স্বীকার করে কজনকে প্রোগ্রাম চালাতে হত।

আমাদের মধ্যে কর্তা ছিলে নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মশাই। তিনি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আর রাইচাঁদ বড়াল ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাঁর সহকারী। এর কিছুদিন আগে বাণীকুমার এসে বেতারে যোগদান করেন এবং তার কিছুদিন পরে 'বেতারজগৎ' পত্রিকা প্রকাশ করে আমরা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, 'মহাস্থবির জাতক'-এর স্বনামধন্য লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয়কে এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করার জন্যে নিয়ে আসি। (মহিষাসুরমর্দিনী/বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র)।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন—প্রেমাঙ্কুরবাবুকে সবাই বুড়োদা বলে সম্ভাষণ করত। আমাদের সহকর্মী হিসেবে তাঁর মতো সঙ্গী পাওয়ায় আমাদের আসর জমজমাট হয়ে থাকত। অমন আমুদে লোক খুব অল্পই দেখেছি। লেখক হিসেবে যেমন পটু, আবার লোককে হাসাতে তার চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ। দুপুর বেলায় আমাদের হত

একটা বিরাট আড্ডা—যেখানে সাহিত্য-সংগীত-অভিনয়-গান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা যে কতক্ষণ চলত তার ঠিক নেই। সে-আসরে সাহিত্যিক ও হাসির গানের সুবিখ্যাত গায়ক নলিনীকান্ত সরকার (পরে ইনি 'বেতারজগতে'র সম্পাদক হন, বুড়োদা নিউ থিয়েটার্সে ছায়াছবি পরিচালনা করতে চলে যান), সুবিখ্যাত গল্পদাদু, অর্থাৎ হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট স্বর্গীয় যোগেশ বসু (ইনিই গল্পদাদুর আসরের প্রতিষ্ঠাতা), সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ও সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল, ১৯১১ সালে আই. এফ. এ. শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের হাফব্যাক ও আমাদের প্রথম বাংলা অনুষ্ঠানের ঘোষক রাজেন সেন, সুপ্রসিদ্ধ পাঞ্জাবি গায়ক পন্ডিত হরিশচন্দ্র বালী, বাণীকুমার ও আমি সেই সভায় কত যে গল্প করেছি তার ঠিকঠিকানা নেই। প্রত্যেকআড্ডাধারীকে সপ্তাহে অন্তত একটা করে প্রোগ্রাম সম্বন্ধে নতুন নতুন পরিকল্পনা পেশ করতে হত। এর উদ্দেশ্য, শ্রোতার সংখ্যা আরও কী করে বাড়ানো যায়। সেসময় সরকার বেতারকে গ্রহণ করেছেন, ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস নামে তা চলছে। হঠাৎ একদিন বুড়োদা বলে উঠলেন—দ্যাখো, রোজ রোজ গান-বাজনা-বক্তৃতা-থিয়েটার-গল্পদাদুর আসর-মহিলা মজলিশ এসব তো চলছে—কিন্তু আরও ধাক্কা দিতে হবে শ্রোতাদের।

নৃপেনবাবু হেসে বলে উঠলেন—আর কত ধাক্কা দেওয়া যায় ভাই, সকাল থেকে রাত অবধি তো এই ক-টা লোক প্রোগ্রাম চালাচ্ছে—এর ওপর আর কী করা যাবে বলো?

বুড়োদা বললেন, করা যাবে না কেন? ধরো, আমরা একদিন রাত দশটা থেকে রাত চারটে পর্যন্ত বড়ো বড়ো গাইয়ে-বাজিয়েদের নিয়ে জলসা বসালুম। রাত্তিরে যেসব রাগ বাজালে বা গাইলে জমে, সেইগুলি চালানো হলে—তখনই শ্রোতাদের কাছে একটা চমকপ্রদ প্রোগ্রাম বলে মনে হবে। কোনোদিন হয়তো ভোর চারটে থেকে প্রোগ্রাম শুরু করে দিলুম, সেটাও একটা নতুনত্ব হবে।

অনেকেই বললেন, হ্যাঁ, বুড়োদার প্রস্তাবটা মন্দ নয়, এ ধরনের আকস্মিক ব্যবস্থায় আর কিছু না-একটা নতুনত্ব হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নৃপেনবাবু বললেন, সেইরকম একটা কী প্রোগ্রাম করা যায় ভাবো দেখি—বুড়োর এক্সপেরিমেন্টটাই করে দেখা যাক।

বুড়োদা বললেন, এই তো বাণী রয়েছে—সংস্কৃতের তো আদ্যশ্রাদ্ধ করেছে—ওই কতকগুলো বৈদিক শ্লোক জোগাড় করে ফেলুক, আর গান লিখুক, রাই সুর দিক, বীরেন শ্লোক আওড়াক—ভোর বেলায় লাগিয়ে দাও, লোকের লাগবে ভালো।

অনেকে হেসে বললেন, লোকের ভালো লাগুক আর না-লাগুক, আমাদের একটা নতুনত্ব করার খেয়াল চরিতার্থ হবে।

বুড়োদা বললেন, কেন, তোমরা কি সন্দেহ করো লোকে শুনবে না?

দু-একজন বললেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, লোকে নিশ্চিন্তে সে-সময় ঘুমোবে।

নৃপেনবাবু বিরুদ্ধবাদীদের বাধা দিয়ে বললেন, ঘুমোক গে—নয় আমরাই প্রোগ্রাম শুনব। ওহে বাণী, একটা কিছু লিখে ফ্যালো। একটু সহজ কিছু লিখো বাপু, নইলে আমরাও প্রোগ্রাম করতে করতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব।

বাণীকুমার তখনই ভাবতে শুরু করলেন। তখন আমি (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ) বললাম, নৃপেনদা, পুজো আসছে আর মাস খানেক বাদে, প্রতি পুজোর সময় আমি এক জায়গায় ঠাকুরের সামনে বসে চণ্ডীপাঠ করি,—খানিকটা সড়গড় আছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীর কাহিনি নিয়ে যদি বেশ গানটান শ্লোক লাগিয়ে একটা প্রোগ্রাম করা যায় তাহলে প্রোগ্রাম লোকে পছন্দ করুক না করুক—দু-চার জন যারা ঘুম থেকে ভোর বেলায় উঠে আমাদের প্রোগ্রাম শুনবে তখন তাদের তা ভালো লাগতে পারে হয়তো।

সকলে বলে উঠলেন হ্যাঁ, বীরেন যা বলেছে, বেশ ভালো প্রস্তাব, পুজোর সময় চণ্ডীপাঠ লাগিয়ে দাও।

এর মধ্যে আবার একজন খুঁত ধরলেন, বললেন, 'কায়েতের ছেলে চণ্ডীপাঠ করলে লোকে কিছু বলবে না তো?'

নৃপেনবাবু বললেন, প্রোগ্রাম করবে তার আবার বামুন কায়েত কী হে? আমরা কি হিন্দুর মন্দিরে গিয়ে পুজো করছি? তাহলে এই প্রোগ্রামে যারা বাজাবে তারা তো অর্ধেক মুসলমান, খুশি মহম্মদ, আলি মুন্সি সবাই তো বাজাবে, তাহলে তাদের বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণদের ডেকে আনতে হয়। তা ছাড়া আমরা একটা বিরাট উৎসবের আগে ভূমিকা হিসেবে এই প্রোগ্রাম করব—এতে কার কী বলার আছে? প্রোগ্রামটা আসলে লিখবে তো এক বামুন—কী বল হে বাণী?

বাণীকুমার হেসে বললেন, বটেই তো! ওসব কথা ছেড়ে দিন-না—আমি বীরেন ছাড়া কাউকে চণ্ডীপাঠ করতেই দেব না।

প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বাণীকুমার কতকগুলো গান লিখে ফেললেন ও পন্ডিত হরিশ্চন্দ্র বালী, রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজকুমার মল্লিক সেগুলিতে সুর সংযোগ করতে লাগলেন। 'অখিল বিমানে', 'বিমানে বিমানে আলোকের গানে' প্রভৃতি সুর হরিশচন্দ্র বালীর দেওয়া, সাগির খাঁর সুর 'শান্তি দিলে ভরি'। অবশ্য এ ছাড়া 'মাগো তব বীণে সংগীত প্রেম ললিত' প্রভৃতি অধিকাংশ সুর পঙ্কজের দেওয়া এবং রাইচাঁদ বড়াল 'নিখিল আজি সকল ভোলে' গানটির সুর দেন।

পঙ্কজ সুর তুলে ও সুরারোপ করে তখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কণ্ঠে গান তোলাতে লাগলেন। রাইচাঁদ এক বিরাট অর্কেস্ট্রা পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। সেকালের সব চেয়ে বড়ো বাজিয়েরা গানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। সারেঙ্গি ধরলেন মুন্সি, চেলো বাজালেন তাঁর ভাই আলি, হারমোনিয়াম খুশি মহম্মদ, দ্বিতীয় বেহালা তারকনাথ দে, ম্যাণ্ডোলিন সুরেন পাল, গিটার সুজিত নাথ, এসরাজ দক্ষিণামোহন ঠাকুর, ডবল বাস শান্তি ঘোষ, বেহালা অবনী মুখোপাধ্যায়, পিয়ানো রাইচাঁদ, অর্গান ও অন্যান্য আরও পাঁচ-ছ জন বড়ো শিল্পী বাজনা বাজাবার জন্য তৈরি হলেন। পরে গৌর গোস্বামী, হিমাংশু বিশ্বাস, শৈলেন দাস, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বাদ্যযন্ত্রী যোগ দেন ও পঙ্কজের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। প্রধান গায়ক পঙ্কজ, বিমলভূষণ, কৃষ্ণ ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, সুপ্রভা সরকার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, ইলা ঘোষ, সাবিত্রী ঘোষ, ইলা বসু, সুমিত্রা সেন, প্রভাত, অম্বুজ, রবীন ও অন্যান্য এত শিল্পী এত বার অংশগ্রহণ করেছেন যে, সবার নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। পূর্বে পঙ্কজকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সহকারী হিসাবে এবং বিভিন্ন সংগীতে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করতেন এবং পঙ্কজ দু-বৎসর এই অনুষ্ঠানে পরিচালনা না করায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একবার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আর একবার অনুষ্ঠানটি পরিবর্তিত আকারে নতুন সুর ও গান দিয়ে সংগীত পরিচালনা করেন বিজন ঘোষ দস্তিদার ও শচীন দাস মতিলাল।

পঙ্কজকুমার মল্লিক দু-বছর অনুপস্থিত থাকাতে শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই তাতে খুশি হননি—এও অনুভব করেছি। এর শিল্পী পরিবর্তন ঘটাতে আবার একদল খুশি নয়—এও লক্ষ করা গেছে। তবে কয়েক বৎসর ধরে সামান্য অদলবদল করায় আবার লোকের মন খুশি হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানটির গাম্ভীর্যময় পরিবেশ স্মরণীয় বলে দেশের অগণিত গুণীজন স্বীকার করেছেন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরে থেকেও বাঙালিসমাজ এই অনুষ্ঠান শুনে বাংলার শারদ ঋতুর ও বিরাট উৎসবের স্পর্শ পেয়েছেন। একথা পত্রমারফত আমাদের জানিয়েছেন বহু লোকে।

গত উনত্রিশ বৎসবের মধ্যে মাত্র এক বার, অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক্কালে, কলকাতার সেই ভয়াবহ দাঙ্গার সময় শুধু রেকর্ড করে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছিল। স্টুডিয়ো রেকর্ডে সেটি গৃহীত হয় এবং সেই বৎসরেই তা নষ্ট হয়ে যায়। সে-সময় বর্তমান সময়ের মতো টেপ রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা ছিল না। এ পর্যন্ত আমরা ওই একটি বছর ছাড়া কোনোদিন কোনো রেকর্ড বাজিয়ে এ প্রোগ্রাম শোনাইনি।...

আজ মনে পড়ছে সেই প্রথম দিনটির কথা। কী করে সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটি সুরে বাঁধা হয়ে গেল নিতান্ত আকস্মিকভাবে, তার ইতিহাসও বড়ো বিচিত্র।

কথা ছিল যে, আমি (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ) যখন সংস্কৃত শ্লোক সুরে আবৃত্তি করব, সেই সময় যন্ত্রীরা আমায় সুর দিয়ে সাহায্য করবেন শুধু। তারপর আমি যখন বাংলা গদ্য পাঠ করে যাব, সে-সময়ে তাঁরা পিছনে কোনো রাগ আলাপ করবেন ধীরে ধীরে আবহসংগীত হিসেবে। রাইচাঁদ বড়াল মহাশয় মুসলমান বাজিয়েদের সেইটে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরাও সব ব্যাপারটা রীতিমতো অনুধাবন করেছেন বলে জানালেন।

যথারীতি প্রোগ্রাম শুরু হল। আমি শ্লোকাবৃত্তি করে, একটু থেমে বাংলা গদ্য আবৃত্তি আরম্ভ করলুম, 'আজ শুভ শারদ উৎসব, জলে, স্থলে প্রকৃতিতে আনন্দের বার্তা' ইত্যাদি।

ওদিকে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলার পার্থক্য বুঝতে না পেরে উর্দুভাষী মুসলমান বাদকবৃন্দ ঠিক আমার অনুরূপ কথার সুরে বাজনা বাজিয়ে চললেন। আমি দেখলুম এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না—তখন সামান্য সুর রাখলুম গদ্যে, সেটি আরও চমৎকারভাবে মিলে গেল তাঁদের সুরের সঙ্গে। রাইচাঁদ, নৃপেন মজুমদার মহাশয় ও পঙ্কজ সবাই সবিস্ময়ে আমার (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ) ও যন্ত্রীদের দিকে চেয়ে রইলেন যে এরা করে কী! কিন্তু ব্যাপারটি ভালো লাগছিল সবারই। কিছুক্ষণ পরে বাঙালি যন্ত্রীরাও সুর ভিড়িয়ে দিলেন, তারপর সে-সুরে ভিড়ে গেল গান—আবার আবৃত্তি। সমস্ত জিনিসটা একটা অখন্ড সুরের প্রবাহে বইতে লাগল।। দু-ঘণ্টা ধরে প্রোগ্রাম মাতিয়ে তুলল সকলকে। তারপর বেতার অফিসে কী অজস্র অভিনন্দন যে আসতে শুরু করল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।...

'হিন্দু মুসলমান শিল্পীর মিলিত প্রচেষ্টায় 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি বৈচিত্র্য ও জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করল। প্রথম দু-বছর অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হল ষষ্ঠীর প্রভাতে ভোর চারটের সময়, অর্থাৎ এখনকার ভোর চারটের চব্বিশ মিনিট আগে। দু-ঘণ্টা সময় নির্ধারিত ছিল—তারপর সেটিকে দেড় ঘন্টা করা হয়। ষষ্ঠীর দিনে অনেক অফিসে ছুটি থাকে না—লোকে পুজো উপলক্ষ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে—বহু শ্রোতা বাইরে চলে যান, তাই শ্রোতাদের অনুরোধে এটি মহালয়ার প্রভাতে নিয়ে আসা হয়। ছুটির দিন থাকায় লোকে নিশ্চিন্ত মনে অনুষ্ঠানটি শুনে তৃপ্তি পায়।'[২]

'বেতারজগৎ' থেকে জানা যায়, এইরকম, আরও দুটি অনুষ্ঠান চালু করা হয়েছিল : 'সোমবার ও বুধবারের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান বন্ধ হলেও আগামী ৮ অক্টোবর সোমবার মহালয়া দিবসে প্রাতঃকাল ৬টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

এ ছাড়া তখন কলম্বিয়া, হিজ মাস্টারস ভয়েস এবং হিন্দুস্থান রেকর্ডে গীতরচয়িতা হিসেবে বাণীকুমারের গান প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর রচিত গান—'নেমেছে আজ নবীন বাদল ব্যথার গুরুভারে'—পঙ্কজ মল্লিকের প্রথম রেকর্ড। তারপর পঙ্কজকণ্ঠে আরও অনেক গান রেকর্ড হয়েছে, যেমন—'প্রভু আঁধার পারাবারে ফোটাও আলোর শতদল', মরণরে তোর এলো পাশে', 'আজি বসন্ত জাগিল কুঞ্জবনে'। 'দেবদাস' ছবিতে কুন্দনলাল সায়গলের গাওয়া সেই বিখ্যাত গান 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' এবং 'কাহারে জড়াতে চাহে ও দুটি বাহুলতা'—বাণীকুমারের লেখা।

তাঁর সংগীতবহুল পালাগান 'শ্রীরাধা' (সুর ও সংগীত পরিচালনা/পঙ্কজকুমার মল্লিক) চল্লিশের দশকে শ্রোতাদের বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। এ ছাড়াও বাণীকুমার গান লিখেছেন 'দেনা-পাওনা', 'রূপলেখা' ও 'ভাগ্যচক্র' ছায়াচিত্রে—রেকর্ডে গানগুলি শ্রোতারা খুবই পছন্দ করেছিলেন। 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে যে প্লে-ব্যাক সিস্টেমের উদ্ভব হয়, তার প্রথম প্লে-ব্যাকের গানটি বাণীকুমারের লেখা। এ ছাড়া পাহাড়ী সান্যাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি খ্যাতিমান শিল্পীরা বাণীকুমারের লেখা কিছু গান রেকর্ড করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লোকরঞ্জন' শাখায় বাণীকুমারের কিছু গান, নাটক ও গীতিকাব্য বন্ধুবর পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় পরিবেশিত হয়েছিল। রংমহলে ১৯৪৫-এর ১৮জানুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' অবলম্বনে বাণীকুমার রচিত 'সন্তান' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শকদের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে দিনের পর দিন অভিনীত হয়েছে।

যাই হোক, বাণীকুমারের মৃত্যু, পঙ্কজকুমারের বার্ধক্য এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণর ব্যক্তিগত সমস্যা—প্রধানত এই তিনটি কারণে পরবর্তীকালে অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ শ্রোতাদের কারওর কারওর কাছে কমতে থাকে। বেতারের সঙ্গে যুক্ত অনেক শিল্পীই জানেন যে শেষের দিকে কোনো কোনো গান নতুন করে রেকর্ড করা হলেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণর গ্রন্থনা পাঠ পুরোনো রেকর্ড থেকেই নেওয়া হত এবং তা শ্রীভদ্রের সম্মতি নিয়েই করা হত।

ক্রমশ একশ্রেণির শ্রোতার বিচারে 'মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি গতানুগতিক হয়ে আসছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বেতার কর্তৃপক্ষ একটি নতুন অনুষ্ঠান রচনা করার কথা ভেবে আসছিলেন বহুকাল যাবৎ। ১৯৭৬ খ্রি. অনেক ভেবেচিন্তে 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র পরিবর্তে একটি নতুন অনুষ্ঠান রচিত হয় 'দেবী দুর্গতিহারিণীম'। এটির রচয়িতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক সুপণ্ডিত ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। নতুন অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কলকাতা ও বোম্বের স্বনামধন্য শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন :

> শ্লোকপাঠ : ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায় ও ড. রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
>
> গ্রন্থনা পাঠ : উত্তমকুমার, বসন্ত চৌধুরী, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ ও ছন্দা সেন।
>
> সংগীতকার : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত।
>
> কণ্ঠসংগীতে : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, অসীমা ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও শ্যামল মিত্র।

রেকর্ডিং নিখুঁত করার জন্য 'এইচ. এম. ভি.' স্টুডিয়ো ভাড়া করা হয়েছিল। লতা মঙ্গেশকরের গান বোম্বের সেরা স্টুডিয়োতে রেকর্ড করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপক আয়োজন ও সাবধানতা সত্ত্বেও অভ্যস্ত শ্রোতার কাছে অনুষ্ঠানটি গ্রহণযোগ্য করা সম্ভবপর হয়নি। শ্রোতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া গোটা দেশে সঙ্গে সঙ্গে কত তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে কলকাতা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান প্রচারের দিনে ডিউটি-অফিসারদের খাতায়, শ্রোতার স্মৃতিতে, পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে এবং শ্রোতার চিঠিপত্রে।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখের সংস্করণে 'যুগান্তর' অনুষ্ঠানটিকে 'দেবী দুর্গতিদায়িনীম' আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন: 'তবু যা পেলাম, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান 'তুমি বিশ্বমাতা ব্রহ্মময়ী মা তুমি', 'জঠরধারিণী আমার', 'জননী আমার জন্মভূমি' লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে কোনো সুর বা তালের সহযোগ ছাড়া গানটি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে।'

ওই দিনের বসুমতীতে স্টাফ রিপোর্টার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোলিপি লিখেছিলেন—'মহালয়ার বেতার-অনুষ্ঠানের বেতাল-আধিক্য জনমনে দারুণ ক্ষোভ'। সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী লিখেছিলেন : 'আকাশবাণী আজ লক্ষ লক্ষ ভক্তশ্রোতার জীবনে নিঃসীম দুর্গতিদায়িনী।'

২৬ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকার Radio-Review-তে মন্তব্য করা হয় :

> This is a pity, for it serves as a pointer not only to the lack of imagination which alone can draw a blank with so many resources at hand, but also to the poverty of creative, ever intelligent thinking which makes the effort so painful to hear.

জনৈক পত্রলেখকের মন্তব্য ২৭ তারিখের 'যুগান্তর'-এ ছাপা হয় : 'এ নাটক না বিচিত্রানুষ্ঠান না দেবী আরাধনা তা বোঝা কঠিন হয়ে উঠেছিল।'

২৭ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীপেষু' কলমে মলয়কুমার বসু নামে জনৈক শ্রোতা লিখেছিলেন :

> মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যে পরিবর্তিত শারদীয়া প্রভাতী অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন তাতে আড়ম্বর ও জাঁকজমকের কোনো অভাব হয়নি। কিন্তু দীর্ঘদিনের এই আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত ভাবরূপটি কি উন্মোচিত হয়েছে? মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠান বাংলায় শ্রোতৃমানসে

দেবী চন্ডিকার পুণ্য আবির্ভাব লগ্নটির সংকেত বহন করত। আজ 'দেবী দুর্গতিহারিণীম' অনুষ্ঠানের সাথে সেই আত্মিক যোগসূত্রটি যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

'বসুমতী'-তে প্রকাশিত ২৯ তারিখের একটি চিঠিতে লেখক তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী জানিয়েছিলেন :

অনেক পুরোনো জিনিসই নতুনের প্রেরণা, নতুনত্ব বাঁচিয়ে রাখে, অমর করে রাখে। তাকে পুরোনো বলা যায় না, তার নাম শাশ্বত। আগের মহালয়ার অনুষ্ঠান ছোটো-বড়ো সকলকেই দেবী আগমনের নিশ্চিন্ত বার্তা জানিয়ে দিত। এবারে যে জিনিস কিছুই পেলাম না আমরা।

১৯৭৭ খ্রি. থেকে পুরোনো 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটিই প্রচারিত হয়ে আসছে। ১৯৮০-তে স্টেটসম্যান পত্রিকার Radio Review-তে মন্তব্য করা হয় :

The Traditional dawn programe on Mahalaya Day has become so much part of the Bengali ethos that no one had cause for complaint that this year Akashvani presented merely the taped version of the old Mahishasura Mardini. The tragedy of 1976 has proved that there was nothing like the old sentimental flavour ...as long as someone does not come to change it. (which seems quite a remote possibility at the moment), the puja for Radio Listeners is the old magic woven, by Biren Bhadra. Pankaj Mullick and Banikumar.

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আকাশবাণীতে টেপ-প্রথা প্রবর্তিত হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে।

৪

বাণীকুমারের জন্ম হয় ১৯০৭-এর ২৩ নভেম্বর হাওড়া জেলার কানপুর গ্রামে মাতৃলালয়ে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা পন্ডিতপ্রবর বিধুভূষণ ও মাতা অপর্ণা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণীকুমারের পিতৃদত্ত নাম ছিল বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। বাবা বিধুভূষণ, আদিনিবাস হুগলি জেলার আঁটপুর থেকে হাওড়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন নিজের শিক্ষকতার ও ছেলের পড়াশোনার সুবিধার জন্য। ছেলেকে কোনো পাঠশালা বা বিদ্যালয়ে না দিয়ে নিজেই পড়াশোনা করিয়ে একটু বড়ো বয়সে নিজের স্কুল হাওড়া জেলা স্কুলে ভরতি করান।...

এই স্কুলে পড়ার সময়েই বাণীকুমার বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রায়শই প্রথম হতেন এবং স্কুলজীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা পাঠাতে শুরু করেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ে এক অনামি পত্রিকায় ওই বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার শিক্ষক কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের কবিতা প্রকাশিত হয়। আট লাইনের সেই কবিতাটি তাঁর ছাত্র বৈদ্যনাথের লেখা কি না জানতে করুণানিধান তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বৈদ্যনাথের কবিতার প্রশংসা করেন। বলেন, তুমি লেখা ছেড়ো না, তোমার লেখার হাত আছে। যদি কোনো অসুবিধা হয় আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে সাহায্য করব। বৈদ্যনাথ যেন হাতে চাঁদ পেলেন। প্রায় দিনই স্কুলের পর কবি-শিক্ষকের কাছে হাজির হতেন কবিতার খাতা নিয়ে। এইভাবে কবিতা লেখার পাশাপাশি পড়াশোনাও সমানতালে চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সুযোগ পেলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে স্নাতক হলেন। কিন্তু সাংসারিক চাপে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাণীকুমারের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই সংস্কৃতশাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন। এই পরম্পরা বাণীকুমারের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বাণীকুমার সংস্কৃত 'অহীমন্ডল' থেকে 'কাব্যশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন এবং 'সংস্কৃত সাধনা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। এই পত্রিকা সম্পাদনাকালে বন্ধুবর অশোকনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে লেখার সূত্রেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। অশোকনাথের স্থায়ী বাসস্থান ছিল বাগবাজারে। অশোকনাথের সান্নিধ্যে এসে বাণীকুমারের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বাড়তে থাকে। বন্ধু অশোকনাথকে বাণীকুমার শুধু অধ্যাপনার কাজে ব্যস্ত থাকতে

দেননি, তাঁকে টেনে আনেন বেতার সম্প্রচারে। অশোকনাথ বিভিন্ন বিষয়ে বেতারে কবিতা পাঠ করেছেন, তা ছাড়া বাণীকুমার রচিত স্তোত্রপাঠ করেছেন বহু উৎসবানুষ্ঠানে। শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে এর আবেদন ছিল অপরিসীম। তাঁর পান্ডিত্য, বাচনভঙ্গি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের বিশেষভাবেই মুগ্ধ করেছে। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ১১ জুলাই ১৯৪৮ তিনি প্রয়াত হন। বাণীকুমার এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে হারানোর বেদনা শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধুদের মধ্যে আর একজন ছিলেন সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)। কলেজে লেখালেখির ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। চারুচন্দ্র জেলার হয়ে চলে গেছেন। অবসর নেবার পরে তিনি জানতে পারেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের বৈদ্যনাথই বেতারের বাণীকুমার। খোঁজখবর নিয়ে চারুচন্দ্র একদিন বাড়িতে এসে উপস্থিত। দু-জনের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যেন রোজই দেখা হয়। চলতে থাকে পুরোনো স্মৃতিমন্থন। জরাসন্ধ দু-খন্ড ‘লৌহকপাট’ তুলে দিলেন বাণীকুমারের হাতে—বললেন, পড়ে দ্যাখো। বাণীকুমার ওই ‘লৌহকপাট’ থেকে দু-তিনটি গল্প বেতারনাট্যরূপ দিয়ে প্রযোজনা করেন। বি. এ. ইংরেজি সাহিত্যে পরীক্ষা দেবার পর বাণীকুমার যখন এম. এ. পড়ার তোড়জোড় করছেন, তখন তাঁর বাবা বিধুভূষণ বাধ সাধলেন। ছেলে মতিগতি তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কখনো সেনিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত, কখনো এ-সাহিত্যিক, ও-সাহিত্যিকের বাড়ি যাচ্ছে, কখনো শেক্সপিয়রের নাটক, বাংলা কবিতা, নিজের লেখা অভিনয়ের ঢঙে পড়ছে, রাস্তার মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে। তার ওপরে বিকেলে কয়েক জন সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে এক নাট্যসংস্থা ‘চিত্রা সংসদ’-এ বসে বিভিন্ন আলোচনা ও থিয়েটারের রিহার্সাল। বাবা বিধুভূষণ ভাবলেন ছেলে অন্য পথে চলে যাচ্ছে, ছেলেকে সংসারী করে তুললে এই বদ অভ্যেসগুলি চলে যাবে। তাঁর সাধ ছিল লেখাপড়া শিখে বিবাহ করে সংসারী হবে। তিনি বুঝতে পারেননি ছেলের সৃজনশীল রূপটি।

যাই হোক, সাংসারিক চাপে বাণীকুমার কলকাতার টাঁকশালে কিছুদিন চাকরি করেন। স্থায়ী চাকরি, আর সেই সময়ের বিচারে মাইনেও খারাপ নয়। কিন্তু এই অফিসের গতানুগতিক কাজ—সকালে গিয়ে কয়েকটি চিঠি লেখা, আর এই টেবিল থেকে ওই টেবিলে ফাইল চালাচালি বাণীকুমারের একেবারেই পছন্দ ছিল না। এই কাজ ঘন্টা দুই-এর মধ্যে শেষ করে ওই অফিসে খাতা খুলে নিজের পছন্দমতো কিছু লিখে ফেলা অথবা ইংরেজি নভেল, ছোটোগল্প পড়া তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়াল। এই টাঁকশালে চাকরি করার সময়ই তিনি গৌরী ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু বাবার ছেলেকে ঘরমুখো করার চেষ্টা সফল হল না। বাণীকুমার আরও বেশি করে সাহিত্য ও অভিনয়ের দিকে ঝুঁকলেন।

তখন বাণীকুমারের আড্ডা বলতে ছিল কৈলাস বসু স্ট্রিটের ‘ভারতী’র সাহিত্য মজলিশ। সেই আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ দিকপাল ব্যক্তিত্বরা। এটা ছিল জমজমাট সাহিত্য-আড্ডার আসর। আর এই আসরের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে বাণীকুমার সব সময়েই উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। বাণীকুমার এইসব সাহিত্যিকদের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সময়ে বাণীকুমারের কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবাহ, ভারতী প্রভৃতি নামজাদা কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন, বর্ষ-অবসানে (ভারতবর্ষ ১৩৩৩), শিল্পী ও চিত্ররূপের আদর্শ (বসুমতী ১৩৩৭), জীবন ও কাহিনি (ভারতী ১৩৩৩)।

বাণীকুমারের আড্ডার আর একটি জায়গা হচ্ছে শ্যামবাজার এলাকার ‘চিত্রাসংসদ’ নাট্যগোষ্ঠী। এই নাট্যসংস্থার সদস্যরা সকলেই কাছাকাছি থাকতেন। এঁরা নতুন চিন্তাধারার নাটক নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তা কী করে সার্থকভাবে দাঁড় করানো যায় তার গুরুদায়িত্ব ছিল বাণীকুমারের ওপর। বাণীকুমার নাটক বেছে আর নাট্যরূপ দিয়ে হাজির হতেন এবং নাটকটি বার বার সকলের সামনে পড়ে শোনাতেন অভিনয়ের ঢঙে। এ অভ্যেস তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ছিল। এমনই একটি নাটক পরশুরামের ‘চিকিৎসা সংকট’ উনি

নাট্যরূপ দিলেন। অভিনয় করবে এই সংস্থারই সদস্যবৃন্দ। নাটকটি বেতারে অভিনীত হবে এইরকম ভাবনাচিন্তা প্রথমে কারুর মনে ছিল না। তাঁদের চিন্তা ছিল কোথায়, কোন জায়গায় এর অভিনয় হবে।

যা হোক ১৯২৭-এর ২৬ অগাস্ট কলকাতা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হল। ১ নম্বর গারস্টিন প্লেসে তখন স্থাপিত হয়েছে 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি' নামে এক বেসরকারি সংস্থা। এই সংস্থাই বেতার-অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করল।

১৯২৭ খ্রি.র গোড়ার দিকে বোম্বের কয়েক জন উৎসাহী শিল্পপতি ও জমিদার মিলে এই সংস্থাটি গড়ে তোলেন। সংস্থার নাম 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি' সংক্ষেপে আই. বি. সি.। এই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন সুলতান চিনয়। প্রোগ্রাম অ্যাডভাইসরি বোর্ডের জয়েন্ট প্রেসিডেন্ট ছিলেন দু-জন—মিস্টার জাস্টিস ওস্টোলো ও স্যার ওংকারনাথ জেটিয়া। এই কোম্পানি বেতার কেন্দ্র খোলার অনুমতি পায় ১৫ জুলাই, ১৯২৭। তাদের প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয় বোম্বের অ্যাপেলো বন্দরে ১৯২৭ সালের ২৩ জুলাই শনিবার। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া ২৩ জুলাই তারিখে প্রথম উদ্যমকে স্বাগত জানিয়েছিল এইভাবে : Broadcasting throws open sluice gates of Education।[৩] অর্থাৎ বেতার সহসা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড আরউইন ইংল্যাণ্ডের রাজার শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করে শোনান। তারপর ভারতের সেক্রেটারি বার্কেনহেড-এর একটি ভাষণ বাজিয়ে শোনানো হয়। এই ভাষণটি এইচ. এম. ভি. গ্রামোফোন কোম্পানি বিশেষভাবে রেকর্ড করিয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। লর্ড বার্কেনহেড তাঁর ভাষণে বলেন :

> Few events have given me greater satisfaction than the introduction during my term of office of broadcasting into India and offer my cordical congratulations on this epoc making occasion... I Ask you however, to visualise the day, the sceptic might suppose when in every village of the country side there will be men, women and children and those not only of the well-to-do classes, listening through the mediums of their own vernacular to the true story of world and to the expression of quickening thoughts and ideas, which but could never reach them. [8]

Indian Broadcasting Company-র পার্টটাইম অধিকর্তা ছিলেন মি. J. R. Stepleton সাহেব। আর ভারতীয় প্রোগ্রামের অধিকর্তা ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং তাঁর সহকারী ছিলেন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়াল। তখন শ্রোতারা রেডিয়োর অনুষ্ঠান শুনতেন হেডফোন কানে দিয়ে। এক জন ছাড়া অন্য কেউ শুনতে পেতেন না। বেতার তখন জনসাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে থাকত এই রেডিয়ো। কিছুদিনের মধ্যে লাউডস্পিকারের সৃষ্টি হল, তখন শ্রোতাদের অনুষ্ঠান শোনার সুবিধে হল। এরপর ধীরে ধীরে অবশ্য রেডিয়ো সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে গেল।

তখনকার বেতার-অনুষ্ঠান মানেই ছিল শুধু গানবাজনা আর সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে নাটকের অংশবিশেষ রিলে করে শোনানো। পুরো নাটক শোনানো সম্ভব ছিল না, কারণ তখন রঙ্গমঞ্চে থিয়েটারের সময় ছিল ৫ ঘণ্টা। এই শনিবার কিছুটা, আবার পরের শনিবার একটা অঙ্ক, এইভাবেই চলছিল। বেতার-অনুষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার কয়েক মাস পরে নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার 'বেতার নাটুকে দল' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'জমা খরচ' নাট্যরূপ দিয়ে বেতারে পরিবেশন করলেন। সম্ভবত এটাই বেতারের প্রথম রঙ্গমঞ্চের অভিনীত শিল্পী ছাড়া অনুষ্ঠান। তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু'।

এইসব নাট্যানুষ্ঠানই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সম্প্রচারিত হতে লাগল। এর ফলে 'বেতার নাটুকে দল'-এর অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। এই সময়ে পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট' নাটকটি প্রচার করার আর্জি নিয়ে 'চিত্রাসংসদ'-এর সদস্যরা হাজির হলেন নৃপেন্দ্রনাথের কাছে। অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনার জন্য নৃপেন্দ্রনাথ রাজি হয়ে গেলেন।

এই নাটকে অভিনয় করলেন বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে চিত্র পরিচালক), সত্য দত্ত ও শিশির ঘোষ (স্ত্রী চরিত্রে)।

'চিকিৎসা সংকট' প্রচারিত হয় ২১ জুলাই ১৯২৮ তারিখে রাত ৭-৪০ মিনিটে। এটির পরিচালক ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। রেডিয়োতে এই প্রথম সফল অনুষ্ঠান করে 'চিত্রাসংসদ'-এর সদস্যরা আপ্লুত হয়ে উঠল। নাটকটি দু-তিন বার পুনঃপ্রচারিত হয়।

৪ ডিসেম্বর ১৯২৮-এ রাত ৭-৪৫ মিনিটে 'চিকিৎসা সংকট' আবার প্রচার করা হয়। কারণ, কোনো পত্রপত্রিকাতেই এটিকে নাটক বলে উল্লেখ করা হয়নি। নকশাটিকে হুবহু প্রচার করা হয়েছিল বলে শ্রোতারা আশানুরূপ আনন্দ লাভ করেননি। এইজন্য বেতারধর্মী নাট্যরূপ দান করেন কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী। এই নাট্যরূপ প্রচারিত হয় ২২ ডিসেম্বর ১৯৩২ তারিখে রাত ৭টায়। 'বেতারজগৎ'-এ উল্লেখ করা হয়েছিল গ্রন্থকার নাটকের নাম দিয়েছেন 'মনপ্যাথি'।

১৯২৭-এর শেষ দিকে 'চিত্রাসংসদ' ক্লাব নিবেদন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহ' নাটকটি। রাত ৮টায় প্রচারিত এই কৌতুকনাট্যে অংশগ্রহণ করেন : জগমোহন—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সতীশ—পঙ্কজকুমার মল্লিক, রমাকান্ত—সত্য দত্ত, তুলসী দাস—বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও নয়নতারার ভূমিকায় বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। এই তথ্যটি, স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় 'দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহ' ১৯২৭-এর নাটক নয়। হীরেন বসু তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

> In 1929 was established the Radio Drama Club (Betar Natuke Dal) and from 1929 to 1934 I was the Drama-in-charge of this club, its first drama was opera written by me entitled 'Manbhanjan' in which the role of Srikrishna was played by myself.[৫]

বেতার নাটুকে দল প্রকৃতপক্ষে বেতারকর্মীদের সংঘবদ্ধ একটি নাম মাত্র। নাটকের পরীক্ষানিরীক্ষা ও ক্রমবিকাশে এই দলের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এই দলের প্রতিষ্ঠাবর্ষ ও প্রথম প্রচারিত নাটক সম্পর্কে হীরেন বসুর মন্তব্য ভীষণ ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, বেতারে নাটুকে দল গড়ে ওঠে ১৯২৯-এর অনেক আগে এবং দ্বিতীয়ত, এই দলের প্রথম নাটক 'মানভঞ্জন' নয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন : বেতার শুরু হওয়ার দু-তিন মাস পরেই ভারতীয় প্রোগ্রামের অধিকর্তা সুপ্রসিদ্ধ ক্ল্যারিওনেট বাদক নৃপেন্দ্রনাথ স্বয়ং সংগীত শিল্পীদের নিয়েই একটি নাটকের দল গঠন করলেন। এই নাট্যগোষ্ঠীর নামকরণ করলেন বেতারের এক ঘনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক, নৃপেনবাবুর বন্ধু ও বেতার ব্যবসায়ী আশু দে। সংগঠিত সংস্থার নাম হল 'বেতার নাটুকে দল'। নৃপেনবাবু স্বয়ং অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছোটোগল্প 'জমা খরচ' পড়ে নিজেই তার নাট্যরূপ দান করলেন ও তার একজন সংগীতশিল্পী সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার (বকুবাবু) মহাশয়ের ওপর ভার দিলেন পরিচালনার। নৃপেনবাবু স্বয়ং এই কৌতুক নাটকটির প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।[৬] বেতার প্রবর্তিত হওয়ার দু-তিন মাস পরে যে 'বেতার নাটুকে দল' সংগঠিত হয়, তার প্রমাণ রয়েছে স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান—এই দুটি ইংরেজি দৈনিকে। দুটি কাগজেই ১৯.০১.১৯২৮ তারিখে ছাপা হয়েছিল : 8 p.m. Betar Natuke Dal : a comic skit in Bengali.

হীরেন বসুর 'মানভঞ্জন' গীতিনাট্যের প্রচার তারিখ সংবাদপত্রের মতে ২২.২.২৯ মঙ্গলবার রাত ৭-৪৫ মিনিটে। নাটকটি আড়াই ঘন্টা অভিনীত হয়েছিল। স্টেটসম্যানে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি ছিল :

> Manbhanjan by Hirendra Kumar Bose
> Cast : Narode : Krishna Chandra De.
> Krishna : Krishna Chandra Ghosh
> Sreeradha : Binapani
> Brinday : Profulla Bala

Lalita : Abirabala

হীরেন বসুর দাবি তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ওই চরিত্রে অভিনয় করার কথা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের।

বেতারনাট্য গবেষক শ্রীসূর্যকুমার সরকার জানিয়েছেন : ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত 'নরনারায়ণ' নাটকটিকেই আমরা বেতারে প্রচারিত প্রথম বাংলা নাটক বলে স্বীকৃতি জানাব, কারণ এর প্রচার তারিখ ১৬.১২.২৮ এবং এর আগে ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় না। সে-হিসেবে এটিই ভারতের প্রথম প্রচারিত নাট্যানুষ্ঠান।[৭]

৫

যাই হোক বাণীকুমার এই মাস-মিডিয়াটিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাবার জন্য আরও সক্রিয় হয়ে উঠলেন। দ্রুত তিনি নাট্যরূপ দিলেন কয়েকটি নাটকের। অভিনেতা তখন তো সর্বসাকুল্যে ছ-সাত জন। এবার তাঁর পরিচালনায় বেতারস্থ হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ'। এই প্রযোজনায় বাণীকুমার স্বরচিত কয়েকটি গান সংযোজন করলেন।

এরপরে বাণীকুমার করলেন রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। দুটি নাটকই শ্রোতাদের ভালো লাগল।

নলিনীকান্ত সরকার অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর রজতজয়ন্তীর সময়ে লিখেছিলেন—কয়েকটি ক্লাবের সদস্যরা এলেন গান-বাজনা করতে। এইরূপ একটি ক্লাব 'চিত্রাসংসদ'। বেতারের নিয়মিত প্রোগ্রামের উন্নয়নের জন্য নৃপেনবাবু এই 'চিত্রাসংসদ'-এর কয়েক জনকে বেছে নিলেন। এই সদস্যরা হলেন একালের নাট্যপরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, 'সংগীতশিক্ষার আসর'-এর পঙ্কজকুমার মল্লিক, 'বেতার-বিচিত্রা'-র পরিচালক কবি বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য) ও বাংলা সংবাদ ঘোষক বিজন বসু...'

১৯২৮ খ্রি. বাণীকুমার কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যুক্ত হলেন। স্থায়ী সরকারি চাকরি ছেড়ে বেছে নিলেন অনিশ্চয়তার পথ। বেতারের এই প্রাথমিক প্রস্তুতির পর্বেই বেসরকারি সংস্থা আর্থিক সমস্যায় পড়ে। ১৯৩০-এ নতুন একটি বেসরকারি সংস্থা 'স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' বেতার সম্প্রচারের দায়িত্ব নেন। এই সংস্থাটি ভারত সরকারের অধীনে আসা সত্ত্বেও আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারল না। ফলে সম্প্রচার বন্ধ হবার উপক্রম হল। ১৯৩৬ খ্রি. এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে করা হল All India Radio। পরে ১৯৫৭ (?) খ্রি. এর নাম হল 'আকাশবাণী'।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের টালমাটাল অবস্থাতেও বাণীকুমার বেতার ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবেননি। তখন বেতারে অনুষ্ঠানকর্মীর সংখ্যা হাতে গোনা যেত। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'মহিলা মজলিশ' নিয়ে ব্যস্ত, বাণীকুমার নানা ধরনের গান লিখছেন আর তাতে সুর দিচ্ছেন পঙ্কজকুমার ও রাইচাঁদ বড়াল। শিল্পীদের শেখানো হচ্ছে এবং বেতারে প্রচার করা হচ্ছে। এ ছাড়া বাণীকুমার নানা বিষয়ে ছোটো ছোটো ফিচার লিখে শ্রোতাদের পরিবেশন করেছেন। পঙ্কজকুমার তো তাঁর পছন্দের বিষয় সংগীত নিয়ে পাগল। তিনি শুরু করলেন 'সংগীতশিক্ষা'। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও অনুষ্ঠান যেন দানা বাঁধছে না। নৃপেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে 'বেতার নাটুকে দল'-কে প্রাণবন্ত করে তোলার দায়িত্ব দিলেন। থিয়েটারে তখন পাঁচ ঘন্টা ধরে নাটক হত, 'নাটুকে দল' সেই নাটক তিন ঘন্টায় পরিবেশন করা শুরু করল প্রতি শুক্রবার। নাটক অবশ্য থিয়েটারের মতোই, থিয়েটারি ধাঁচেই প্রচার হতে লাগল। কারণ শিল্পীরা সকলেই থিয়েটারের এবং বেতারনাটকের এই নতুন মাধ্যমটি তখন নিজস্ব কোনো রূপ পায়নি।

বাণীকুমারের উদ্ভাবনীশক্তি ছিল অসাধারণ। এই মাস-মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি সম্প্রচারকে সাফল্যমন্ডিত করতে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলেন। এই সময় নৃপেন্দ্রনাথের নির্দেশে বাণীকুমার 'বেতার-বিচিত্রা' শিরোনামে একটি ছোটো পরিকল্পনা পেশ করলেন এবং তা গৃহীত হল। এরপর খ্রিষ্টাব্দ-তারিখ অনুযায়ী বাণীকুমারের অনুষ্ঠানের একটি তালিকা দেওয়া হল :

১৯৩০

শুক্রবার ২৬ ডিসেম্বর/১০ পৌষ, ১৩৩৭ বেতারস্থ হয় বাণীকুমার প্রণীত স্বল্প সময়ের নাটক ‘কর্পূরমঞ্জরী’। এতে অভিনয় করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, হীরেন বসু, রবি রায়, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বিজন বসু।
শুক্রবার ১ অগাস্ট, ১৬ শ্রাবণ, ১৩৩৭ বাণীকুমার বেতার-নাট্যরূপ দেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক ‘উলুপী’-র। আড়াই ঘন্টা সময়সীমার এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বয়ং বাণীকুমার।
শুক্রবার ২৯ অগাস্ট, ১২ ভাদ্র, ১৩৩৭ প্রচারিত হয় আড়াই ঘন্টা সময়সীমার আর একটি নাটক ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত এ নাটকটির বেতাররূপ দেন বাণীকুমার।
১৯৩১
জানুয়ারি মাসে বাণীকুমার লেখেন সংগীত-বিচিত্রা ‘সরস্বতী’।
১৫ ফেব্রুয়ারি, ৩ ফাল্গুন, ১৩৩৭ রাত ১০টা থেকে ১২টা দু-ঘণ্টাব্যাপী প্রচারিত হয় ‘শিবরাত্রি’ উপলক্ষ্যে অভিনব অনুষ্ঠান। রচয়িতা ও প্রযোজক বাণীকুমার।
২৯ মার্চ বেতারশিল্পীগণ পরিবেশন করেন বাণীকুমার রচিত ‘বাসন্তীপূজা’। সুরারোপ—রাইচাঁদ বড়াল।
১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৩৩৮), সন্ধে ৭টায় অভিনীত হয় রেডিয়ো আর্টিস্টগণ কর্তৃক ‘ঋতুমঙ্গল’। রচয়িতা—বাণীকুমার।
শুক্রবার ২০মে (৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) রাত সাড়ে নটা থেকে ১১টা—দেড় ঘণ্টা সময়সীমায় পরিবেশিত হয় বাণীকুমার রচিত বিশেষ অনুষ্ঠান ‘সমুদ্রসৈকতে’।
২৭ জুলাই রাত সাড়ে নটা থেকে ১১টা পর্যন্ত বেতারশিল্পীগণ নিবেদন করেন বাণীকুমার প্রণীত নাটক ‘আগন্তুক’।
বেতারশিল্পীগণ কর্তৃক বাণীকুমারের লেখা ‘কিশোর’ সম্প্রচারিত হয় শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর (১৮ ভাদ্র ১৩৩৮) রাত ৮-১০ থেকে ১১টা পর্যন্ত।
১৯৩২
মঙ্গলবার ১ নভেম্বর (১৫ কার্তিক ১৩৩৯) ‘সংগীতশিক্ষা’ অনুষ্ঠানের জন্য লিখলেন গান ‘ওগো সাথি ভালোবাসি/ কেন দুখ দিলে প্রাণে’। সুর ও স্বরলিপি—পঙ্কজকুমার মল্লিক।
১৯৩৩
‘সংগীতশিক্ষা’ আসরে শেখানো হল বাণীকুমারের লেখা গান—‘এ কী পুলক জাগল বুকে মম’। সুর ও স্বরলিপি—পঙ্কজকুমার মল্লিক।
শুক্রবার ২৭ জানুয়ারি (১৪ মার্চ ১৩৩৯) রাত সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয় বাণীকুমার প্রণীত বেতারনাটক ‘মিলনপূর্ণিমা’।
২৪ ফেব্রুয়ারি (১২ ফাল্গুন ১৩৩৯) : এই পক্ষকালে ‘সংগীতশিক্ষা’-তে শেখানো হয় বাণীকুমারের লেখা গান—‘আমারে ভালোবেসেছ মনের মাধুরী দিয়ে’। সুর ও স্বরলিপি/পঙ্কজকুমার মল্লিক।
মঙ্গলবার ১৪ মার্চ (৩০ ফাল্গুন, ১৩৩৯) সন্ধে ৬-৪০ মিনিটে বেতারস্থ হয় বাণীকুমার রচিত নাটক ‘আগন্তুক’।
৬ জুন মঙ্গলবার (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) রাত ৮টায় পরিবেশিত হয় বাণীকুমার প্রণীত নাটক ‘সাগরের ডাক’।
শুক্রবার ৯ জুন (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) রাত সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয় বাণীকুমার বিরচিত নাটক ‘রিক্তা’।
শুক্রবার ২১ জুলাই (৫ শ্রাবণ ১৩৪০) অভিনীত হয় বাণীকুমারের লেখা নাটক ‘শ্রীমতী’।

শনিবার ১২ আগস্ট (২৭ শ্রাবণ ১৩৪০) সন্ধে ৭টায় বেতার শিল্পীসঙ্ঘ অভিনয় করেন বাণীকুমার-রচিত 'জন্মাষ্টমী'।

শুক্রবার ২৫ আগস্ট (৯ ভাদ্র ১৩৪০) সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত বাণীকুমারের লেখা নাটক 'মিলনপূর্ণিমা'-র পুনরভিনয়।

১৬ সেপ্টেম্বর (৩১ ভাদ্র ১৩৪০) সন্ধে ৭-১৫ মিনিটে শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে 'শরৎশর্বরী' অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত লেখেন বাণীকুমার। সুরারোপ—পঙ্কজকুমার মল্লিক।

শুক্রবার ২২সেপ্টেম্বর (৬ আশ্বিন ১৩৪০) সন্ধে সাড়ে-সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত পুনঃসম্প্রচার হয় বাণীকুমার রচিত নাটক 'রিক্তা'।

মঙ্গলবার ২৪ অক্টোবর (৭ কার্তিক ১৩৪০) রাত ৮টা থেকে ৮-৫০ মিনিটে বেতারস্থ হয় বাণীকুমার রচিত 'জয়ের মালা'।

সোমবার ২৫ ডিসেম্বর (১০ পৌষ ১৩৪০) রাত সাড়ে-নটা থেকে দশটা পর্যন্ত পরিবেশিত হয় বাণীকুমারের নাটক 'ধূমপান নিষেধ'।

১৯৩৪

সোমবার ১২ফেব্রুয়ারি (২৯ মাঘ ১৩৪০) রাত সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আয়োজিত হয় বাণীকুমার রচিত ও পরিচালিত শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান। অবশ্য এই অনুষ্ঠানটির কোনো Title ছিল না।

শুক্রবার ১৮ মে (৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয় বাণীকুমার রচিত নাটক 'আগন্তুক'। অভিনয় করেন—'বেতার নাটুকে দল'।

শুক্রবার ১৫ জুন (৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) রাত ৭-৩০ থেকে ১০-৩০ সম্প্রচারিত হয় বাণীকুমার রচিত নাটক 'রিক্তা'। এতে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নায়িকা ছিলেন উষাবতী। সংগীত পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক।

শুক্রবার ২০ জুলাই (৪ শ্রাবণ ১৩৪১) বেতার নাটুকে দল অভিনয় করেন বাণীকুমার রচিত নাটক 'মৃত্যুদূত'।

শুক্রবার ১০ আগস্ট (২৫ শ্রাবণ ১৩৪১) 'বিচিত্রা'-য় সম্প্রচারিত হয় বাণীকুমার রচিত 'বৌদ্ধযুগের ঘটনা'।

শুক্রবার ৫ অক্টোবর (১৮ আশ্বিন ১৩৪১) রাত সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত 'বেতার নাটুকে দল' অভিনয় করেন বাণীকুমার রচিত নাটক 'মৃত্যুদূত'। এর ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :

শংকরনাথ (পিনাকীর পালিত সন্তান)—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়।

কর্মযোগী চৌধুরী (পিনাকীর শত্রুপক্ষ)—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

বিষ্ণু গুপ্ত (ব্যারিস্টার ও ডিটেকটিভ)—রঘুবীর রায়।

মদনমোহন চৌধুরী (কর্মযোগীর পুত্র)—হীরেন বসু।

ধূর্জটি রুদ্র—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

বিনয় ভদ্র—বিশ্বনাথ ঘোষ।

ত্রিলোচন বর্মণ—তুলসী লাহিড়ী।

অজিত লাহিড়ী—মণি মজুমদার।

নগেন দাস—নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ

প্রজ্ঞাসুন্দরী—নিভাননী।

ললিতা—উষাবতী।

গোপা—পদ্মাবতী

৮ অক্টোবর (২১ আশ্বিন ১৩৪১) রাত ৭টা থেকে সাড়ে সাতটায় নিবেদিত হয় বাণীকুমার রচিত ‘শারদীয় বন্দনা’।
শুক্রবার ১৪ অক্টোবর (২৮ আশ্বিন, ১৩৪১) এ পক্ষের ‘সংগীত শিক্ষা’য় পরিবেশিত হয় পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরারোপিত বাণীকুমারের লেখা নীচের গানটি :

ফাগুন-রঙিন পথ যে-রে ওই
ভোলায় কেন মন।
সাথি আমার এলো এবার
সব হারাবার ক্ষণ।
বাহির হলেম একা একা—
কখন তোমার মিলবে দেখা,
মিলন-আশায় আজি গান গায়
বিজন গিরি-বন।।
অন্ধকারে হারিয়ে গেছি
তাই তো কেঁদে মরি!
হাত ধরে আজ লও গো ডেকে
চলব কেমন করি!!

১৯৩৬

সোমবার ৩০ মার্চ (১৭ চৈত্র ১৩৪২) বেতারস্থ হয় বাণীকুমার রচিত ‘সন্ধ্যাসুন্দর বারাণসী’। সুরারোপ/ পঙ্কজকুমার মল্লিক। প্রযোজনা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (বি. এ.) ওমি. বি. ভট্টাচার্য।
মঙ্গলবার ১৫ এপ্রিল (২ বৈশাখ ১৩৪৩) ‘সংগীতশিক্ষা’-য় শেখানো হয়েছে বাণীকুমার রচিত ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরারোপিত এই গানটি :

তুমি রঙের বিলাস জাগায়ে দিয়ে হে এসেছ প্রাণে।
প্রিয় রভস লাগালে আবেশ ঝরালে বেণুর তানে।।
তোমার তনুর মুকুরে আমার মুরতি হেরি হে
আজি ফাগুন নিতি তরুণ-প্রীতি বহিয়া আনে।।
কত-যে সুখে কত-যে আশে রয়েছি জাগি।
রচি বসন্ত অনুরাগ আমি তোমার লাগি।
বধূ প্রেমের মধু দাও হৃদি-পুটে ভরি হে।
হিয়ার নীড়ে মাধুরী ঘিরে মোহন গানে।

সুর ও স্বরলিপি—পঙ্কজকুমার মল্লিক। স্বরলিপি ‘বেতার জগৎ’-এ ছাপা হয়েছে।
শুক্রবার ৮ মে (২৫ বৈশাখ, ১৩৪৩) রাত সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটায় প্রচারিত হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁরই রচিত নাটক ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’।
রবিবার ৩১মে (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) ‘সংগীত শিক্ষা’-র জন্য বাণীকুমার লিখলেন :

সুন্দর মম শুনালে যে কোন বাণী—
হরষে মগন ধরা।
সে-বারতা মোর মরমের জানি-জানি
আশার রাগিণী ভরা।
জীবনে আসিয়া দাঁড়ালে গো রমণীয়,—
কহিলে পরাণ-প্রিয়,—

'তোমার বীণায় মোর গান সেধে নিও'
ধরা দিনু অগোচর।।
হৃদয় আমার ফুটিল কুসুম হয়ে—
সকল মাধুরী লয়ে,—
সঁপিনু তোমার সে-ফুল গোপনে লয়ে
ভরি ডালা মনোহরা।।

সুর ও স্বরলিপি—পঙ্কজকুমার মল্লিক। স্বরলিপি 'বেতার জগৎ'-এ প্রকাশিত।

সোমবার ১৫ জুন (১আষাঢ় ১৩৪৩) নিবেদিত হয় বাণীকুমার রচিত ও প্রযোজিত 'মেঘদূত'। সংগীত-সর্জন—পঙ্কজকুমার মল্লিক।

শনিবার ৪ জুলাই (২০ আষাঢ়, ১৩৪৩) রাত ৭-৪৫ মিনিটে বিচিত্র অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় 'প্রাচীনা কলকাতা'। রচয়িতা ও প্রযোজক—বাণীকুমার।

মঙ্গলবার ৭ জুলাই (২৩ আষাঢ়, ১৩৪৩) রাত ৭-৪৫ মিনিটে বিচিত্র-অনুষ্ঠানে শোনানো হয় 'সাগর সৈকতে'। রচয়িতা ও প্রযোজক—বাণীকুমার। সুরসৃষ্টি—শৈলেশ দত্তগুপ্ত।

মঙ্গলবার ২৩ জুন (৯ আষাঢ়, ১৩৪৩) রাত ৭টায় বাণীকুমার প্রযোজনা করেন 'উদয় উৎসব'। স্বরচিত এই অনুষ্ঠানে সুরকার ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। অর্কেস্ট্রা সংগত—বেতার অর্কেস্ট্রা, পরিচালনা—তারকনাথ দে।

বিচিত্র অনুষ্ঠানে ১৫ জুলাই (৩১ আষাঢ়, ১৩৪৩) রাত ৭-১০ মিনিটে বেতারস্থ হয় বাণীকুমার রচিত ও প্রযোজিত 'জগন্মাতার মন্দির'। সুরারোপ—পঙ্কজকুমার মল্লিক।

১৯৩৭

৬ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭-২৫ মিনিটে 'সত্যকাম জবালা'। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার।

১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রচারিত হয় 'পৌষ-পার্বণ'। সংগীত পরিচালনা/শৈলেশ দত্তগুপ্ত। সহগামী-সংগীত সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় যন্ত্রিসঙ্ঘ।

২০ জানুয়ারি বেতারস্থ হয় 'সাগরের মায়া'। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার (বেতার-অর্কেস্ট্রা সহযোগে)।

২৭ জানুয়ারি পরিবেশিত হয় বাণীকুমার রচিত ও পরিচালিত 'বিস্মৃত বৈশালী'। নির্দেশ /সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সুর/সুরনাথ মজুমদার ও এস.এল. দাস।

১০ ফেব্রুয়ারি সম্প্রচারিত হয় 'শীতের অন্তরে রয় বসন্তের রূপ'। রচয়িতা ও প্রযোজক/বাণীকুমার। সংগীত-পরিচালনা/ পঙ্কজকুমার মল্লিক।

বাণীকুমার রচিত ও প্রযোজিত পরবর্তী অনুষ্ঠান/'মাঘমন্ডল'। সংগীত পরিচালনা/ শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত। সুরেন্দ্রলাল দাসের অধিনায়কতার যন্ত্রিসঙ্ঘের সংগীত-প্রয়োগ।

সোমবার ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬ টায় 'সারস্বত মঞ্জরী'। রচয়িতা ও প্রযোজক/বাণীকুমার। পরিচালক/ রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজকুমার মল্লিক।

শুক্রবার ২৬ মার্চ রাত ৯টায় নিবেদিত হয় বাণীকুমার-রচিত নাটক/'দোললীলা'। সংগীত-পরিচালক/ ধীরেন দাস ও রণজিৎ রায়। সংগীত-প্রয়োগ/তারকনাথ দে। নেতৃত্বে/বেতার-অর্কেস্ট্রা। চরিত্র-রূপায়ণে : শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ। মঞ্জুসখা/ধীরেন দাস। শ্রীরাধা/নীহারবালা। ললিতা/হরিমতি।

বুধবার ৩১ মার্চ সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে 'মন্দির-প্রাঙ্গণে'। রচনা প্রযোজনা/বাণীকুমার। সংগীত পরিচালনা/শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত।

বুধবার ৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে পরিবেশিত হয় 'তপস্যা'। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার। সংগীত-পরিচালনা/পঙ্কজকুমার মল্লিক।

১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায় প্রচারিত হয় বাণীকুমার রচিত ও পরিচালিত ‘চড়ক’। সংগীত-পরিচালনা/শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত।

২১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬-৫৫ মিনিটের অনুষ্ঠান ছিল ‘দৈত্যের স্বর্গসাধন’। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার। সুর/কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

বুধবার ৫ মে সন্ধ্যা ৬টায় পরিবেশিত হয় ‘শোণিত পারনা’। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার। সুর/পঙ্কজকুমার মল্লিক। সহগামী সংগীত/তারকনাথ দে-র পরিচালনায় বেতার-অর্কেস্ট্রা।

বুধবার ১২ মে সকাল ৯-৪৫ মিনিটে ‘অভিষেক’। (মহামান্য সম্রাট ৬ষ্ঠ জর্জ ও মহামান্যা সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ)। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার। সহগামী সংগীত সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় যন্ত্রিসঙ্ঘ।

১৯৩৮

১৯ জানুয়ারি সন্ধে ৬-৪৫ মিনিটে বেতারস্থ হয় ‘মাতরিশ্বা’। রচনা/অশোকনাথ শাস্ত্রী। রূপারোপ ও প্রযোজনা/বাণীকুমার। সংগীত প্রয়োগ/তারকনাথ দে-র নির্দেশে বেতার-অর্কেস্ট্রা।

২২ জানুয়ারি সন্ধে ৭-৩০ মিনিটের অনুষ্ঠান/‘গোধূলিকা’। রচনা/বাণীকুমার। সংগঠনা/শৈলেশ দত্তগুপ্ত। সংগীতানুষঙ্গ/সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় যন্ত্রিসঙ্ঘ। বিভিন্ন অংশে/পারুল চৌধুরী, গিরীন চক্রবর্তী ও সন্তোষ বসু। ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে ‘চিত্রস্মৃতি’। মালাকার ও প্রযোজক/বাণীকুমার। সহকারী/অনিলকুমার দাস।

১৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে পরিবেশিত হয় ‘সন্ধ্যালগ্নে বারাণসী’। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার। সংগীত/পঙ্কজকুমার মল্লিক। সহকারী/অনিলকুমার দাস। সংগীতানুষঙ্গ/তারকনাথ দে-র নির্দেশে বেতার-অর্কেস্ট্রা। ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধে ৬-১৫ মিনিটে ‘শিবায়ন চতুরঙ্গ’। রচয়িতা ও প্রয়োগশিল্পী/সুরেন্দ্রলাল দাসের নির্দেশে যন্ত্রিসঙ্ঘ।

শনিবার ৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে ‘জাগ্রত ভগবান’। রচনা/বাণীকুমার। সংগীত-গঠন/শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত। সংগীতানুষঙ্গ/সুরেন্দ্রলাল দাসের নেতৃত্বে যন্ত্রিসঙ্ঘ।

বুধবার ১৬ মার্চ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ‘ফল্গু উৎসব’। রচয়িতা ও প্রয়োগশিল্পী/বাণীকুমার। সংগীত-পরিচালক/পঙ্কজকুমার মল্লিক। সংগীত প্রয়োগ/তারকনাথ দে-র নেতৃত্বে বেতার-অর্কেস্ট্রা। বুধবার ৬ জুলাই সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে ‘প্রেমের ঠাকুর’। গল্পরচনা/রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম.এ। রূপারোপ ও প্রযোজনা/বাণীকুমার। সংগীত-পরিচালনা/পঙ্কজকুমার মল্লিক। সংগীত-প্রয়োগ/তারকনাথ দে-র নেতৃত্বে বেতার অর্কেস্ট্রা।

শনিবার ১৬ জুলাই সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে ‘বর্ষাবাসর’। রচনা/বাণীকুমার। সংগীত/খলিফা সাগির খাঁ। সংগীতানুষঙ্গ/সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় যন্ত্রিসঙ্ঘ। বিভিন্ন অংশে অনিল দাস, জটাধর পাইন ও রাধারাণি।

১৮ জুলাই সন্ধ্যা ৭-৫৫ মিনিটে সংগীতালেখ্য/‘মেঘাবক্ষে’। রচনা/বাণীকুমার। বিভিন্ন ভূমিকায় রাধারাণি ও ভবানী দাস। বুধবার ২০ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় ‘ধরার অন্তরে’ (প্রথম পর্যায়) ‘কয়লাখনি’। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার।

২৭ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা ‘কাফেন চোরা’। রচয়িতা ও প্রযোজক/বাণীকুমার। সংগীত-পরিচালনা/শৈলেশ দত্তগুপ্ত।

বুধবার ১০ অগাস্ট সন্ধ্যা ৭টায় ‘হিন্দোল’। রচনা ও পরিচালনা /বাণীকুমার। সংগীত-পরিচালনা/শচীন দাস। সংগীতানুষঙ্গ/বেতার-অর্কেস্ট্রা। পরিচালনা/তারকনাথ দে।

১৬ অগাস্ট ‘অতীতের স্মৃতি’ রচনা/বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। প্রযোজক/বাণীকুমার।

১৪ সেপ্টেম্বর ‘বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি’। রচনা/দেবেন্দ্রনাথ বসু। রূপারোপ ও প্রযোজনা/বাণীকুমার।

২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে 'চিরশরৎ'। রচনা/অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপারোপ প্রযোজনা/বাণীকুমার সংগীত/শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত। যন্ত্রসংগীত/বেতার-অর্কেস্ট্রা, পরিচালনা/তারকনাথ দে।

২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৫-৩০ মিনিটে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। রচনা বাণীকুমার, সংগীত পরিচালনা/পঙ্কজকুমার মল্লিক। সংগীত-প্রয়োগ/সুরেন্দ্রলাল দাসের নির্দেশে যন্ত্রিসঙ্ঘ।

বুধবার ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় 'চিত্তদোলা'। রচনা ও প্রযোজনা/বাণীকুমার। বিভিন্ন অংশে পঙ্কজকুমার মল্লিক, কানন দেবী, উমা দেবী, কে.এল. সায়গল ও রাধারাণি।

৭নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় 'রাস'। রচয়িতা ও প্রয়োগশিল্পী/বাণীকুমার। সংগীত-পরিচালনা/পঙ্কজকুমার মল্লিক। সংগীত-প্রয়োগ/সুরেন্দ্রলাল দাসের নেতৃত্বে যন্ত্রিসঙ্ঘ।

বাণীকুমারের 'বেতার-বিচিত্রা' এখানেই শেষ নয়। বাণীকুমার আরও অসংখ্য অনুষ্ঠান করেছেন 'বেতার-বিচিত্রা'-য়।

১৯৩৯

১৬ ডিসেম্বর (৩১ আষাঢ় ১৩৪৩) সম্প্রচারিত হয়েছিল বাণীকুমার রচিত নাটক 'দুয়ে দুয়ে পাঁচ'। অভিনয় করেছিলেন 'বেতার নাটুকে দল'।

১৯৫২

বাণীকুমার রচিত প্রামাণ্য নাটক (Documentary Feature Play) (যাকে 'দলিল রূপিকা' নামে অভিহিত করা হয়েছিল) 'বিচিত্র বিচারক' তাঁরই প্রযোজনায় বেতারস্থ হয়।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মতে, বাণীকুমার স্বল্পদৈর্ঘ্যের সহস্রাধিক অনুষ্ঠান রচনা করে গেছেন। বাণীকুমার বহু রবীন্দ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে বেতারে প্রযোজনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে—ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, দুই বোন, মালঞ্চ, গুপ্তধন, মাস্টারমশাই, পরিত্রাণ, কঙ্কাল, বাঁশরি, সুয়োরানির সাধ, মহামায়া ও কালের যাত্রা। গল্পগুচ্ছের একটা বেশ বড়ো অংশ তাঁর নাট্যরূপ ও প্রযোজনায় আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়। 'কঙ্কাল' ও 'সুয়োরানির সাধ'—একত্রে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম দুটি ছোটোগল্প একসঙ্গে বেতারে প্রচারিত হয়েছিল সম্ভবত ১৯৫৩-১৯৫৪-য়।

উপন্যাস ও ছোটোগল্পের নাট্যরূপ ও প্রযোজনার পাশাপাশি বাণীকুমার রবীন্দ্র-কবিতারও নাট্যরূপ দেন—এর মধ্যে ছিল বিবাহ, হোলিখেলা, ফাঁকি, দেবতার গ্রাস, পুরস্কার প্রভৃতি। বাণীকুমার বলেছিলেন যে, এই অনুষ্ঠানগুলি যখন প্রচারিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন, উনি কিন্তু কষ্ট পাননি।

এ ছাড়া তিনি নিজের দুটি কবিতা—'মূক বসুন্ধরা' ও 'বৈষ্ণব তীর্থযাত্রী' বেতাররূপ দিয়ে কলকাতা বেতার থেকে প্রচার করেন। 'সুন্দর' এই নামকরণ করে রবীন্দ্রগান ও নিজের গানে অলংকৃত করে তিনি বসন্তের যে ডালি সাজিয়েছিলেন, তা অভিনব ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়। বাণীকুমার নিজে 'বসন্তসুন্দর' কবিতাটি পাঠ করেন। সংগীত পরিচালনা করেন বাণীকুমারের সারাজীবনের অকৃত্রিম সুহৃদ পঙ্কজকুমার মল্লিক। গানে ছিলেন পঙ্কজ, হরিমতি, আভাবতী, প্রফুল্লবালা প্রমুখ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় বেশিরভাগ রচনাই আকাশবাণীতে বাণীকুমারের বেতাররূপারোপ ও প্রবর্তনায় প্রচারিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী, ইন্দিরা, (প্রচার তারিখ ৩১ অগাস্ট, ১৯৭৭) কমলাকান্ত, সীতারাম, মুচিরাম গুড়, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারানি, দুর্গেশনন্দিনী, লোকরহস্য ও বাবু।

বাণীকুমারের বেতারনাট্য-রূপায়িত ও প্রযোজিত শরৎ উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গৃহদাহ, বিরাজ বৌ, পরিণীতা, অরক্ষণীয়া, মেজদিদি, বামুনের মেয়ে, মামলার ফল, সতী ইত্যাদি।

রবীন্দ্র-শরৎ-বঙ্কিম ছাড়াও বাণীকুমার প্রযোজনা করেন বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, বিয়ে পাগলা বুড়ো, পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবা, রাতারাতি, রহস্যনাটক 'নাগচূড়া' প্রভৃতি। বাণীকুমার সাধারণত যে-নাটক প্রযোজনা করতেন, নিজেই তার নাট্যরূপ দিতেন।

সংস্কৃত নাটকের বাংলা রূপান্তরের ক্ষেত্রেও বাণীকুমার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। মহাকবি ভাসের স্বপ্ন বাসবদত্তা, প্রতিমা, ভ্রমরবাসিনীর অনুবাদ তিনিই বেতারে প্রযোজনা করেন। এ ছাড়া যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, রমা চৌধুরী এবং পন্ডিত ব্যক্তিদের সংস্কৃত নাটককে বেতার উপযোগী করে প্রচারের ব্যবস্থা করেন বাণীকুমার।

তখনকার বেতারে এমন কোনো বিভাগ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বাণীকুমারের অবদান নেই। শিশুবিভাগে তাঁর রচিত 'মণিকাঞ্চন নাটক ও গ্যালিভারের ভ্রমণ, গল্পদাদুর আসরে ইলিয়ড-ওডিসি, উতঙ্ক, নচিকেতা অভিনীত হয়। মহিলামহলেও বাণীকুমার রচিত ও পরিচালিত অনেক নাটক পরিবেশিত হয়েছে। এই মুহূর্তে মনে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান' নাটকের কথা।

সরস রচনার ক্ষেত্রেও বাণীকুমারের লেখনী শ্রোতাদের কাছে ছিল খুবই আকর্ষণীয়। এই ধরনের রচনার মধ্যে উল্লেখ্য—সম্মোহন, ধূমপান নিষেধ, অনধিকার প্রবেশ, অতএব, মধুপর্ক, ছত্রভঙ্গ, ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি।

দুঃখের বিষয়, বাণীকুমার রচিত ও প্রযোজিত এইসব নাটক এখন আর বিশেষ শোনা যায় না। কেন? আকাশবাণীর আর্কাইভে তা যত্ন সহকারে রাখা হয়নি? উত্তর দেবার কেউ আছে কি? মনে হয় না।

৬

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাণীকুমারের দেবতা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি অনেক লেখা লিখেছেন এবং তা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। এরকম অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে 'রবীন্দ্র মনোবাণী', 'রবীন্দ্র বর্ষাপন', 'মাঘোৎসব' প্রভৃতি।

২৫ বৈশাখ ১৩৬১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাণীকুমার একটি কবিতা লেখেন সেটি হল :

একদা এ বৈশাখের পরম লগনে
শ্যামা বঙ্গজননীর শোভন ভবনে
চিরজীবী শিশু এক উঠিলেন জাগি
বিধাতার জ্যোতিঃরেখা শুভ বর মাগি
শোভমানা ললাটিকা—তিনি শিশু রবি।
যে-বিশ্ব নবীন চির, প্রাণময় ছবি,
অনন্ত সেরসের সমুদ্রে পদ্ম-সম
ভাসমান যে জগৎ, তারি প্রিয়তম
চিরসুন্দর উদ্গাতা তরুণ তপন
পরিপূর্ণ সুরে তুলিলেন গভীর স্বনন
যৌবনের তেজোময় জীবনের গানে।
তারপর ওঠে বাজি কবি-বীণা তানে
জীবনের বিচিত্র আনন্দ-তৃপ্ত নব
সপ্ত স্বরগ্রাম—কত রাগিণী-বৈভব।
বিশ্বপাত্রের অমৃত করিলেন পান
ক্রান্তদর্শী কবি, মৃত্যুজিতা বাণী-দান।
করিলেন জগৎ-সভায়, শোনে তায়
সর্বলোক জাগরিত নবচেতনায়।
যে রূপ মাধুরী রহে জগৎ ব্যাপিয়া
নিলেন আপন কবির মিলন সাধিয়া।
বিকশিত শোভা তার রস সৃষ্টিলোকে
মাধুরীর ধ্যানে-স্তবে অসীম-পুলকে,

অন্তহীন আয়োজন জীবন ভরিয়া—
চির যৌবনের লীলা সুধা উন্মথিয়া।
হে চিরজীবিত কবি—হে চিরজীবন
চিত্ত-বন্দ্যনীয় নমি হে চিরনূতন।।

'কবি প্রণাম' নামে বাণীকুমার যে বন্দনাগীতি লিখেছিলেন, যাতে সুর দিয়েছিলেন পঙ্কজকুমার, তার কয়েকটি পঙক্তি হল :

'পূরব গগন জাগ্রত করি নব উদয়ন-সংগীতে
দিলে এনে তুমি প্রাণ রসধারা বিশ্বে ললিত ভঙ্গিতে।'

বাণীকুমার সংস্কৃত ভাষায়ও রবীন্দ্র-প্রশস্তি রচনা করেছিলেন, যা পঙ্কজ মল্লিক সুর দিয়ে দীর্ঘদিন বিভিন্ন জায়গায় গেয়েছেন। এই সংস্কৃত রবীন্দ্র-প্রশস্তি সেকালে বিশেষ সমাদর লাভ করে।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত বাণীকুমার কয়েকটি বাংলা রবীন্দ্রসংগীতকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর ঘটান। যেমন :

১. বঙ্গমৃত্তিকা বঙ্গ জলম (বাংলার মাটি বাংলার জল)
২. মম মুর্ধানমানময় তব (আমার মাথা নত করে দাও)
৩. ত্বংকথঙ্কারং গায়সি (তুমি কেমন করে গান করো)
৪. বিপদো মাং গোপয়তু (বিপদে মোরে রক্ষা কর)
৫. অন্তরংমে বিকাশয়তু (অন্তর মম বিকশিত কর)
৬. অয়ি ভুবন মনোমোহিনী।

বেতারের কর্মজীবনে বাণীকুমার কাজি নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, চুঁচুড়া নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বাণীকুমার সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দেন তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। বাণীকুমার বলেছিলেন, 'কবি নজরুলের কর্মযোগী ও ধ্যানযোগী রূপের পরিচয় পেয়েছি—যখন তাকে আমাদের মধ্যে একসঙ্গে পেয়েছি বেতার প্রতিষ্ঠানে। ...তাঁর কর্মশক্তির তুলনা ছিল না। আমি তাঁকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একযোগে কাজ করে যেতে দেখেছি, কখনো কাব্যরচনায় ব্যস্ত, কখনো সুরে-বাণীতে গীতগানের হরগৌরী মিলন ঘটাবার চেষ্টা, কখনো ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে অদম্য উদ্যম। এইভাবে তিনি কয়েক বৎসর ধরে বেতার মাধ্যমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিচিত্র সুরের মালা গেঁথে জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন, তার রস-সুরভি সকলের অন্তরকে মুগ্ধ করেছে। তারপর দেখেছি কাজের ফাঁকে বহুক্ষণব্যাপী তাঁর ধ্যান-মৌন অচঞ্চল মূর্তি। মানসিক ও সাত্ত্বিক রূপের এরকম যুগপৎ মিলন দেখে তাঁর প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়েছি। তিনি আদর করে আমার বীথি-নাট্যে বহু গানে সুর দিয়েছেন। তিনি আমাকে অন্তর দিয়ে আমার রচনার কত প্রশংসা করে জড়িয়ে ধরে উৎসাহ দিয়েছেন। ...তাঁর জন্মদিনে আমার অন্তরের বাণী নিবেদন :

হে কবি
বাস্তবে ও কল্পনায় রচিয়াছ আপন মহিমা,
গড়িয়াছ রুদ্রশক্তি রুদ্রাণীর অপূর্ব প্রতিমা।
আজিকে সহসা কেন নিয়তির নিষ্ঠুর শাসন
বাধা দেয় প্রকাশ-আগ্রহ তব, দৃপ্ত সম্ভাষণ।
প্রাণ শক্তি মন্ত্র তব পাবে নাকি শেষ সার্থকতা,
অপূর্ব বিদ্রোহ-ক্ষোভ রবে শুধু অস্তিত্বের ব্যথা?
নিত্য তব কাব্য সাজি ভরি নানা নৈবেদ্য সাজালে,
আপনার শ্রেষ্ঠদান পূর্ণ করি দিলে কালে কালে।
সাধনার মহাক্ষণ ধূলিতে কি হইবে বিলীন?

পরম চৈতন্য-বরে জাগিবে না তব জন্মদিন?
হও তুমি কালজয়ী জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে।
আরবার নব প্রেরণায় মাতি জেগে ওঠো ভবে—
গাহিবারে যৌবনের জয়গান পূর্ণের উৎসবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাজি নজরুল ইসলাম বাণীকুমারের রচনা ও প্রযোজনায় ওমর খৈয়াম নাটকটিতে সংগীত পরিচালনা করেন এবং তা ২৯ জানুয়ারি ১৯৪১-এ কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। এ ছাড়া কাজি নজরুল বাণীকুমারকে খুব পছন্দ করতেন, তাই স্বেচ্ছায় বাণীকুমারের লেখা কিছু গানে সুরও দেন।

৭

বাণীকুমারের ছেলে নৃসিংহকুমার লিখেছেন: আমি তখন খুব ছোটো। ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি। তখন বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, তুমি 'বাণীকুমার' এই ছদ্মনাম নিলে কেন? বাবা প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, বাণীকুমার কথার মানে কী, তা কি তুমি জানো? আমি তখন আমতা-আমতা করছি। উনি বললেন, 'বাণীকুমার মানে 'সরস্বতীর বরপুত্র'। আমি সরস্বতীর বরপুত্র হিসেবেই বেঁচে থাকতে চাই।

'বাণীকুমার, আনন্দবর্ধন, বৈ. না. ভ. বিষ্ণু গুপ্ত ছদ্মনামে ভারতবর্ষ, ভারতী, সাহানা, প্রবাসী, বসুমতী, পূর্ণিমা, বঙ্গশ্রী, শুকতারা, মৌচাক প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় অনেক লেখা লিখেছেন এবং আরও অনেক লেখা লিখে গেছেন বা অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত পুস্তক 'সন্তান', 'সপ্তর্ষি', 'গীতবল্লকী', 'স্বরলিপিকা' (২ খন্ড) 'চোরাবাঁশি', 'কথা-কথালি', 'মহিষাসুরমর্দিনী', 'রায়বাঘিনি', হাওড়া-হুগলির ইতিহাস' প্রভৃতি। শেষ দুটি পুস্তক নবভাবে গ্রথিত, পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত হয়।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ—বাণীকুমার বুঝেছিলেন এই পার্বণ উৎসবকে মানুষের দরবারে যদি শ্রুতিমধুর করে তুলে ধরা যায়, তা হলে বেতারের শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং বেতার সাধারণের কাছের জিনিস হয়ে উঠবে। এজন্য তিনি একের পর এক সংগীত-বিচিত্রার সম্ভার উপস্থাপন করতে লাগলেন, আর তার সংগীতের গুরুভার বহন করলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু পঙ্কজকুমার মল্লিক। এরকম কয়েকটি অনবদ্য অনুষ্ঠান হল—'শিবায়ন চতুরঙ্গ', 'বসন্তেশ্বরী', 'ঋতুমালিকা', 'ফল্গু উৎসব' (বসন্ত), 'কাজরী', 'আবীর-কুমকুম' (দোল), 'পৌষপার্বণ', 'চড়ক', 'জন্মাষ্টমী', 'রামনবমী', 'রাসলীলা', 'সত্যনারায়ণ' প্রভৃতি। এই বেতার-বিচিত্রার 'বসন্তেশ্বরী' ১৯৩১ খ্রি. বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হবার পর শ্রোতৃবর্গ এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। সৃষ্টিশীল মানুষের কর্মধারা যখন সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেন, তখন সেই মানুষ সাধনায় বল পান আরও। তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ কলকাতা বেতার কেন্দ্রের 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এই 'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতি-আলেখ্যটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পঙ্কজকুমার তাঁর আত্মজীবনী 'আমার যুগ আমার গান' গ্রন্থে লিখেছেন :

> বাণীকুমার অতি সুন্দরভাবে নানাধরনের অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করতেন। অভিনবত্বের দিক থেকে বাণীকুমারের উদ্ভাবনীশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর তুলনা বেতারে আমাদের কর্মজীবনে আর দেখিনি। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে যেমন—দুর্গাপূজা, শিবরাত্রি, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিতে তিনি অভিনব সব অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট রচনা করে দিতেন। শুধু কি তাই? মাস-অনুসারে নানা উৎসবের পরিকল্পনাও তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি রীতিমতো বেতারে বারমাস্যার আয়োজন করতেন। এইরূপ বিচিত্র সব অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নববর্ষ, মাঘমন্ডল ব্রত, বুদ্ধদেবের বোধিসত্ত্ব লাভ ও নির্বাণ লাভের দিনগুলি, আষাঢ়স্য প্রথম দিবস, কোজাগরী পূর্ণিমা, সত্যযুগের আরম্ভ উপলক্ষ্যে অক্ষয়তৃতীয়ার পালন এবং দশহরার দিনে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার মর্ত্যে আগমন ইত্যাদি নানান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন বাণীকুমারের কৃতিত্বের ফল।

বাণীকুমার প্রথম থেকে বুঝেছিলেন বেতারের প্রথম যুগের অবস্থা, মানুষের অবকাশ ও আগ্রহ কর্মব্যস্ততার যুগে এক থাকবে না। তাই তিনি প্রথম থেকে তাঁর অনুষ্ঠানকে খুব বেশি হলে দেড় থেকে ২ ঘণ্টার মধ্যে

সীমাবদ্ধ রাখতেন। শুধু তাই নয়, কিছু অনুষ্ঠান ৩০ মিনিটের মধ্যেও করতেন। বেতার-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ শব্দপ্রয়োগ, যন্ত্রসংগীত, ঘটনাভিত্তিক সংগীতপ্রয়োগ যথার্থভাবে ব্যবহার না করতে পারলে সেই অনুষ্ঠান মনোগ্রাহী রূপ নিতে পারবে না—এই বিশ্বাসে সমস্ত খুঁটিনাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল খুব বেশি। তাই তিনি তাঁর উদ্ভাবনীশক্তি ব্যবহার করে বেতারপ্রয়োগ পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংগঠিত করেন। এক কথায় বলা চলে, তিনিই হচ্ছেন রেডিয়ো টেকনিকের জন্মদাতা।

তিরিশ-চল্লিশের দশকে তিনি প্রাত্যহিক জীবনের ব্যাবহারিক জিনিসের উদ্ভাবন ও বিকাশ নিয়ে বেশ কয়েকটি ফিচার করেন, এগুলির মধ্যে রয়েছে ‘কাগজ’, ‘মুদ্রাযন্ত্র’, ‘টেলিফোন’, ‘টেলিগ্রাফ’, ‘অন্ধকারের নির্বাসন’ ইত্যাদি। সমাজসেবার ভিত্তিতে বাণীকুমার উপস্থাপন করেন বেশ কয়েকটি নাটক, যেমন —‘অন্ধজনে দেহ আলো’, ‘প্রাচীরের নীড়’, ‘অনাথ আশ্রম’, ‘মাতৃভবন’, ‘নষ্টন্যায়’ (যৌন রোগের কুফল ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সামাজিক প্রেক্ষাপটে আঁকা অসাধারণ নাটক)। সামাজিক নাটকের রচয়িতা হিসেবে তিনি লিখেছেন : ‘রিক্তা’, ‘সাগরের ডাক’, ‘সমস্যা’, ‘নাগকেশর’, ‘কবি-কঙ্ক’, ‘কীর্তিনাশা’, ‘প্রজাপতয়ে নমঃ’, ‘সিরাজমহিষী’, ‘শেষ রশ্মি’ প্রভৃতি। বেদ-উপনিষদের কাহিনি অবলম্বনে লিখেছেন, নচিকেতা, উমা হৈমবতী। তাঁর রচিত শর্বরী, দেবদত্তা, সুজাতা, লক্ষ্মীবাই, রাজিয়া আজও বিখ্যাত অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আর একটি দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল, সেটি হল শিল্পী তৈরি। সে-সময়ে শিল্পী বলতে ছিল যারা থিয়েটার করেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা বিশেষত মেয়েরা, কেউ অভিনয়কে বৃত্তি হিসেবে বেছে নিতেন না। বাণীকুমার এই বেড়াজাল ভাঙার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেন। গল্পদাদু-বিরচিত ‘উৎপলকুমারী ও চিত্র চন্ডাল’ কাহিনিটিকে বেতাররূপ দিয়ে পরিচালনা করেন বাণীকুমার। তিনি বাধাবিপত্তি ও নিষেধের প্রাচীর ভেঙে আহ্বান করে আনেন শ্রীমতী সুশীলা সেন মণিপুরী এবং শান্তা বসুকে। কিছু শিল্পীকে নিয়ে, তাঁদের মার্জিত উচ্চারণ এবং সংযত অভিনয়ের দিকে বাণীকুমার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর নির্বাচিত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধর ভট্টাচার্য, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বীরেন গুপ্ত, অনাদি দাশগুপ্ত, আশা সেনগুপ্ত, কল্পনা হাজরা, শান্তা বসু, বিপিন গুপ্ত, মৈত্রেয়ী দেবী, শোভনা ঠাকুর, উষা ভৌমিক, নীলিমা সান্যাল, জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ। কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বেলা মুখোপাধ্যায়, বিমলভূষণ, জগন্ময় মিত্র, রাধারানি, আভাবতী প্রমুখ। আর সুরকারদের মধ্যে প্রথমেই পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, অনিল বাগচি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, বিমলভূষণ প্রমুখ। এই শেষের তিন জনকে যখন বাণীকুমার সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তখন এঁরা কেউই শিল্পী হিসেবে তেমন প্রতিষ্ঠিত নন। বাণীকুমারের চিনতে ভুল হয়নি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তো সংগীত পরিচালক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাণীকুমারই তাঁকে প্রথম সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দেন। জগন্ময় মিত্রর ক্ষেত্রেও তাই। আর বিমলভূষণ যে সংগীত বিশারদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকার নয়।

১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসের মধ্যরাতে বাণীকুমার রচিত দেশাত্মবোধক কিছু গান বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান হয় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দর ১৫ অগাস্ট সকাল ৬-১৫ মিনিটে। কলকাতা বেতার কেন্দ্র ভারতের সর্বপ্রথম স্বাধীনতা দিবসে স্তোত্র পাঠ করে ‘উৎসব মালিকা’ নামে বাণীকুমার রচিত ও প্রযোজিত একটি সংগীত রূপকের মাধ্যমে। এর সংগীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। এবং গ্রন্থিক ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

শ্রীধর ভট্টাচার্য (আকাশবাণী কলকাতার বহু নাটকের প্রযোজক) বেতারে যোগদান করেন বাণীকুমারের সহকারী হিসেবে। বাণীকুমার যখন সপ্তাহে দু-তিনটি অনুষ্ঠান করতেন, তখন শ্রীধর ভট্টাচার্য স্ক্রিপ্ট কপি করে সাহায্য করতেন। বাণীকুমারের কাছ থেকে হাতেনাতে সব কাজ আয়ত্ত করে পরে রেডিয়োর নাট্য প্রযোজনায় মুনশিয়ানা দেখান। প্রথম প্রথম বাণীকুমারের অনেক নাটকে অভিনয় করতেন শ্রীধর। তিনি ছিলেন বাণীকুমারের এক ঘনিষ্ঠ সহচর।

বাণীকুমারের নাটকে সেকালে অভিনয় করেছেন আকাশবাণীর তৎকালীন প্রশাসক বিকাশ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বেতারের আদিযুগে বাণীকুমারের পরিকল্পনা ও প্রযোজনায় একটি অনুষ্ঠান হত যার নাম ছিল 'মুখর নগরী'। সেকালের কলকাতা শহরের বিভিন্ন সময়ের ধ্বনিচিত্র ফুটিয়ে তোলা হত এই অনুষ্ঠানে। ভোরে পাখির ডাক থেকে রাস্তায় জল দেওয়ার আওয়াজ, ধীরে ধীরে ট্রামের ঘণ্টি, হাঁকডাক—একটি নগরীর জেগে-ওঠা আবার দুপুরে ফেরিওয়ালার ডাক—সমস্ত শোনানো হত এই অনুষ্ঠানের সিরিজে। এইরকম নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাণীকুমার বেতার-অনুষ্ঠানের একটি সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরি করে দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান ঘোষণাতেও শুনেছি বিভিন্ন ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল—যেমন 'সুর সংযোজনা', 'বেতার রূপারোপ', 'প্রবর্তনা' 'সংগীত সর্জন' ইত্যাদি।

বাণীকুমার ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দর ১৫ অগাস্ট ঢাকুরিয়াস্থ মহারাজ ঠাকুর রোডের বাসগৃহে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। আমরা বাণীকুমারকে দেখেছি খুবই শান্ত এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। আকাশবাণীর ভবনের দোতলায় তখনকার নাট্যবিভাগে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যেত। আমাদের সঙ্গে তাঁর কোনো অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ হয়নি। একবার দেখা হয়েছিল ট্রামে। উনি ড্রাইভারের সামনে প্রথম সিটে বসেছিলেন। বললাম, বাণীদা! চিনতে পারলেন। হাসলেন। সামান্য দু-একটি কথাও বললেন। বেশি কথা বললেন না, বোধ হয় কানে ভালো শুনতে পেতেন না, তাই। আর দেখতাম মাইনের দিনে। ওঁকে এক টাকার দুটো বান্ডিল দিতেন ক্যাশিয়ার। উনি প্রত্যেকটি নোট একটা একটা করে গুনে নিয়ে চলে যেতেন।

বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বেতারের জন্য কী পরিশ্রম করেছেন, তা এখনকার কর্মীদের অনেকেরই অজানা। তাঁদের সৃজনশীল মনে রেডিয়োই ছিল ধ্যান-জ্ঞান। আকাশবাণীতে সম্প্রচারের একটা মজবুত ভিত গড়েছিলেন এঁরাই। কর্তৃপক্ষ তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিতে কিছুই করেননি। কিন্তু আকাশবাণীর চিরায়ত ইতিহাসে তাঁদের কেউ কখনোই মুছে ফেলতে পারবে না।

বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল এই মাস-মিডিয়াকে যথার্থ রূপ দিতে যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন, তার কোনো চিহ্নই বোধ হয় আজ আর নেই। অথচ থাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আজ পর্যন্ত তাঁদের মাপে কোনো ব্যক্তিত্ব কি কখনো দেখা গেছে বেতারে? বোধ হয় কোনোদিন দেখা যাবে না।

আমি মনে করি, আকাশবাণীর স্থপতি হিসেবে এঁদের নিয়ে কর্তৃপক্ষের নতুন করে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন। সম্প্রচারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের নাম জড়িয়ে দেওয়া খুবই দরকার। তাহলেই হয়তো বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তাঁদের বাঁচানো যাবে। সাংস্কৃতিক এই দুর্লভ অধ্যায়টিকে বাঁচিয়ে রাখা ইতিহাসের স্বার্থেই জরুরি। জানি না, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে ভাববেন কি না। তবে ভাবা উচিত।

---

১ বেতার জগৎ Vol-1, No. 19, 6th June 1930 Friday.

২ 'মহিষাসুরমর্দিনী' ; বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

৩ *The Amrita Bazar* Patrika dated 24.7.1927

৪ Ibid

৫ Hiren Basu—Memoris of versatile artispe, Akashvani, July 24-30, 1977,P.38

৬ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নাট্য সমালোচনা (১৯৪০-১৯৫০) বেতার জগৎ ২২ এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃ: ৩১৪। কলকাতা কেন্দ্রের নাট্য বিভাগ আয়োজিত শিশির মঞ্চে ৩১.১২.৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে পঠিত।

৭ বেতার নাটক শ্রোতার মন/সূর্যকুমার সরকার/পৃ: ১৯—২০

বেতারের ফেলে-আসা পাতা

১.

মঞ্চে অভিনয় করার কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাবপ্রকাশের সুযোগ পান। বেতারাভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কিন্তু সে-সুযোগ থাকে না। কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের সম্পদকে হাতিয়ার করে স্বরক্ষেপণের কৌশলের সাহায্য নিয়ে তাঁদের অভিনয় করে যেতে হয়। বলা বাহুল্য মাধ্যম হিসেবে মঞ্চাভিনয় থেকে বেতারাভিনয় ভিন্নতর।

ভানু চট্টোপাধ্যায় তাঁর কণ্ঠসম্পদের জন্য বেতার নাট্যশিল্পী হিসেবে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত নানা নাটকে অভিনয় করেছেন। শম্ভু মিত্র পুরোনো যুগ থেকে অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক হিসেবে বেতারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরিচালক হিসেবে তিনি যেমন তাঁর মঞ্চসফল নাটকগুলি (‘রক্তকরবী’, ‘রাজা’, ‘ডাকঘর’, ‘রাজা অয়দিপাউস’, ‘পুতুল খেলা’, ‘দশচক্র’) বেতারোপযোগী করে প্রচার করেছেন, তেমনি স্বতন্ত্রভাবে অভিনেতা হিসেবে বহু বেতারনাটকে অংশগ্রহণ করে তাঁর সম্মোহনী অভিনয় প্রতিভায় শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর অভিনয়ধারা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব এবং ঘরানার দিক থেকেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ম্যানারিজম থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ভঙ্গিতে অভিনয় করে নতুন মাত্রা এনেছেন অভিনয় পদ্ধতিতে। মনে পড়ে ‘সংশয়’ (কাহিনি—বিমল কর, নাট্যরূপ—অজিত বসু) নাটকে অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক ‘সুধাময়’-এর ভূমিকায় তাঁর ভিন্নধর্মী অভিনয়ের কথা। গিরিশচন্দ্রের ‘প্রফুল্ল’ নাটকে যোগেশ-এর ভূমিকায়ও তিনি ঐতিহ্যবিরোধী অভিনয় করেছিলেন। তাঁর ‘সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল’ সংলাপটি অনেকটাই আবেগহীন, শুষ্ক দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বোনা ছিল। শরৎচন্দ্রের ‘বিরাজ বউ’ নাটকে বিরাজের স্বামীর ভূমিকায় তাঁর সংযমী অভিনয়ও ছিল প্রথাসিদ্ধ অভিনয় ধারার ওপর প্রবল এক ধাক্কা। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ (নাটক—বাদল সরকার) নাটকে লিরিক্যাল অভিনয়ে তিনি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন, বেতার নাটকের ইতিহাসে তা এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। বস্তুত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই মহান শিল্পীর অভিনয় বেতারের অভিনয়ধারায় এক সুস্পষ্ট বাঁক এবং আধুনিকতার সূচনা করেছিল।

তৃপ্তি মিত্রও ‘বহুরূপী’-র প্রযোজনা ছাড়া স্বতন্ত্রভাবেও অসংখ্য চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ‘সরীসৃপ’ নাটকে তাঁর অভিনয় আজও কানে বাজে। অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় বেতারের প্রায় নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। তাঁর অভিনয়ধারায় স্বতন্ত্র এক বিশেষ স্বাদ ছিল। বিশেষ করে মনে পড়ে ঋত্বিক ঘটক প্রযোজিত বেতারনাটক ‘জ্বালা’য় তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের কথা। এ ছাড়া ভুলতে পারা যায় না, ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ (কাহিনি—কালকূট, প্রযোজনা—বিনতা রায়) নাটকে এক খোঁড়া ভিখিরির চরিত্রে তাঁর দুর্ধর্ষ অভিনয়।

উৎপল দত্ত প্রথমদিকে করেছিলেন শেক্সপিয়রের ‘ওথেলো’, পরবর্তীকালে ‘পি.এল.টি.’-ব্যানারে ‘টিনের তলোয়ার’, ‘অচলায়তন’ ও ‘মালিনী’। অসামান্য প্রযোজনা হিসেবে এগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় ঘোষক ছিলেন—যেমন ঘোষক হিসেবে একসময়ে বেতারে কাজ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। হারাধন বেতারের পুরোনো যুগ থেকে বহু নাটকে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তাঁর অপূর্ব কণ্ঠ মাইক্রোফোন-নাটকের খুবই উপযোগী ছিল।

সবিতাব্রত দত্তও বেতারে কিছু কিছু প্রযোজনা করেছেন তাঁর নাট্যসংস্থা ‘রূপকার’-এর পক্ষে। তাঁর প্রযোজিত নাটকের মধ্যে অমৃতলাল বসুর ‘ব্যাপিকা বিদায়’ বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আকাশবাণীর নিজস্ব শিল্পীদের মধ্যে প্রথম যুগ থেকে অসংখ্য চরিত্রে অভিনয় করে অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় রাখেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এ ছাড়া, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীধর ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনতা রায় বেতারে অনেক নাটকে অতুলনীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। মঞ্জু দে, বনানী চৌধুরীও অভিনয় করতেন নায়িকা চরিত্রে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'চাণক্য' চরিত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ষাটের দশকে তিনি নেতাজিকে নিয়ে নাট্য প্রযোজনা করেন এবং এতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীধর ভট্টাচার্যের কণ্ঠে একটু বুড়োটে ভাব ছিল, কিন্তু অভিনেতা হিসেবে তিনি কম ছিলেন না। বিশেষ করে মনে পড়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনি অবলম্বনে 'নিরুদ্দেশ' নাটকে গোমস্তার রোলে তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় এবং 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' নাটকে রাইচরণের ভূমিকা।

প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় আকাশবাণীতে যোগদান করেন 'ড্রামা ভয়েস' হিসেবে।

মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণীতে তবলাবাদক ছিলেন। পরে অভিনেতা হিসেবেও সুখ্যাত হয়ে ওঠেন। 'নিরুদ্দেশ' নাটকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পিতার ভূমিকায় তাঁর জীবন্ত অভিনয়ের কথা মনে হয় কেউ কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। এ ছাড়া 'পুরোহিত' নাটকে তিনি করেছিলেন মাতালের ভূমিকা। প্রসঙ্গত বলা যায় 'নিরুদ্দেশ' নাটকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের ভূমিকায় সপ্রতিভ অভিনয় করেছিলেন আকাশবাণীর ঘোষক দিলীপ ঘোষ।

মহিলা-শিল্পীদের মধ্যে বেতারে সরযূবালা করেছিলেন 'সাজাহান'-এ 'জাহানারা'। রাজলক্ষ্মী দেবী ছিলেন 'তটিনীর বিচার' নাটকে। সবিতা বসু, শিপ্রা মিত্র, নীলিমা সান্যাল, নীলিমা দাস, কণিকা মজুমদার প্রথম যুগের অনেক নাটকে নায়িকার রোলে নামতেন। এ ছাড়া নায়িকার ভূমিকা করতেন তপতী ঘোষ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, সুমিতা সান্যাল প্রমুখ। সেকালে বাইরে থেকে প্রযোজনা করতে আসতেন সলিল সেন, প্রফুল্ল রায় এবং নির্ভয় বসু।

বেতারনাট্যকার হিসেবে আকাশবাণীতে এসেছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুশীল মুখোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত ও মহেন্দ্র গুপ্ত।

১৯৫২-র পরবর্তীকালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রচার প্রযোজক (Publicity Producer) হিসেবে বেতারে যোগদান করেন যশস্বী নাট্যকার মন্মথ রায়। তিনিও প্রচারমূলক অনেক নাট্যানুষ্ঠান করেছেন। এঁদের পরবর্তীকালে নাট্য প্রযোজনায় আসেন জয়ন্ত চৌধুরী, জগন্নাথ বসু, অজিত মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, সমরেশ ঘোষ, সূর্য সরকার ও বর্তমান লেখক। ১৯৬৭-১৯৬৮-তে নাট্য বিভাগে অফিসার হয়ে আসেন সুনীল মিত্র। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় বেতারনাটক বক্তব্যে, আঙ্গিকে, প্রযোজনার কুশলতায় আধুনিক হয়ে ওঠে এবং বেতারনাটকে এক নতুন আস্বাদের সূচনা করে। সুনীল মিত্র যেমন অভিনেতা ও নাট্যকার বাদল সরকারকে আহ্বান জানান, তেমনি আহ্বান জানান সুপরিচিত গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে তাঁদের মঞ্চখ্যাত নাটকগুলি বেতারোপযোগী করে প্রচার করার জন্যে। এই সূত্রেই 'নান্দীকার' করেন 'আন্তিগোনে', 'নটী বিনোদিনী', 'তিন পয়সার পালা', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'শের আফগান', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'। থিয়েটার ওয়ার্কশপ করেন 'চাক ভাঙা মধু', নাট্যায়ন 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন', গান্ধার করেন বুদ্ধদেব বসুর 'পুনর্মিলন', 'নক্ষত্র' করেন 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'মৃত্যুসংবাদ', 'গন্ধরাজের হাততালি' সুকুমার রায়ের 'লম্বকর্ণ পালা', এবং বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। এ ছাড়া 'চেতনা' করেছিলেন 'মারীচ সংবাদ', 'অনুভব' 'শনিবারের বিকেল', পি.এল.টি 'টিনের তলোয়ার' এবং বহুরূপী করেছিলেন 'রাজা', 'রাজা অয়দিপাউস', 'ছেঁড়া তার' প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ষাটের দশকে এই সময়ের একটি অসাধারণ প্রযোজনা রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতা 'প্রোফিরিয়াস লাভার' অবলম্বনে 'বিপন্ন উপগুপ্ত'। অজিত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত এ নাটকে উচ্চাঙ্গের অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন শংকর ঘোষ ও সান্ত্বনা বসু।

বস্তুত এই সময় থেকে ১৯৭৩-১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রযোজিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’, বাদল সরকারের ‘কবি কাহিনি’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’, ‘রাম-শ্যাম-যদু’, বিমল করের কাহিনি অবলম্বনে শম্ভু মিত্র অভিনীত ‘ঘাতক’, সত্যজিৎ রায়ের ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-র বেতাররূপ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সওদাগরের নৌকা’। এবং এর ফলেই বাংলা নাট্যআন্দোলনের অনেকটা প্রতিফলন ঘটেছিল বেতারে। পরবর্তীকালের নাট্যপ্রযোজকরা এইসব নাট্যপ্রযোজনা থেকেই অনেকটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, একথা নির্দ্বিধায়ই বলা যেতে পারে।

বস্তুত বাণীকুমার প্রযোজিত ‘বেতার বিচিত্রা’ থেকেই পরবর্তীকালে আকাশবাণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছোটো ছোটো ফিচার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এরপর থেকেই গড়ে ওঠে বেতারের জন্য বৈচিত্রপূর্ণ অনুষ্ঠান। জন্ম নেয় ‘বিচিত্রা’, ‘বিচিত্রিতা’, ‘পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গ’, ‘সংবাদ বিচিত্রা’, ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ প্রভৃতি। ১৯৬৮ সাল থেকে আমি প্রায় নিয়মিত সংবাদ পাঠ, ‘সমীক্ষা’, ‘সংবাদ-পরিক্রমা’ পাঠ করি এবং ‘সংবাদ বিচিত্রা’র গ্রন্থিক হিসেবে কাজ করি। এই সময়ে আমি ‘বিচিত্রা’ অনুষ্ঠানও প্রযোজনা করার সুযোগ পাই। অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে বেশ কিছুকাল ‘পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গ’ও প্রযোজনা করি। এ ছাড়া ‘মজদুরমন্ডলী’ এবং অন্যান্য রূপকানুষ্ঠানে বিভিন্ন ছোটো ছোটো চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাই। আমার নাট্য পরিচালনার সূত্রপাতও এই সময় থেকেই। বিধানসভা পর্যালোচনার কয়েকটি অনুষ্ঠান প্রচারের সুযোগও পাই। পড়ি মফস্সলের চিঠি। পাশাপাশি ছোটো ছোটো নাটকে অভিনয়ের মারফত নাট্যাভিনয়েও আমার অভিজ্ঞতা হতে থাকে। ক্রমশ বেতারনাটক লেখাতেও আমার যোগ্যতা স্বীকৃত হয়। এ ছাড়া নির্বাচনের সময় বিশেষভাবে আমাকে সংবাদ বিভাগে পুরোপুরি নিয়ে নেওয়া হয়। ‘বিচিত্রিতা’ অনুষ্ঠানে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আমিএকে-একে প্রযোজনা করি ‘তিমির মৃত্যুর কবি জীবনানন্দ’, ‘স্বদেশি বাগানে বিদেশি ফুল’, ‘চলতি থিয়েটারের গান’, ‘বেতারনাটকের স্মরণীয় মুহূর্ত’, ‘ফিরে দেখা’, ‘সূর্য গেল অস্তাচলে’ (নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রয়াণ উপলক্ষ্যে রচিত) ‘বেতারের ফেলে-আসা পাতা’, ‘গাজনের গান’, ‘বাংলাদেশের গান’, ‘সাম্প্রতিক অপেশাদার নাট্য-আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি’, এবং ১৯৭৬-এ অগাস্ট-এ ‘মহিলামহল’ প্রযোজনা করি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শন নিয়ে একটি নিরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান ‘রুদ্ধগৃহ’। এতে সংগীত পরিচালক হিসেবে ছিলেন অলোকনাথ দে।

৪ মার্চ ১৯৭৩ রাত সাড়ে ন-টায় কলকাতা ক-এ আমি প্রযোজনা করি তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী আই. কে. গুজরালের কোচবিহার সফর নিয়ে রচিত একটি রেডিয়ো-রিপোর্ট।

২৬ নভেম্বর ১৯৭৩ রাত ৯টায় কলকাতা ক-এ বেতারস্থ হয় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারি মি. লিওনিড ব্রেজনেভের সফর উপলক্ষ্যে সোভিয়েত ল্যাণ্ড-এর লোকগীতির একটি অনুষ্ঠান। এতে গ্রন্থনাংশ পাঠের দায়িত্ব ছিল আমার।

১৪ জুলাই ১৯৭৩ রাত ৮টায় কলকাতা ক-এ ‘বিচিত্রা’-র নিবেদিত হয় আমার প্রযোজিত অনুষ্ঠান ‘আবৃত্তিশিল্প’। এটি ছিল আবৃত্তি নিয়ে বেতারের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির প্রশংসা করেছিলেন শম্ভু মিত্র। অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচারিত হয় ১৭ জুলাই সকাল ৯-৩০ মিনিটে কবি বিষ্ণু দে-র অনুরোধে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ কলকাতা ক-এ বিচিত্রানুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় আমার প্রযোজিত নাটক ‘যুগের দাবি’। শ্রীবিদ্যুৎ-এর লেখা এই নাটকে সংগীত পরিচালনা করেন সুহাস চৌধুরী।

১৯৭৪-এর ৭ মে দুপুর ২টোয় কলকাতা ক-এ আমার প্রযোজিত ‘সংলাপ আবৃত্তি’তে শোনানো হয় বিভিন্ন নাটকে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, সরযূবালা, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত ও শোভা সেনের অভিনয়াংশ। ২৬ মিনিট সময়সীমার এই অনুষ্ঠানটি সেকালে শ্রোতাদের বিপুল প্রশংসাধন্য হয়।

১৮ জুন ১৯৭৪ দুপুর ২টোয় কলকাতা ক-এ সম্প্রচারিত হয়, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রযোজিত অনুষ্ঠান ‘বাংলা নাটকের গান’। এতে গ্রন্থনা করেছিলাম আমি।

৩০ জানুয়ারি ১৯৮৭ রাত ৯-৩০ মিনিটে কলকাতা ক-এ নিবেদিত হয় রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা নিয়ে আমার রচিত ও প্রযোজিত অনুষ্ঠান ‘দুঃখরাতের রাজা’। এতে কন্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন চিত্রলেখা চৌধুরী ও অর্ঘ্য সেন। গ্রন্থনায় ছিলেন গৌরী ঘোষ ও শংকর ঘোষ। সংগীত পরিচালক ছিলেন অলোকনাথ দে।

২২ জানুয়ারি ১৯৮৮ রাত ১০-২০ মিনিটে বিবিধ ভারতী প্রচার তরঙ্গে বেতারস্থ হয় আমার একটি গবেষণাধর্মী সংগীতালেখ্য ‘মহাসরস্বতী’। এতে কন্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন অজয় চক্রবর্তী ও অনসূয়া মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থনাংশ পাঠে ছিলেন শংকর ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন অলোকনাথ দে। সম্পাদনা—রঞ্জন মিত্র। এই অনুষ্ঠানটিও বিপুলভাবে শ্রোতাদের প্রশংসাধন্য হয়। পরবর্তীকালে সংগীত পরিচালক অলোকনাথ দে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এটি বেতারে তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট রাত ৮টায় বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রে বেতারস্থ হয় কলকাতা ৩০০ উপলক্ষ্যে রচিত ‘কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা’। কলকাতা নিয়ে রচিত কবিতার ঐতিহ্য বিষয়ে রূপকানুষ্ঠানটির রচয়িতা, গ্রন্থিক ও প্রযোজক ছিলেন বর্তমান লেখক।

৩ অক্টোবর ১৯৮৯ রাত ৯-৩০ মিনিটে কলকাতা ক-এ নিবেদিত হয় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘শিল্পাদিত্য শিশিরকুমার’ ১ম পর্ব ‘অভিজ্ঞান’ অনুষ্ঠানে। এর ২য় পর্ব প্রচারিত হয় ‘অভিজ্ঞান’-এ ১০ অক্টোবর রাত ৯-৩০ মিনিটে। গবেষণা ও প্রযোজনা—অজিত বসু। গ্রন্থনা—গৌরী ঘোষ ও সম্পাদনা—রঞ্জন মিত্র। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে নিয়ে ৩য় অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় বিবিধ ভারতী প্রচার তরঙ্গে। এর শিরোনাম ছিল ‘বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবাদপুরুষ শিশিরকুমার’। এর গ্রন্থিক, ভাষ্যরচয়িতা ও প্রযোজক ছিলেন বর্তমান লেখক।

৯ মে ১৯৯০ রাত ৮টায় বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নিবেদিত হয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা কবিতার একটি অনুষ্ঠান ‘সেই স্পর্শ, সেই প্রদক্ষিণ’। এতে কবিতা পাঠ করেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কৃষ্ণ ধর, দীপেন রায় ও বর্তমান লেখক। ভাষ্যপাঠে ছিলেন গৌরী ঘোষ। বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র কবিতার পাঠে কন্ঠদান করেন গৌরী ঘোষ এবং শম্ভু মিত্র (গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে)। এই অনুষ্ঠানটি ১৩ মে, ১৯৯০-এর ‘স্টেটসম্যান’ এবং ১২ মে, ১৯৯০ ‘বসুমতী’তে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ রাত সাড়ে ৯টায় কলকাতা ক-এ ‘অভিজ্ঞান’ অনুষ্ঠানে বেতারস্থ হয় ‘উৎস উত্তরের হাওয়া’। কবিতার এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তিতে ছিলেন গৌরী ঘোষ ও অমিয় চট্টোপাধ্যায়। ভাষ্যরচনা, গ্রন্থনা ও প্রযোজনা অজিত বসু।

২৩ জানুয়ারি দুপুর ১-৫০ মিনিটে কলকাতা ক-এ ‘সংকলিতা’ অনুষ্ঠানে বর্তমান লেখকের নিবেদন ছিল ‘রবীন্দ্র নাটকের গান’। ১৯৯৪-এর ১৯ মার্চ, কলকাতা কেন্দ্রের স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েন বর্তমান লেখক। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ রাত ৯টায় কলকাতা ক-এ ছিল বর্তমান লেখকের কবিতা পাঠ।

২০ জুলাই ১৯৯৭ বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা এফ. এম. প্রচার তরঙ্গে ‘লিটল ম্যাগাজিন’ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে আহ্বান জানানো হয় বর্তমান লেখককে।

১৯৯৭-এর ১ অক্টোবর বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রে সকাল ৯-১৫ মিনিটে নিবেদিত হয় নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে নিয়ে ‘কথাকলি’ (টক-শো) অনুষ্ঠান। নিবেদন করেন বর্তমান লেখক। ৮ অক্টোবর ১৯৯৭ বিবিধ ভারতীর টক-শো ‘কথাকলি’ অনুষ্ঠানে ছিল শম্ভু মিত্রকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান। নিবেদনে বর্তমান লেখক।

১৯৯৭-এর ১৫ অক্টোবর সকাল ৯-১৫ মিনিটে বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ টক-শোর (কথাকলি) আয়োজন করা হয়। সকাল ৯-১৫ মিনিট থেকে এই অনুষ্ঠানটি চলে

বেলা ১২টা পর্যন্ত। সরাসরি (Live) প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী, কুমকুম দে, হেনা খান্না, দেবাশিস বসু, পার্থ ঘোষ, শংকর ঘোষ, অরুণাংশু বিশ্বাস ও বর্তমান লেখক। অনুষ্ঠানটিতে শোনানো হয় বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রের পুরোনো দিনের অনুষ্ঠান এবং তার পরিবর্তন, স্টুডিয়োতে সংগীত রেকর্ডিং-এর অংশবিশেষ, পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 'স্ত্রীর পত্র' ছায়াছবির নির্বাচিত অংশের সাউণ্ডট্র্যাক, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শম্ভু মিত্রর আবৃত্তি। পুরোনো ও নতুন দিনের শ্রোতারা এই কেন্দ্রের সম্প্রচার সম্পর্কে বিবিধ পরিবর্তন সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পারেন এই টক-শো থেকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান লেখক। সম্প্রতি কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে উদ্যাপিত হল দিল্লিতে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিবিধ ভারতী কেন্দ্র উদ্বোধন থেকে অর্ধশতাব্দী পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান। এতে বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রের এক বিজ্ঞাপক সংস্থা 'Living Sound'-এর প্রযোজিকা শ্রীমতী শ্রাবন্তী মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা বিবিধ ভারতী কেন্দ্রের উদ্বোধনের পর এই বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ঘোষক-ঘোষিকাদের মধ্যে ছিলেন কুমকুম দে, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ লাহিড়ী, বিমল মান্না, ক্ষৌণীশ বাগচি, হেনা খান্না, দিলীপ দত্ত এবং ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে বর্তমান লেখক। বিভিন্ন সময়ে এই বিভাগের অফিসারদের মধ্যে ছিলেন স্টেশন ডিরেক্টর মীরা মজুমদার, সুদেব বসু, শরৎ বিশ্বাস, এস. কে. গাঙ্গুলি, প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার বিশ্বাস, অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী, বাসুদেব বসু, স্বপ্না মন্ডল, অমল মন্ডল প্রমুখ। একসময় প্রতি শনি ও রবিবার বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্র ভরপুর থাকত বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত অনুষ্ঠানে। উদয় বসু, কৌশিক ভদ্র, বরুণ দাশ, শ্রাবন্তী মজুমদার প্রমুখ অনেক বিজ্ঞাপনদাতা নিয়মিত অনুষ্ঠান করতেন এই সময়ে। এইসব ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তাও ছিল খুব। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপনের রেট বেড়ে যাওয়ায় অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতাই দূরদর্শনে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠার দরুন বিবিধ ভারতীতে বিজ্ঞাপকদের আকর্ষণ কমতে থাকে। বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্র ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'মনের মতো গান', 'বর্ণালী', 'প্রভাতী' ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মধ্যে দিয়ে। এতে ছোটো ছোটো অল্প সময়সীমার বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যাপারে বিজ্ঞাপক সংস্থাগুলি আগ্রহান্বিত হতে থাকেন। এবং সীমিত সুযোগের সদব্যবহার করে বিবিধ ভারতীতে প্রচার হতে শুরু করে নাটক, রূপকানুষ্ঠান। কলকাতা ক-এর 'সবিনয় নিবেদন'-এর মতো বিবিধ ভারতীতেও প্রচারিত হতে থাকে শ্রোতাদের চিঠির উত্তরের আসর 'পত্রলেখা'। এই 'পত্রলেখা'য় চিঠির উত্তর দিতেন 'পত্রবন্ধু', সঙ্গে থাকতেন 'পত্রবান্ধবী'। 'পত্রলেখা' অনুষ্ঠানটি একসময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ক্ষৌণীশ বাগচি ও আইভি রাহার চমকপ্রদ পরিবেশনায়। বর্তমান লেখকও ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই 'পত্রলেখা' অনুষ্ঠানে 'পত্রবন্ধু' হিসেবে শ্রোতাদের চিঠির উত্তর দিয়েছেন। এ অনুষ্ঠানও শ্রোতাদের বিশেষ সমাদর পায়। পরে অরুণাংশু বিশ্বাস, দেবাশিস বসু ও বরুণ দাশও 'পত্রবন্ধু' হিসেবে অনুষ্ঠানটির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৭ সন্ধে ৬-১৫ মিনিটে আয়োজন করা হয় 'পত্রলেখা' অনুষ্ঠানের 'পত্রবন্ধু ও পত্রবান্ধবী'দের একটি সম্মেলন। এতে 'পত্রবন্ধু এবং পত্রবান্ধবী'রা স্মৃতিচারণ করেন তাঁদের অনুষ্ঠানের। ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৭ বিকেল তিনটেয় বেতারস্থ হয় বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রের সূচনায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্বাচিত অংশ। ওই একই দিনে রাত ১০-৩০ মিনিটে শোনানো হয় কলকাতা বিবিধ ভারতী কেন্দ্রে সম্প্রচারিত বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানের নির্বাচিত অংশ। এই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান লেখক। ২২ অক্টোবর, ১৯৯৭ সকাল ৯-১৫ মিনিটে 'কথাকলি' (টক-শো) অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদের জীবন ও তাঁর গান নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বেতারস্থ হয়।

২৯ অক্টোবর ১৯৯৭ 'কথাকলি'তে পরিবেশিত হয় বর্তমান লেখকের প্রযোজিত অনুষ্ঠান 'স্মৃতির স্পন্দন'। এতে পুরোনো দিনের সংগীতশিল্পীদের গানের নির্বাচিত অংশ নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয় বাংলা

সংগীতের ঐতিহ্য। ‘মুখোমুখি’ অনুষ্ঠান ১৯৯৯-এর ১৭ জুলাই রাত ৮টায় কলকাতা ক-এ সম্প্রচারিত হয় বিশিষ্ট অঙ্কনশিল্পী চারু খানের একটি সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন বর্তমান লেখক।

‘রজনীকান্ত সেন : তাঁর গান, তাঁর অর্চনা’ শিরোনামে সুনীলময় ঘোষ রচিত একটি অনুষ্ঠান নিবেদিত হয় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দে রাত ৮-৪৫ মিনিটে বিবিধ ভারতী প্রচার তরঙ্গে। এর ভাষ্যবিন্যাস ও প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান লেখক। ২৫মে ২০০১ রাত ৯টায় কলকাতা ক-এ ‘শ্রবণী’তে সম্প্রচারিত হয় অজিত বসু স্বরচিত কবিতা পাঠ। ৩ নভেম্বর ২০০১ রাত ৮-২০ মিনিটে কলকাতা ক-এ ‘শারদ-সাহিত্য পর্যালোচনা’ করেন বর্তমান লেখক।

২০০২-এর ২৫ জানুয়ারি রাত ১০টায় কলকাতা ক-এ সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলনে আমি বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করি প্রফেসর হরভজন সিং-এর কবিতা ‘Quest of a lori’। ২০০৬-এর ৩ নভেম্বর রাত ৭-৩০ মিনিটে কলকাতা ক-এ ‘সমীক্ষা’-য় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর প্রয়াণদিবস উপলক্ষ্যে বেতার সম্প্রচারে তাঁর অতুলনীয় অবদান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন নিবেদন করেন বর্তমান লেখক।

২০০৮-এর ১৫ এপ্রিল বিবিধ ভারতী কলকাতা কেন্দ্রে এক সাক্ষাৎকারে বিবিধ ভারতীর সম্প্রচার সম্পর্কে আমার স্মৃতিচারণ বেতারস্থ হয়। সাক্ষাৎকার নেন রত্নাবলী সাহা। ২০০৮-এর ২০ জুন রাত ৮-টায় কলকাতা ক-এ সম্প্রচারিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমার নাট্যরূপায়িত ‘সতী’। প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন সিদ্ধান্ত মাইতি ও অজিত বসু।

২

১৯৬৬-র মার্চ, আমি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে যোগদান করি। অডিশন এবং ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্র-অধিকর্তা পি. সি. চট্টোপাধ্যায়, খ্যাতনামা সাহিত্যিক লীলা মজুমদার, কবি ও অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র, কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রোগ্রাম এগজিকিউটিভ সবিতাকুমার মিত্রমুস্তাফি প্রমুখ। কেন্দ্র-অধিকর্তা বললেন, তুমি কি জানো ঘোষকের কাজ খুবই pains-taking, প্রয়োজনে দিনের পর দিন ডিউটি করতে হতে পারে। জিজ্ঞেস করলেন, এরকম ডিউটিতে আমি সম্মত আছি কি না? আমি সম্মতি জানাতে বললেন, ডিউটিতে যোগ দিতে তোমার ক-দিনের নোটিশ চাই? বললাম, আপনারা চাইলে কালই জয়েন করতে পারি। কেন্দ্র-অধিকর্তা খুশি হয়ে বললেন, বেশ, এখন তুমি যেতে পারো। তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এল। কাজে যোগ দিলাম। বলতে গেলে তখনও ব্রডকাস্টিং-এর কিছুই জানি না। জয়েনিং-এর অফিসিয়াল ফরম্যালিটিস মিটে গেলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্টুডিয়োতে। দেখি, এলাহি ব্যাপার। তিন-তিনটি টেপ চালাবার মেশিন, দুটি টার্নটেবল গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাবার জন্য। তা ছাড়া রয়েছে ফেডার-বক্স। দেখে তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া—এইসব আমাকে একা চালাতে হবে? তার ওপর ঘোষণা? ভয়ে মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে। পারব তো? প্রথম প্রথম একটু-আধটু ভুল যে হয়নি, তা নয়। ফল্ট-কার্ড আসতে লাগল। ভাবলাম, চাকরি থাকবে তো? ঘোষণাও খুব যে ভালো হচ্ছে তা নয়। এইভাবে মনঃসংযোগ করতে করতে একসময় ব্যাপারটা শিখে ফেললাম। প্রথম থেকেই আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম, কারুর ঘোষণা পদ্ধতি অনুসরণ করব না, আমার ঘোষণা হবে একেবারে আমার নিজস্ব। তখন পরিষ্কার উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু নানান কারণে আমার ঘোষণা কর্মকর্তাদের তেমন ভালো লাগল না। তখনকার দিনে কেন্দ্র অধিকর্তা স্বয়ং এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা ঘোষকদের কণ্ঠ এবং ঘোষণা প্রতিদিন মনিটর করতেন। তাঁরা বললেন, আমার ঘোষণা যেন কেমন, প্রাণ নেই। প্রাণ আনতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কনফিডেন্স এল না। এরই মধ্যে ‘যুগান্তর’-এ বেরোল, ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরটি সুরেলা। একটু ভরসা পেলাম। কিন্তু ঘোষণা করে তেমন যেন জোর পাচ্ছিলাম না। এদিকে তখন সপ্তাহে সপ্তাহে পদস্থ অফিসাররা ঘোষক-ঘোষিকাদের নিয়ে মিটিং-এ বসতে লাগলেন। আমাদের মধ্যে তখন সত্য চৌধুরী ছিলেন। তিনি বললেন, ঘোষকদের মধ্যে কোনো একজনকে ঠিক করে দেওয়া হোক, তাকেই আমরা ফলো করব। অফিসার বললেন, না, তা করার কোনো দরকার নেই। সত্য চৌধুরী বললেন, তাহলে আমাদের ঘোষণায়

নিজস্ব চরিত্র অর্জন করতে দেওয়া হোক। সে-ব্যাপারটাও অফিসারদের মনঃপূত হল না। এদিকে সত্য চৌধুরী আমাদের শেখালেন, খেয়াল নয়, উচ্চারণ হবে 'খয়াল' (বড়ো 'খ')। আমরা, বিশেষত আমি 'খয়াল' বলতে লাগলাম। আর যায় কোথায়? কাগজে বেরিয়ে গেল সব হিন্দি করা হচ্ছে। আমাদের দায়িত্বভারপ্রাপ্ত অফিসার বললেন, 'খয়াল' বলার দরকার নেই, পরিষ্কার 'খেয়াল' বললেই হবে। সত্য চৌধুরী বললেন, আজ্ঞে আচ্ছা স্যার, কিন্তু তাহলে 'গোপিকা বসন্ত'-কে কী বলা হবে? গোপীর বসন্ত? বা মিয়া-কি টোড়িকে কী বলা হবে—মিয়ার টোড়ি? শুনে অফিসার আর পালাবার পথ পান না।

ফরমান জারি হল, দেশবন্দনা বলতে হবে, দেশোবন্দনা নয়। লোকোগীতি নয়, লোকগীতি। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমরা তেমনিই বলে যেতে লাগলাম।

এদিকে তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, কোনো নতুন ঘোষককে প্রথমেই কলকাতা ক-এ ঘোষণার সুযোগ দেওয়া হবে না, প্রথমে এক বছর তাঁরা তৎকালীন অবাণিজ্যিক বিবিধ ভারতী কেন্দ্রে অল্পস্বল্প ঘোষণা করে কনফিডেন্স অর্জন করবেন, তারপর তাঁদের কলকাতা ক, খ-এ ঘোষণার সুযোগ দেওয়া হবে। সেইমতো আমার ভাগ্যে জুটেছিল বিবিধ ভারতীর ডিউটি। টেপ বাজিয়ে বাজিয়ে একা একা বসে থেকে হাত-পায়ে খিল ধরে যাবার দাখিল। তবু স্টুডিয়োর বাইরে যাওয়া চলবে না—গেলেই চাকরি খতম। এমনই ডিউটি করতে করতে একটু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখি এক ভদ্রলোক আমায় ডাকছেন। উনি কেন আমায় ডাকবেন, ভেবে যখন আপনমনে এটা সেটা ভাবছি, উনি তখন কাছে এসে বললেন, তোমাকে বলছি। কী করছ ওখানে? টেপ চালাচ্ছি। ভদ্রলোক বললেন, গত কয়েক দিন ধরেই তো দেখছি, টেপ চালিয়ে যাচ্ছ। বলে স্বগতোক্তি করলেন, ছেলেটাকে মেরে ফেলবে দেখছি। বলে কিছুক্ষণ পরে একটা অর্ডার নিয়ে এসে বললেন, শোনো তুমি রোজ তিনটে থেকে চারটে 'পল্লিমঙ্গল' আসরে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করবে। ওই সময়টা তোমার প্রোগ্রাম চালাবার বিকল্প ব্যবস্থা করবে ডিউটি অফিসার—এই সেই অর্ডার। ভদ্রলোকের এই সহমর্মিতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দেখলাম, অর্ডার দেখে ডিউটি অফিসার দ্বিরুক্তি করলেন না। এবং নিয়মিতই বিকেল তিনটে থেকে চারটে আমি 'পল্লিমঙ্গল' আসরে অভিনয় করতে লাগলাম। পরে জেনেছিলাম, ভদ্রলোকের নাম মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ফর্সা, সুন্দর চেহারার এক মানুষ। শুনতাম, উনি সুন্দর তবলা বাজাতে পারতেন। আর অভিনয়ে তাঁর দক্ষতার পরিচয় তো সেকালের শ্রোতারা খুবই জানতেন। চলচ্চিত্রে রাজেন তরফদার পরিচালিত 'অন্তরীক্ষ'-তে উনি একটি প্রধান চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। সেকালের 'পল্লিমঙ্গল' আসরে উনি নিয়মিত অভিনয় করতেন। সেখানে কথায় কথায় উনি ম্যাকফারসন সাহেবের প্রসঙ্গ এনে আসর জমিয়ে দিতেন। আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য সত্য চৌধুরী আমার ঘোষণা নিয়ে নানা প্রশংসা করতেন। বলতেন, অন্যসব ঘোষকদের চেয়ে আমার ঘোষণা একটু অন্য ধরনের—দূর থেকেও স্পষ্ট এবং সাবলীল মনে হয়। এদিকে আমি যখন ঘোষণা সুন্দর করার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত, তখন একদিন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন, অজিত, তোমার ঘোষণা এত স্পষ্ট এবং নিখুঁত যে, শিল্পীরা খুব খুশি হয়। কেননা, শিল্পীর নাম আইটেম সব পরিষ্কার, ঝকঝকে। সত্য চৌধুরী বলতেন, ঘোষণার সময়ে কাশবেন না, গলা যেমন আছে, তেমনিই ঘোষণা করুন। অতিরিক্ত ভারী করবার চেষ্টা করবেন না, এতে ল্যারিংসের ওপর চাপ পড়ে, পরবর্তীকালে গলা কর্কশ হয়ে যায়। সত্যদা বলতেন, আপনার ঘোষণায় যে ক্ল্যারিটি আছে, তা অন্য অনেকের থেকে আলাদা, এটা বজায় রাখুন। আবার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুদের কেউ কেউ বলতেন, আপনার গলায় সব ক-টি ফ্রিকোয়েন্সি দারুণভাবে আছে। এসব শুনে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতাম। আবার এও মনে হত, ঘোষণার মাধুর্য যেন ঠিক ঠিক বজায় রাখতে পারছি না। মনে মনে চিন্তা করতাম আরও কী কী করা দরকার। ভাবতাম আর সেইমতো পরীক্ষানিরীক্ষা করতাম। দেখতাম, সুখ্যাত ঘোষকদের কেউ কেউ 'বজ্র' বলতে পারে না, বলে 'বজরো' আবার কেউ কেউ 'গল্পদাদুর আসর' বলতে পারে না, বলে, 'গল্পদায়ুর আসর'।

এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল। বিবিধ ভারতীতে ডিউটি করছি, হঠাৎ ফোন এল, আপনি এখুনি নিউজ রুমে চলে যান, আপনাকে স্থানীয় সংবাদ পড়তে হবে। নিউজ রুমে যেতে আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট ধরিয়ে দিয়ে বলা হল, ভালো করে পড়ে নিন। বার বার পড়লাম। তারপর ৭-৫০ মিনিটে স্থানীয় সংবাদ পড়লাম। পড়ার পর তৎকালীন নিউজ এডিটর দ্বীপেশচন্দ্র ভৌমিক বললেন, কোথায় ছিলেন এতদিন, খুব ভালো হয়েছে আপনার পড়া। ফোনে সেকালের সিনিয়র করেসপণ্ডেন্ট আর. সি. দে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। পরবর্তীকালে নিউজ রুমের প্রয়োজনমতো মাঝে মাঝেই খবর পড়তাম। সংবাদ পরিক্রমা পড়তাম। এদিকে 'সংবাদ বিচিত্রা'র গ্রন্থিক হিসাবে আমার তখন খুব নাম। নির্বাচনের সময়ে বা পুজোর সময়ে আমাকে পুরোপুরি নিউজ রুমে নিয়ে নেওয়া হতে লাগল। দ্বীপেশ ভৌমিক মহাশয় খবর পড়ার জন্য তিন জনের নাম পাঠালেন দিল্লিতে, তার মধ্যে আমার নামও পাঠানো হল। কিন্তু বাংলাদেশ চ্যানেল-এর জন্য তখন তিন জন সংবাদ পাঠক গৌতম বসু, তরুণ চক্রবর্তী ও বরুণ মজুমদারকে লং টার্ম কন্ট্রাক্টে নিয়োগ করা হল। এরাই আকাশবাণীর নিয়মিত সংবাদ পাঠক হয়ে গেলেন। বিভূতি দাস আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বললেন, দিল্লিতে সংবাদ পাঠক নেওয়া হবে, তুমি অ্যাপ্লাই করো, তোমার হয়ে যাবে। কিন্তু তখন আমার বাবার অসুস্থতার জন্য আমি দিল্লি যেতে পারলাম না। তা ছাড়া সংবাদ পাঠের প্রতি আমার তেমন আগ্রহও ছিল না। প্রকৃত অর্থে বিভূতি দাসের সংবাদ পাঠ আমার বিশেষভাবে ভালো লাগত। বিভূতিদা যখন খবর পড়তেন দেখতাম স্টুডিয়োটা থরথর করে কাঁপছে।

বাংলা সংবাদ আকাশবাণীর প্রথম যুগে পড়তেন রাজেন সেনগুপ্ত। পরে বিজন বোস সংবাদ পাঠে অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় রাখেন।

সংবাদ বিভাগে খুবই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে দেখতাম নির্মল সেনগুপ্ত, প্রণবেশ সেন, আর. সি. দে এবং আরও অনেককে। নির্মল সেনগুপ্তর সমীক্ষা পাঠ তখনকার সম্প্রচারের ইতিহাসে এক বিশেষ মাত্রা এনেছিল। পাশাপাশি প্রণবেশ সেন যে দ্রুতগতিতে টেলিপ্রিন্টারে আসা খবর অনুবাদ করতেন, তা ছিল দেখার মতো। তাঁর হাতের লেখা পড়তে অসুবিধে হত বলে সুন্দর হস্তাক্ষরের কাউকে কাউকে ওঁর কাছে ডিক্টেশন নেওয়ার ডাক পড়ত। আমিও দিনের পর দিন ওর ডিক্টেট করা স্ক্রিপ্ট লিখে দিয়েছি। অবশ্য পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের লেখাও ছিল খুবই সুন্দর। প্রণবেশ সেনের স্ক্রিপ্টের মধ্যে থাকত ভাবালুতা, এবং দেবদুলালের আবেগময় কণ্ঠে তা বোধ হয় বিশেষ প্রাণ পেত। ফলে প্রণবেশ-দেবদুলাল জুটি ক্রমশই শ্রোতার কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় মুজিব বলেছিলেন, দেবদুলালের কণ্ঠ দশ হাজার ডিভিশন সৈন্যের কাজ করেছিল। এই বলার পরেই দেবদুলালকে ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' খেতাব দেন। এর কিছুদিন পরে কেন্দ্র-অধিকর্তা দিলীপকুমার সেনগুপ্ত 'রেডিয়ো-কার্টুন' প্রযোজনা করে 'পদ্মশ্রী' পান। মনে পড়ে, বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় উপেন তরফদার অংশুমান রায়ের গাওয়া একটি গান (সম্ভবত গানটি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা) ও মুজিবের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে একটি অসামান্য 'সংবাদ বিচিত্রা' নির্মাণ করেন। অংশুমান রায়ের গানটি পরে HMV রেকর্ডে প্রকাশ করে। এই সংবাদ বিচিত্রার গ্রন্থিক ছিলাম আমি। আরও মনে পড়ে, আমরা, ঘোষকরা বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে সারা রাত জেগে জেনারেল ম্যানেক শ-র শত্রুপক্ষকে আত্মসমর্পণের আবেদন প্রচার করেছিলাম।

সংবাদ পাঠক হিসেবে নিউজ রুমের আরও দু-জনের কথা মনে পড়ে—তাঁরা হলেন দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদ পাঠক হিসেবে এঁরাও কম জনপ্রিয় ছিলেন না। দেবাংশু পরে ভয়েস অফ আমেরিকায় চলে যান এবং কয়েক বছর পরে কলকাতা দূরদর্শনে প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন, তারপর আবার ফিরে যান আমেরিকায়। দেবাংশু বেশিদিন বাঁচেননি, বলতে গেলে অকালেই প্রয়াত হন। পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় পল্লিমঙ্গল আসরে 'মঙ্গলময়' চরিত্রে দীর্ঘকাল অভিনয় করেছেন, তিনি ছিলেন কবি, আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কেচশিল্পী, বাটিকের কাজে পথিকৃৎ, সুখ্যাত ফোটোগ্রাফার, একসময় 'যুগান্তর'-এ তাঁর অনেক স্কেচ প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্র-অধিকর্তা, পি. সি. চট্টোপাধ্যায় তাঁকে কলকাতা

বেতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন ডেপুটি চিফ-প্রোডিউসার পদে নিয়োগ করার জন্য। কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রে তখন ডেপুটি চিফ প্রোডিউসার পোস্ট স্যাংসান না হওয়ায় পীযূষবাবুকে বলা হয় নিউজ রিডার পদে যোগদান করতে। এবং এই পদে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যান পীযূষবাবু। তিনিও হার্টের অসুখে বলতে গেলে অকালেই প্রয়াত হন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, অনেক পরে কলকাতা কেন্দ্রে ডেপুটি চিফ প্রোডিউসার হিসেবে নিযুক্ত হন পাশ্চাত্য সংগীত বিভাগের প্রধান বুলবুল সরকার। অসাধারণ কণ্ঠ ছিল বুলবুল সরকারের। 'কলিং অল চিলড্রেন' অনুষ্ঠানে তাঁর পরিচালনার কথা আজও বিশেষভাবে মনে পড়ে। অপূর্ব সুন্দর ব্যবহারের জন্য তিনি বেতারকর্মীদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্য সংগীত বিভাগে তখন স্থায়ী ঘোষক-ঘোষিকা ছিলেন বরুণ হালদার ও সাধনা দত্ত। বরুণের পরিবেশিত 'মিউজিক্যাল ব্যাণ্ড বক্স' এবং 'লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি' সেকালে মিথ হয়ে গিয়েছিল। বরুণ সেকালের দু-একটি ইংরেজি নাটক প্রযোজনা করেন। এবং 'শ্বেত ময়ূর' নামে একটি বাংলা নাটকে এক বিদেশির প্রধান চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেন। কিন্তু ইংরেজি নাটক শ্রোতার বিশেষ আনুকূল্য না পাওয়ার দরুন বন্ধ হয়ে যায়। আমি দেখেছি পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং কমল দাশগুপ্তকে বরুণের সঙ্গে 'মিউজিক্যাল ব্যাণ্ড বক্স' নিয়ে আলোচনা করতে। পরে বরুণ দিল্লিতে ইংরেজি সংবাদ পাঠক হন এবং ওই পোস্টে থেকেই দিল্লি থেকে অবসর নেন। বরুণ দিল্লিতে সংবাদ পাঠক হিসেবে যোগ দেবার আগে থেকে ইংরেজিতে খবর পড়ে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মেলফিল ডিমেলো, সুরজিৎ সেন প্রমুখ। বাংলায় সর্বভারতীয় খবর পড়ে শ্রোতাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ, অসিতভূষণ দাশ। কলকাতায় সংবাদ পাঠক হিসেবে এই সময়ে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন মিত্র, তরুণ চক্রবর্তী, বরুণ মজুমদার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বরুণ হালদার দিল্লিতে চলে যাবার পর এবং সাধনা দত্ত অবসর নিলে পাশ্চাত্য সংগীত বিভাগে ঘোষক হিসেবে আসেন ওয়াই. সি. গুপ্তা, রত্না সেন ও রঞ্জন মিত্র। এর মধ্যবর্তী সময়ে পাশ্চাত্য সংগীত বিভাগে ঘোষণা করতেন প্রেম পন্ডিত, ডিন গ্যাসপার, সারা সত্যনাথন, আইটা জৈন, শৈব্যা দত্ত, জিজাবাই ভট্টাচার্য, মিস চেকো প্রভৃতি অনিয়মিত ঘোষক-ঘোষিকারা। প্রসঙ্গত বলা যায় পাশ্চাত্য সংগীত বিভাগের ঘোষক ওয়াই. সি. গুপ্তা অকালে প্রয়াত হন। এই কালে ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী দিয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন বেরি সর্বাধিকারী ও পিয়ারসন সুরিটা। পরবর্তীকালে বাংলা ধারাবিবরণী প্রচার শুরু হলে অজয় বসু, কমল ভট্টাচার্য, পুষ্পেন সরকার প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলার জনমানসে ক্রিকেট একটি আপনার জিনিস হয়ে ওঠে। তখন সংগীতকারদের মধ্যে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ছিলেন অসংখ্য গুণী ব্যক্তি—গৌর গোস্বামী, মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খাঁ, শ্যামল বসু, অলোকনাথ দে, চন্দ্রকান্ত নন্দী, ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, সুরেন পাল, বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ বসু, ডমরুপাণি ভট্টাচার্য, আলি আহমেদ হুসেন, কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ, প্রিয়লাল চৌধুরী, শৈলেন দাস, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আগে মিউজিক সুপারভাইজার হিসাবে কাজ করেছেন দীপালি নাগ, বিজনবালা ঘোষদস্তিদার, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় অধিকারী প্রমুখ বিশিষ্ট সংগীতকাররা। পরে এই পদটি লোপ পায় এবং সংগীতকার কিছু কিছু ব্যক্তিকে রেকর্ডিং-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংগীত বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন বিমান ঘোষ। বস্তুত সংগীত বিভাগের নানা ব্যাপারে তাঁর অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে। বিমান ঘোষ অবসর নেবার আগেই আকাশবাণী ছেড়ে চলে যান এবং যোগ দেন HMV-তে। কিন্তু আকাশবাণীকে তিনি ভোলেননি। ভোলেননি আমাদেরও।

সংগীত-সংগতকারীরা মোটামুটি দুটি শিফটে কাজ করতেন—সকালে ও দুপুরে। রেকর্ডিং চলত রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত। আবার কখনো কখনো বিখ্যাত শিল্পীদের রেকর্ডিং হত। তা ছাড়া বেতারের বাইরে রবীন্দ্রসদন, হিন্দি হাইস্কুলে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হত 'রেডিয়ো সংগীত সম্মেলন' উপলক্ষ্যে। এতে ভারতবর্ষের গুণী শিল্পীদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা হত। এখনও এ ব্যবস্থা বহাল আছে। সংগীত বিভাগে আমার প্রযোজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল 'দুঃখরাতের রাজা'। এটি ন্যাশনাল

অ্যাওয়ার্ডের জন্য পাঠাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু জনৈক শিল্পীর গান কোথাও কোথাও একটু বেসুরো লাগার জন্য বিচারকরা এটিকে শেষপর্যন্ত বাতিল করেন। পরে অবশ্য বিবিধ ভারতীতে প্রযোজিত আমার একটি সংগীতালেখ্য 'মহাসরস্বতী' আকাশবাণী বার্ষিক প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়। কিন্তু সেবারও বড়ো কোনো স্টেশনকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা বাতিল হয়। এবং কলকাতা কেন্দ্রের পরিবর্তে পুরস্কৃত হয় খড়গপুর-এর একটি ছোটো বেতার কেন্দ্র।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে দেখতাম, সর্বক্ষণই সংগীত নিয়ে মাতোয়ারা। দোতলায় তাঁর ঘরে বসে আছেন, পাশে বসে আছে এক ছাত্র, জ্ঞানবাবু তাঁকে গান গেয়ে নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে বোঝাচ্ছেন। আবার হসপিটালে, গ্লকোমা অপারেশন হয়েছে, সেখানেও শুয়ে শুয়ে ট্রানজিস্টারে ক্লাসিক্যাল আইটেম শুনছেন। আমরা ছোটোরা, যারা তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নই, তাদেরও কত স্নেহ-প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা কোনোদিন ভুলব না। তাঁদের কাছে আমাদের সব কিছুই ভালো। অত বড়ো শিল্পী, আমাদের আহ্বানে অসুস্থ শরীরে এক সংগীতানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন। পরে তাঁকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছোবার ব্যবস্থা করে দেন আমাদের বন্ধু ও প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুশীল মল্লিক। এমনই স্নেহ পেয়েছিলাম, বীরেন ভদ্রর কাছ থেকেও। রবীন্দ্রসদনে আমি যখন 'স্ত্রীর পত্র' করি, তখন প্রথম সারির সিটে বসে বীরেনদার কী আহ্লাদ। পরে অবশ্য একান্তে তিনি আমাকে প্রযোজনা ও অভিনয়ের কিছু কিছু ত্রুটির কথা বলেছিলেন। আমাদের আগে বেতারে নাট্য প্রযোজনা করতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, হীরেন বসু, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল মুখোপাধ্যায়, সরল গুহ, বাণীকুমার, শ্রীধর ভট্টাচার্য, নির্ভয় বসু প্রমুখ। তখন বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে আকাশবাণীর নাটক ছিল জনপ্রিয়তম। প্রতি শুক্রবার রাত ৮টায় ঘরে ঘরে বাজত নাটক। শনি-রবিবারের বিকেল তিনটেয় আধঘণ্টা সময়সীমার নাটকও শ্রোতাদের খুবই প্রিয় ছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং অন্যান্যদের প্রযোজনার পরবর্তীকালে নাট্য প্রযোজনায় মুনশিয়ানা দেখান জয়ন্ত চৌধুরী। জয়ন্ত চৌধুরী যেমন জনপ্রিয় ঘোষক ছিলেন, তেমনি গল্পদাদুর আসরের পরিচালক হিসেবে অসাধারণ মানের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি 'সবিনয় নিবেদন' অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন। লীলা মজুমদার তাঁর 'আমার বেতারজীবনের সাত বছর' নামে একটি স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, 'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর জয়ন্ত চৌধুরী এই দুটি মানুষ যদি অন্য কোনো অগ্রসরবান দেশে জন্মাতেন, পৃথিবী-জোড়া নাম হত। দু-জনের পদ্ধতি দেখতাম আলাদা। বীরেনদার মধ্যে কতকগুলো ধ্রুপদী নিয়ম দেখতে পেতাম। জয়ন্ত একেবারে আধুনিক, যার চোখে নাটকে আর সত্যিকার জীবনের সংলাপে কোনো তফাত নেই। আমি ভাবতাম ধ্রুপদী বিষয়ে বীরেনদার জুড়ি নেই, সমসাময়িক নাটকে জয়ন্তর হাতের তুলনা হয় না।' প্রসঙ্গত বলা যায় সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এক বছরের মতো আকাশবাণীর নাট্যপ্রযোজক ছিলেন, আর প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন 'সাহিত্য-শলাহকার'। কিন্তু এঁরা সকলেই অভিযোগ করতেন প্রোগ্রামের ব্যাপারে বিশেষ কারুর সহযোগিতা পাননি। সেকালে রবিবার দুপুর ১টায় প্রবর্তন করা হয়েছিল 'রূপ ও রঙ্গ'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র একদিন স্টুডিয়োতে নাটকের এডিটিং করছেন, এই সময়ে স্টুডিয়োর দরজা খুলে আমি ঢুকে পড়ি। বীরেনদা বললেন, কী চাই? বললাম, আপনার এডিটিং পদ্ধতি দেখে শিখতে চাই। বললেন, বেশ, ওইখানে চেয়ারে বসো, একটা কথা বলবে না। দেখতে লাগলাম ওঁর এডিটিং। পরে একদিন ওঁর নাটকের রেকর্ডিং-এর সময়েও স্টুডিয়োতে ঢুকেছিলাম। উনি আপত্তি করেননি। বলেছিলেন, চুপ করে বসে দ্যাখো। কথা বলবে না। 'রূপ ও রঙ্গ'-তে ছোটো ছোটো নাটক ছাড়া বিশেষ আকর্ষণ ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্বকণ্ঠে 'বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট'। তারপর তো ওঁরই হাতে নাট্যাভিনয় শিখেছিলাম। কিন্তু প্রযোজনা করার সময়ে ওঁকে বিশেষ অনুসরণ করতাম না। নিজের মতো করতাম। এটা লক্ষ করে তিনি সকলকে বলতেন, ও আমার কাছে শিখেছে। কিন্তু আমায় ফলো করে না। নিজের মতো করে।

বস্তুত বীরেনদার আনুকূল্যেই আমি বেতারনাট্য প্রযোজনার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার আগে বেতারনাট্য প্রযোজনা শুরু করেন অজিত মুখোপাধ্যায়। তারপর নাট্যপ্রযোজক হিসেবে আসেন জগন্নাথ বসু। আমি ছাড়া

সেকালে নাট্যপ্রযোজনা করতেন নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষৌণীশ বাগচি এবং আরও অনেকে। কিন্তু নাট্যপ্রযোজনায় আমার নানা এক্সপেরিমেন্ট তখনকার শ্রোতাদের খুবই ভালো লাগত।

তখনকার দিনে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র অবসর নেবার পর নাট্য প্রযোজনায় যোগ্যতার পরিচয় রাখেন জগন্নাথ বসু, অজিত মুখোপাধ্যায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব বসু, সূর্য সরকার, নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষৌণীশ বাগচি, গীতা গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে।

এইসব প্রযোজকদের পাশাপাশি 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার পক্ষে নাট্যপরিচালনা করতেন শম্ভু মিত্র, পি. এল. টি.-র পক্ষ থেকে নাট্যপরিচালনা করতেন উৎপল দত্ত, 'নক্ষত্র' নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে শ্যামল ঘোষ, 'নান্দীকার'-এর পক্ষে অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়। তা ছাড়া স্বয়ং ঋত্বিক ঘটক প্রযোজনা করেন 'জ্বালা'। বাদল সরকারও ষাটের দশকে তাঁর 'অন্য ধারার' অজস্র নাটক পরিবেশন করেন কলকাতা বেতারে। এই সময়ে বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই নাটকের জন্য তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বেতারের প্রথম যুগ থেকেই একাই বহু নাট্যপ্রযোজনা করে বেতারনাট্য প্রযোজনায় এক অসাধারণ ইতিহাস গড়ে তোলেন। তাঁর উল্লেখ্য প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে 'কৃষ্ণকুমারী' (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), 'ঘরে বাইরে' (রবীন্দ্রনাথ), 'প্রলয়' (শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত), 'বিল্বমঙ্গল' (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), 'চিত্তচকোর', 'সাক্ষী' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত), 'তটিনীর বিচার' (শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত), 'কবি' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), 'সিরাজদৌল্লা' (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), 'শ্রীমধুসূদন' (বনফুল), 'রাজা রামমোহন' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), 'কালরাত্রি', 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আকাশবাণীতে নাট্যপ্রযোজনা শুরু করেন পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট' দিয়ে। পরে ১৯২৯-এ করেন শ্রীশচন্দ্র বসুর 'সন্দিগ্ধা' ; ১৯৩০-এ বেতারস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'রক্তকমল', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' ও 'দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহ', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'লাখ টাকা', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে', রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নরমেধযজ্ঞ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গনারী', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'উলুপী', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তোর মুক্তি', রায়বাহাদুর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রামানুজ', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং বাণীকুমারের 'কর্পূরমঞ্জরী'।

১৯৩১-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে রয়েছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস', রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ', ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'অশোক'।

১৯৩২-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রযোজনা করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান' এবং মন্মথ রায়ের 'মহুয়া'।

১৯৩৩-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রযোজনায় বেতারস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্বরচিত 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়', কনকলতা ঘোষের 'কবির জীবন', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', বাণীকুমারের 'জন্মাষ্টমী', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভীষ্ম', বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সুলতান', ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর 'বড়োবউ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান' (এতে 'দুলালচাঁদ' চরিত্রে অভিনয় করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ)। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বাসবদত্তা', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সরলা', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুন্ডলা'।

১৯৩৪-এ অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বেতারনাট্যায়িত 'মন্ত্রশক্তি', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর 'ঋষির মেয়ে', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা', প্রবোধকুমার মজুমদারের 'শুভযাত্রা', অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে (নাট্যরূপ : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) 'পোষ্যপুত্র', দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'মানিক-জোড়', বাণীকুমার রচিত 'মিলনপূর্ণিমা' ও 'রিক্তা', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'দশচক্র', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মহাযুদ্ধ', বাণীকুমারের 'মৃত্যুদূত' প্রযোজনা করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

১৯৩৬-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রযোজিত নাটকের মধ্যে রয়েছে : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সুদামা', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত, 'রত্নেশ্বরের মন্দির', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়দেব', দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'বাঁধিগৎ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্যলীলা', বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রচিত 'জীবনবীমা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয়া', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শংকরাচার্য', হরিপদ দে-র 'রত্নাকর', দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'কুহকী', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিটেকটিভ', রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাল পরিণয়', ড. সুকুমার দত্তর (নাট্যরূপ : প্রবোধকুমার সান্যাল) 'মল্লিকা', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শাঁখের করাত', ডি. এল. রায় রচিত 'সিংহল বিজয়', ড. বটকৃষ্ণ রায়ের 'মিলন উৎসব', মন্মথনাথ রায়ের 'খনা', রায়বাহাদুর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রাজাবাবু', গোবিন্দপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রুপোর ঝুমকো', বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'মীরাবাঈ', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'জননী', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'মন্দাকিনী', অখিল নিয়োগীর 'স্পর্শমণি' (পরশমণি), ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুলশর', শরৎচন্দ্র বোসের 'অভিজাত', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা', জ্যোতি বাচস্পতির 'নিবেদিতা', মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর', অনুরূপা দেবীর 'পথের সাথি' (নাট্যরূপ: যোগেশচন্দ্র চৌধুরী), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'কিন্নরী', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মতেজ', বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা' ও 'মিশরকুমারী', প্রবোধ মজুমদারের 'জন্মতিথি' এবং রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'।

১৯৩৭-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রযোজনা করেন : অবিনাশ গাঙ্গুলির 'ঝকমারি', ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'সতীতীর্থ', সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরমা' (এতে 'রাবণ' চরিত্রে রূপদান করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ), গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পান্ডবগৌরব', শ্রীশচন্দ্র বসুর 'পুন্ডরীক', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুমারী', প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণংকৃত্বা', শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রীতিমতো নাটক', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বরুণা', অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মগের মুলুক', বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'চিত্রাঙ্গদা', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কালের দাবি', তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'রামপ্রসাদ', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙালি', কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পরশুরাম', জলধরচট্টোপাধ্যায়ের 'শক্তির মন্ত্র', রমেশচন্দ্র গোস্বামীর 'কেদার রায়', ড. নগেন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'অভিষেক', তুলসীচরণ ঘোষের 'কালনেমি', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'চাঁদবিবি', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী', অমৃতলাল বসুর 'নবযৌবন', পরিমল গোস্বামীর 'লক্ষহিরা', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'রঘুবীর'।

১৯৩৮-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রযোজনা করেন : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বন্ধু', মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী', কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়-এর (নাট্যরূপ—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী) 'পতিব্রতা', যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাট্য রূপায়িত 'বাংলার মেয়ে', অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন', পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রহাস', মন্মথ রায় রচিত 'দেবাসুর', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'আবু হোসেন', দিবাকর মুখোপাধ্যায়ের 'রুক্মিণী হরণ', অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'ঠিকে ভুল', কামাখ্যা নিয়োগী রচিত 'বনেদি ছোঁয়াচ', বি-মজুমদারের 'বোধোদয়'।

১৯৩৯-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রযোজনা করেন প্রবোধচন্দ্র ঘোষ রচিত নাটক 'শুভযাত্রা'। নাটকটিতে প্রযোজক স্বয়ং অভিনয় করেন 'সুধাংশু' চরিত্রে।

১৯৪০-র ৩জানুয়ারি সম্প্রচারিত হয় 'তাজ'। পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বাণীকুমার। ৬ জানুয়ারি বেতারস্থ হয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রযোজিত নাটক 'জয়দেব'।

১৯৪৪-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ-র বেতার রূপায়িত ও প্রযোজিত নাটকের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রকাহিনি অবলম্বনে 'মাল্যদান'।

১৯৪৮-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রযোজনা করেন জরাসন্ধের কাহিনি অবলম্বনে 'ছায়াতীর'।তা ছাড়া বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রযোজিত আর একটি নাটক হল তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর কাহিনি অবলম্বনে 'কে ডাকে আমায়'। ১৯৪৮-এ প্রযোজিত আরও একটি নাটক হল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে 'অর্থম অনর্থম'।

১৯৬০-এ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রযোজনা করেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত নাটক 'তটিনীর বিচার'।

বেতারের প্রথমযুগে বেতার নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হত। একবার তো বীরেন্দ্রকৃষ্ণ 'ঝঞ্ঝা' (Storm in the station) বলে এমন একটি নাটক লিখে ফেললেন যেখানে নাটকটির এক-একটি চরিত্র কলকাতা বেতার স্টেশনের এক-একজন কর্মচারী।

আবার ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রযোজনা করেছিলেন সে-সময়কার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের দ্বারা বেতার মাধ্যমে একটি নাটিকার অভিনয়। অখিল নিয়োগীর (স্বপনবুড়ো) 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকে এইসময় অভিনয় করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সজনীকান্ত দাস, অমল হোম, প্রথমনাথ বিশী, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), নীলিমা সান্যাল, লয়লা খান ও বীণা রায়।

তখনকার বেতার কেন্দ্রের ভারতীয় প্রোগ্রামের ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার গড়ে তোলেন বেতার নাটুকে দল। এই নামটি দিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রনাথের-বন্ধু আশু দে। এই বেতার নাটুকে 'দল'-এ ছিলেন হীরেন বসু, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল দাস, শিবু রায়, সন্তোষ সিংহ, রঘুবীর রায়, মণি মজুমদার, ধীরেন দাস, বিশ্বনাথ ঘোষ, সুধীর মল্লিক, কমলকুমার ঘোষ, নির্মল বসু, ভোলা মিত্র, নব বন্দ্যোপাধ্যায়, মি. এস. ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, মিস নিভাননী, মিস উষাবতী, প্রফুল্লবালা, আভাবতী, আঙ্গুরবালা, সুধাবালা, পদ্মরানি, মিস রানিবালা, ইন্দুবালা, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, রঞ্জিত রায়, কামিনীবালা, প্রভাবতী, পান্নারানি, সরস্বতী, কানাইলাল ঘোষাল, কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ বসু, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রদাস মুখোপাধ্যায়, তুলসীচরণ পাল, প্রকাশমণি, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বলাইপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিবালা, তারাপদ চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী, মনোরমা, মিস লাইট, তুলসী লাহিড়ী, সুশীলাবালা, গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরযূবালা, নগেন্দ্রনাথ বসু, তারকবালা, ভূপেন নন্দী, বীণাপাণি, বিভূতিভূষণ মজুমদার, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, অমূল্যচরণ দেব, নলিনীকান্ত সরকার, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, বটকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নাময়ী, নারায়ণচন্দ্র নাথ, চারুশীলা, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নীহারবালা, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, গীতা, পুলিন অর্ণব, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন মুখোপাধ্যায়, উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মল্লিক, হরিমতি, জীবন মুখোপাধ্যায়, অনিল সিংহ, বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার প্রমুখ।

৩.

বাণীকুমার বেতারে যোগ দেন টাঁকশালের পাকা চাকরি ছেড়ে। পরে বাণীকুমারের পরিচালনায় বেতারস্থ হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহ'। এই প্রযোজনায় বাণীকুমার স্বরচিত কয়েকটি গান সংযোজন করলেন। পরে তিনি করলেন রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। দুটি নাটকই শ্রোতাদের ভালো লাগল। নলিনীকান্ত সরকার অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর রজতজয়ন্তীর সময়ে লিখেছিলেন :

> কয়েকটি ক্লাবের সদস্যরাও এলেন গান-বাজনা করতে। এইরূপ একটি ক্লাব 'চিত্রা সংসদ'। বেতারের নিয়মিত প্রোগ্রামের উন্নয়নের জন্য নৃপেনবাবু এই 'চিত্রা সংসদ'-এর কয়েক জনকে বেছে নিলেন। এই সদস্যরা হলেন একালের নাট্যপরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, 'সংগীত শিক্ষার আসর'-এর পঙ্কজকুমার মল্লিক 'বেতার বিচিত্রা'-র পরিচালক কবি বাণীকুমার ও বাংলা সংবাদ-ঘোষক বিজন বসু।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাণীকুমার কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যুক্ত হলেন।

৪.

প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় বেতারে গারস্টিন প্লেসে অভিনেতা হিসেবে এসেছিলেন ১৯৫৬ খ্রি.। তাঁর কণ্ঠ শুনে অনেকেই ছবি বিশ্বাস বলে ভুল করতেন। তাঁর প্রযোজিত অসংখ্য নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'তমসা' (সংগীতবহুল এ নাটকের সংগীত পরিচালক ছিলেন অনল চট্টোপাধ্যায়),

'তুষারঝড়' (ইংরেজি থেকে অনূদিত), 'সাগরের কত রং', 'কোনো নাম নেই' (নাট্যকার—রমেন গঙ্গোপাধ্যায়), 'নাম না জানা তারা' (রুমানিয়ার গল্প অবলম্বনে), 'কোথায় পাব তারে' (কালকূট), 'রাম শ্যাম যদু' (বাদল সরকার), 'আন্তিগোনে', 'অতসী মামি' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'কান পেতে রই' (গজেন্দ্রনাথ মিত্র), ও আলো-আঁধারি (কাহিনি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বেতারনাট্যরূপ—অজিত বসু)।

বাসুদেব বসু প্রযোজিত 'নেফা, সুন্দরী নেফা', 'নেফা তোমায় ভুলিনি' ইত্যাদি নাটক একসময় বেতারে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল। 'নেফা, সুন্দরী নেফা'-য় লুটিং ময়াং চরিত্রে আকর্ষণীয় অভিনয় করেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধারে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এবং দীর্ঘদিন ধরে বেতারনাটক প্রযোজনা করে নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নাটকে কলাকৌশলের চমৎকারিত্ব হয়তো কম, তবু গুণমুগ্ধ শ্রোতার সংখ্যা কম নয়। শুক্লা প্রযোজনা করেছেন : 'একটি প্রেমের গল্প', 'ইতি অনিন্দ্য', 'সাংবাদিক' (নাটক—অজিত মুখোপাধ্যায়), 'দ্রব্যগুণ', 'পন্ডিতমশাই' (শরৎচন্দ্র), 'জলতরঙ্গ', 'হঠাৎ গোধূলি', 'একটি পেরেকের কাহিনি', 'ভোরের ফুল', 'প্রতিবন্ধী', 'দেবদাসী সুতনুকা', 'সাপের ছোবল', 'সৈনিক', 'নয়ন', 'অলৌকিক আততায়ী', 'ভালো মা', 'রাজপুত্র', 'ছেলে বনাম জামাই', 'সিলভার জুবিলি', 'মুরগির ঝোল', 'পরিস্থিতি', 'অগত্যা', 'আঁচড়াক', 'ছক্কা পাঞ্জা', 'যষ্টিমধু', 'বউ', 'ডাইনি', 'চেয়ার', 'আত্মহত্যা মহাপাপ', 'অজযুদ্ধ', 'পোস্টমাস্টার' (রবীন্দ্রনাথ), 'পালাবদল', 'বঙ্গনারী' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়), 'একটি মেয়ের জন্য', 'রাতের রূপকথা', 'সুবর্ণ কৌশল' ইত্যাদি। ১৯৮৮-তে তিনি শ্রেষ্ঠ বেতারনাট্য প্রযোজিকা হিসেবে ঋত্বিক ঘটক পুরস্কার পান।

বিনতা রায়ও কিছু কিছু বেতারনাট্য প্রযোজনা করেছেন। তাঁর উল্লেখ্য প্রযোজনা কালকূটের 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'।

অজিত মুখোপাধ্যায় ছিলেন আকাশবাণীর নাট্যবিভাগের প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট। পরবর্তীকালে নাট্যপ্রযোজক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রযোজিত অসংখ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে—'কর কলঙ্কশূন্য', 'কলকাতা', 'একা একা' (বিমল কর), 'গৃহস্বামী', 'বিপন্ন উপযুক্ত' (কাব্যনাট্য), 'কাঞ্চনজঙঘা' (সত্যজিৎ রায়), 'স্পর্শ', 'মোনাভনা', 'সাহেব', 'স্বীকারোক্তি', 'রক্তগোধূলি', 'দক্ষিণ সমুদ্র থেকে', 'পল্লিসমাজ' (শরৎচন্দ্র), ফিরে দেখা', 'সত্যি হল গল্প', 'শকুনির পাশা', 'প্রলয়ের পথিক', 'এখনও অন্ধকার', 'দত্তা', (শরৎচন্দ্র), 'সমান্তরাল', 'নীলকণ্ঠ', 'সুখের খোঁজে', 'অব্যক্ত', 'প্রসন্ন সকাল', 'নিঠুর দরদি', 'পলাতক', 'প্রহর শেষে', 'সেদিন দুজনে', 'অলৌকিক অভিনয়', 'যাদুঘর', 'অভয়া' (শরৎচন্দ্র), 'আততায়ী', 'ঘাতক' (বিমল কর), 'রাধারানি', (বঙ্কিমচন্দ্র), 'বল্লভপুরের রূপকথা' (বাদল সরকার), 'বঞ্চক', 'পথের ঠিকানা', 'চব্বিশ ঘণ্টা', 'বসন্ত দিনের ডাক' ও 'গোপাল অতি সুবোধ বালক (জহর দাশগুপ্ত) 'প্রফুল্ল' (গিরিশচন্দ্র ঘোষ/শম্ভু মিত্র যোগেশের ভূমিকায়) ইত্যাদি।

জগন্নাথ বসু ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে আকাশবাণী কলকাতার নাট্যপ্রযোজক পদে থাকার সুবাদে প্রযোজনা করেন : 'সেপ্টোপাসের খিদে' (কাহিনি—সত্যজিৎ রায়), 'সরীসৃপ' (বিধায়ক ভট্টাচার্য), 'কোনি' (মতি নন্দী), 'স্ট্রাইকার' (মতি নন্দী), 'চোখে আঙুল দাদা' (প্রমথনাথ বিশী), 'লুল্লু' এবং 'পুষ্পকীট'—এ ছাড়াও আরও অসংখ্য নাটক।

সমরেশ ঘোষ প্রযোজনা করেছেন—'অপরাজিত', 'আজব দেশ', 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'তিমি তিমিঙ্গিল' (কাহিনি—নারায়ণ সান্যাল। নাট্যরূপ—সমর চৌধুরী), 'মৃত্যুহীন প্রাণ', নাটক—অলক ভট্টাচার্য (কাহিনিসূত্র—কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজ), 'মৎস্যকন্যা', 'ফেরারি', 'নাবিক', 'তদন্ত', 'প্রথম পথ', 'মিস ডালিয়া বিহানী', 'অনধিকারী, 'অভাগীর স্বর্গ' (শরৎচন্দ্র), 'জামাইবাবু', 'চোর', 'দ্বিখন্ড', 'অগ্নিমন্থন', 'কোয়াং', 'ডাকমানুষ', 'টুডু','প্রথম অভিনয় রজনী', 'উজ্জ্বল নায়ক' (কাব্যনাট্য),

‘উত্তরণ’, ‘রুপোর সিঁদুর কৌটো’, ‘ফেরা’, ‘সঙ্গিনী’, ‘সেতুবন্ধন’, ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’, ‘শত্রুনিধন’, ‘জাল’, ‘ছোটোঘর’, ‘পাপপুণ্য’, ‘সীমান্তে’ (মন্মথ রায়) প্রভৃতি।

এইসব প্রযোজক ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু নাট্যপ্রযোজনা করেছেন ড. সূর্য সরকার, ক্ষৌণীশ বাগচি, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, গীতা গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর ঘোষ, নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রয়াতা পাপিয়া চক্রবর্তী।

এঁদের প্রযোজিত নাটকের মধ্যে ড. সূর্য সরকারের ‘মালিয়া’ (স্বরচিত, জাতীয় বার্ষিক বেতারনাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত) ‘রস’ ও ‘ইছামতী’, ক্ষৌণীশ বাগচির ‘বাঘের দুধ’, ‘জিপ দুর্ঘটনা’, ‘এইটুকু পরিচয়’, ‘মহাপ্রলয়ের পর’, ‘অনাগত সুলতান’, ‘চিতি সাপের বিষ’, ‘জলরাক্ষস’ ও ‘বিসর্জন’ (রবীন্দ্রনাথ), গীতা গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিচিত্র সংলাপ’ (নাটক—দিলীপ ঘোষ), সমীর ঘোষের ‘জটিলতা’ (কাহিনি—প্রফুল্ল রায়), ‘ফেরিঘাট’ (কাহিনি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়) এবং ‘অগ্নি’ (দেশপ্রেমমূলক) উল্লেখ্য।

৫.

বেতারের ছবি বিশ্বাসের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ‘সাজাহান’। তাঁর ‘তাজমহল’ উচ্চারণের বিশেষত্ব (তাজমহল, ‘হ’-টা উহ্য থাকত), ‘মহম্মদ, আমি তোমার পিতার পিতা’ এবং ‘আজ কেমন সেজেছি দ্যাখো’ আজও কানে বাজে।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীও ‘সাজাহান’ চরিত্রে নেমেছিলেন, তা ছাড়া তিনি করেছিলেন ‘ম্যাকবেথ’ এবং ‘তটিনীর বিচার-এ’ ডক্টর ভোস। স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি হিসেবে এগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার করেছিলেন চাণক্য’—শোনা যায় অভিনয় করতে করতে তিনি নাকি বার বার মাইক্রোফোনের রেঞ্জের বাইরে চলে যেতেন এবং নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁকে ধরে এনে আবার মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেন। ‘চাণক্য’ করতেন শিশির কুমার, নরেশচন্দ্র মিত্র করতেন ‘কাত্যায়ন’, এ ছাড়া তিনি ‘সাজাহান’-এ করতেন ‘দিলদার’। এই দুটি নাটক ছাড়াও বেতারের অনেক নাটকে নরেশচন্দ্র তাঁর অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

নীতিশ মুখোপাধ্যায় ‘সাজাহান’-এ ‘ঔরঙ্গজিব’ এবং ‘উল্কা’ নাটকে রায়বাহাদুরের ভূমিকায় খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। পাহাড়ী সান্যাল অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে এই মুহূর্তে মনে পড়েছে ‘বিন্দুর ছেলে’-তে বিন্দুর ভাশুরের চরিত্রে তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয়ের কথা।

বীরেশ্বর সেন ছিলেন বেতারের এক শক্তিমান অভিনেতা, তাঁর অভিনয়ের সংযম, ব্যক্তিত্ব এবং আণ্ডার অ্যাকটিং নাটকে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করত। সেই লাউড এবং থিয়েট্রিক্যাল অ্যাকটিং-এর যুগে তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস ছিল একান্ত নিজস্ব এবং ঘরানার দিক থেকেও বিশিষ্ট। তাঁর গম্ভীর ও রেওয়াজি কণ্ঠ মুহূর্তে শ্রোতাদের আবিষ্ট করে তুলত। ‘মহাকবি গিরিশচন্দ্র’ নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে আবেগকে সবসময় তিনি টান টান করে রাখতেন। গিরিশচন্দ্রের অন্তর্জগতের আলোড়ন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চরণে আশ্রয় দেওয়া—সমস্তই তিনি পূর্ণভাবে ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। জীবনীমূলক নাটকের ক্ষেত্রে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রযোজনায় এ এক স্বর্ণময় সৃষ্টি। বীরেশ্বর সেনের আর একটি বলিষ্ঠ চরিত্রায়ণ শংকর-এর কাহিনি অবলম্বনে ‘পুরোহিত’ নাটকে নামভূমিকায়। অভিনয়ের জন্য অসুস্থ বীরেশ্বরকে চেয়ারে করে স্টুডিয়োতে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু অভিনয়ের টানে ওই অসুস্থ মানুষটি টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রোতারা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই জানেন কী মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছিলেন তিনি।

চিরহাস্যময় সদানন্দ দাদাঠাকুর

কলকাতা বেতারের সঙ্গে শরৎচন্দ্র পন্ডিত (ওরফে দাদাঠাকুর) যুক্ত ছিলেন দীর্ঘ পনেরো বছর। বেতারে 'পল্লিমঙ্গল আসর' 'ছোটোদের আসর'-এ নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। 'ছোটোদের আসর'-এ তিনি এমন সব প্রশ্ন করতেন, যেখানে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে। যেমন, এটা কী গ্রাম—এ টাকি গ্রাম। রামরাবণের যুদ্ধের কারণ জান কী—রামরাবণের যুদ্ধের কারণ জানকী।

বেতারে 'পঞ্চভূতের আসর' বলে একটি অনুষ্ঠানে দেখা গেল, একটি গাছে পাঁচজন ভূত দেশের নানা সমস্যা নিয়ে সরস আলোচনা করছে তার মাঝে মাঝে নাকি সুরে গান করছে। এই পাঁচজন হলেন : ভদ্রভূত—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পন্ডিত ভূত—শরৎচন্দ্র পন্ডিত, বিপ্রভূত—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত ভূত—সারদা গুপ্ত, আর অদ্ভুত—নলিনীকান্ত সরকার।

একবার এক কথিকায় দাদাঠাকুর বলেন : 'এখনকার মা-রা নিজের শিশুসন্তানকে আয়া বা ঝির হাতে দেখাশোনার ভার দিয়ে নিজেরা কোলে কুকুরছানা নিয়ে আদর করেন। আয়া বা ঝিকে মাসিক বেতন দেন। অর্থাৎ স্নেহ-ভালোবাসা ভাড়া দিয়েছেন। এই হল আধুনিকতা বা fashion। প্রতিবাদে অনেক চিঠি আসে Station Director Stepleton-এর কাছে। স্বভাবতই তিনি Programme Director-কে ডেকে বলেন—'কে এই দাদাঠাকুর? অশ্লীল ভাষায় ভাষণ দিয়েছে—When the devil comes, bring him to me।' Programme Director ভয়ে ভয়ে দাদাঠাকুরকে সব জানান। শুনেই দাদাঠাকুর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ পোশাকে ও ভঙ্গিতে সাহেবের কামরায় ঢোকেন। তাঁকে দেখামাত্রই সাহেব বলে ওঠেন—'So you are Dada Thakur and this is your fashion।' দাদাঠাকুর তখখুনি উত্তর দেন—Yes, this is my fashion. I donot like any devil will imitate my fashion as I donot imitate any deveils fashion.

সাহেব প্রশ্ন করেন—What is the definition of fashion? একটি কাগজ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুর তাতে লিখে ফেলেন—Fashion is the thing that arouses passion of the other sex. সাহেব লেখাটি পড়ে হাসতে হাসতে বলে ওঠেন—Oh! you are wonderful gentleman. সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুরের অনুষ্ঠানের সম্মান-দক্ষিণা বাড়িয়ে দেওয়া হল। একসময়ে 'বেতারজগৎ'-এর প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল 'পল্লিমঙ্গল আসরে দাদাঠাকুর' শিরোনামে হুঁকো হাতে দাদাঠাকুর-এর মজলিশি ছবি।

দাদাঠাকুর ছিলেন প্রখর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, নির্লোভ, নির্ভীক, পরার্থপর, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন রসিক এক অনন্য চরিত্রের মানুষ। ছেলেবেলায় দাদাঠাকুরের একবার কালাজ্বর হয়েছিল। Antimoney Injection দিয়ে রোগ সারল। সেই থেকে তিনি Antimoney ব্যাধিগ্রস্ত।

ছেলেবেলায় পিতৃমাতৃহীন শরৎ-এর দায়ভার নেন কাকা রসিকলাল—শরৎচন্দ্র যাঁকে 'বাবা' বলতেন। বস্তুত কাকার কোমল-কঠোর স্বভাবের অনুশাসনেই বড়ো হয়ে ওঠে শরৎ। অল্পবয়সে গরম বালির চরের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হত শরৎকে। কাকাকে এই কষ্টের কথা বলতে তিনি এক স্যাকরাকে ডেকে পাঠান, যার একটা পা নেই, কাঠের পায়ে ক্রাচ নিয়ে হাঁটে। কাকা বললেন, তোমার তো দুটো পা আছে। তাতেও তোমার কষ্ট হয়? সেই থেকে সারা জীবন আর জুতো পরার কথা ভাবেননি শরৎচন্দ্র। সর্বত্র যেতেন খালি পায়ে।

রসিকলাল বলতেন : 'It is better to starve than to serve'. দাদাঠাকুর জঙ্গিপুর হাই স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে কলেজে পড়ার মাঝপথেই আসে স্বাধীন বৃত্তির চিন্তা এবং কলকাতা থেকে ভোলানাথ দত্তের সাহায্যে ছেচল্লিশ টাকায় কাঠের পুরনো হ্যাণ্ড প্রেস কিনে দফরপুরের বাড়িতে ছাপাখানা শুরু করেন

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। নাম দিয়েছিলেন, 'পন্ডিত প্রেস'। কিছুদিনের মধ্যেই রঘুনাথগঞ্জের ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত হয় প্রেস কাজের সুবিধের জন্যেই—কারণ কোর্ট-কাছারি, খানা সবই ছিল এই রঘুনাথগঞ্জে। চেকদাখিলা, নিমন্ত্রণপত্র, প্রীতি উপহার ইত্যাদি ছাপার কাজের বরাত ভালোই হত এলাকায় অন্য ছাপাখানা না থাকায়।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১৩২১, ৬ জ্যৈষ্ঠ) বেরোতে আরম্ভ করে সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'জঙ্গীপুর সংবাদ', যা শতবর্ষ অতিক্রম করে আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বর্তমান সম্পাদক দাদাঠাকুরের পৌত্র অনুত্তম পন্ডিত।

মাটির মেঝেতে টিক কাঠের কেসের মতোই সারি সারি গর্ত করে সাজিয়ে, ছোটো ছোটো মাটির ভাঁড় বসিয়ে, তার মধ্যে টাইপ বাখতেন। কাঠের 'কেস'-এর বিকল্প ব্যবস্থা। ছাপার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী প্রভাবতী দেবী রোলার-এ কালি লাগিয়ে দিয়ে সাহায্য করতেন। সম্পাদকীয়, দেশি-আন্তর্জাতিক স্থানীয় খবর, ট্রেন টাইম-টেবল, অকশন-টেণ্ডার, নোটিশ, বিজ্ঞাপন, এ ছাড়া হাস্যরসাত্মক গীত, বিখ্যাত গানের প্যারোডি ছাপা হত কাগজে। কবিত্বশক্তি এবং ভাষার ওপর দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র নিজেকে 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যচর্চাতে আবদ্ধ রাখেনি। তিনি অনায়াসেই সর্বকালের কবি হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু লেখালেখির মাধ্যমে সমসাময়িক বিষয় ও ঘটনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগস্থাপনই ছিল তাঁর লক্ষ্য—তা সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, পণপ্রথা, পর্দাপ্রথা যে-কোনো বিষয়ই হোক না। তাঁর সময়ে অজ্ঞ, অর্ধশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল এখানকার চেয়ে অনেক বেশি। তাই সোজাসাপটা ভাষায় ছড়া-পাঁচালির ঢঙে কিংবা চারণকবির স্বভাবে তাঁর প্রকাশভঙ্গিমা রামায়ণ-মহাভারতের মতোই সাধারণ মানুষের অন্তরে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি আবার ভাবনারও খোরাক হয়ে ওঠে।

'বিদূষক'-সাপ্তহিক বেরোতে শুরু করে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১৩২৯), পত্রিকাটি 'ধামাধরা ও উদারপন্থী দলের মুখপত্র' বলে উল্লিখিত ছিল। প্রচ্ছদে ব্রাহ্মণ পন্ডিতের একটি ব্যঙ্গচিত্র তার কপালে 'দুঃখ', বুকে 'দুরাশা' আর উদরে লেখা—'উদররে তুঁহু মোর বড়ি দুশমন।' 'এডিটর' শব্দটি ছাপা হত Aid-eater বলে। বিদূষকের আত্মকথা এইরকম—'জন্ম আমার জঘন্য স্থান পল্লিগ্রামের জঙ্গলে/দেশের মঙ্গল যেমন তেমন নিজের পেটের মঙ্গলে/আজ রাত্তিরে ভরে রাখি খালি আবার কালকে তা/পেটের জ্বালায় বিদূষক চলে এলেন কলকেতা।' সেসময়ে কলকাতার মুক্তরামবাবু স্ট্রিটে একটি প্রেস থেকে ছাপা হত 'বিদূষক'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশটি করে কিনতেন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিলি করার জন্যে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তখন কলকাতা কর্পোরেশনের সি.ই.ও। তিনি দাদাঠাকুরের 'হকিং লাইসেন্স' করিয়ে দেন।

রসরাজ অমৃতলাল বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, শরৎচন্দ্র বসু, শিশির ভাদুড়ী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্টজন তাঁর লেখায় মুগ্ধ হয়ে ওঠেন।

'বিদূষক'-এ রঙ্গব্যঙ্গ-স্যাটায়ার-এ ভরা থাকত দাদাঠাকুরের লেখাগুলো। সংবাদগুলো প্রথম দিকে 'সন্দেশের ঝুড়ি' নাম দিয়ে পদ্যে প্রকাশিত হত। তারপর 'রকমারি', 'ছোট মুখে বড় কথা' নামে গদ্যে লেখা থাকত।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন মহাত্মা গান্ধির আফ্রিকা থেকে আগমনের পরে নতুন রূপ নেয়। প্রতিষ্ঠা হয় কাউন্সিল সভার। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। 'Legislative Council' সভ্যদের নিয়ে কাউন্সিলের ঘটনাবলি প্রকাশ করেছিলেন দাদাঠাকুর কয়েকটি কাব্যে—'কাউন্সিল গঞ্জিকা', 'কাউন্সিল সিদ্ধি' 'কাউন্সিল চন্ডু' নামে।

'জঙ্গীপুর সংবাদ'-এর মতোই ছিল বিষয় নির্বাচন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি অনেকটাই ভিন্ন নতুন আঙ্গিকে। কলকাতা থেকে সস্তায় সের দরে পুরোনো কাঠের 'ব্লক' কিনে তাতে কালি লাগিয়ে ছবি ছাপা হত কাগজে। এক অদ্ভুত উলটো পদ্ধতি—আগে ছবি, পরে লেখা।

২.

শরৎ পন্ডিত সম্পর্কে সনেট লিখেছিলেন কবি মনীশ ঘটক। লিখেছিলেন :

চারিত্র দুর্ভেদ্য বর্ম, নির্লোভ ব্রাহ্মণ
জ্বলিত তোমার ভালে হরকোপানল।
কপর্দকহীন তুমি যবে নিঃসম্বল
হেলায় ঠেলেছ পায়ে সর্ব প্রলোভন।
... ...
শুধুমাত্র বিদূষক যে তোমারে কয়
সেকভু পায়নি তব সত্য পরিচয়।

দিলীপকুমার রায়ের সংবর্ধনা সভায় নলিনীকান্ত সরকার দাদাঠাকুরের 'কলিকাতার ভুল' গেয়ে শুনিয়েছিলেন—'মরি হায় রে, কলকাতা কেবল ভুলে ভরা/সেথায় বুদ্ধিমান চুরি করে বোকায় পড়ে ধরা'। রবীন্দ্রনাথ এ-গান শুনে শরৎ পন্ডিতের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন।

কাজী নজরুলের সঙ্গে তাঁর (দাদাঠাকুরের) ছিল তুই তোকারি সম্পর্ক। নজরুল তাঁর 'চন্দ্র-বিন্দু' গ্রন্থটি দাদাঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।

অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর লেখা 'আ মরি বাংলা ভাষা'-র প্যারডি 'নয় তো মোদের এ জ্ঞান যে সে—গঙ্গা ডুবিল গ্যাঞ্জেসে/ইণ্ডাস এল সিন্ধু দেশে/ভিয়াস হয়েছে 'বিপাশা' শুনে আপ্লুত হয়েছিলেন।

রসরাজ অমৃতলাল বসু দাদাঠাকুরের কণ্ঠে 'দুটো মনের কথা বলি তোরে ও মা জগদম্বা' গানটি শুনে দাদাঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি জিন্নাও দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে দারুণ খুশি হয়েছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন—'একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল—তাহার নাম সোজাসুজি শরৎপন্ডিত —'বিদূষক'-এর এডিটর, তিনি মুখে মুখে পদ্য লেখেন, তাঁর কাগজও পদ্যে। তিনি এক আধারে এডিটর, প্রুফরিডার, কম্পোজিটর, ডেস্পাচার—তিনি কেবল সাবস্ক্রাইবার নন। সেকালে ভাঁড়ের কথা শুনিয়াছিলাম, ইনি সেই ভাঁড়। কিন্তু ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্টি করিয়া সকলকে হক কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই—সদানন্দ পুরুষ!

পরিমল গোস্বামীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় : তাঁর নিজহাতে কম্পোজ করা এবং হাতল টেনে ছাপার যন্ত্রে স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপার ভার নিতেন এবং ঠিক সময়ে ছেপে দিতেন। একবার অল্প সময় ছিল, সেবারে তিনি এগারো দিন ছাপাখানায় শুধু মুড়ি খেয়ে দিনরাত কাজ করে ঠিক সময়ে প্রশ্নপত্র ছেপে দিয়েছিলেন। একবার ত্রিশ মাইল দূরের এক স্কুলে যাবার ট্রেনটি বন্যায় অচল হওয়ায় সেখানে হেঁটে গিয়ে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

নির্মলচন্দ্র দাদাঠাকুরের বন্ধু ছিলেন। নির্মলচন্দ্রের হয়ে দাদাঠাকুর ভোটামৃত লিখেছিলেন—'আমি এই রূপে গতবার ফিরেছিনু দ্বারে দ্বারে/পেয়েছিনু এইরূপই হোপ গো/মোরে ভুলাইয়া প্রলোভনে ভোট ছিলা অন্যজনে/মোর 'ডিপোজিট মানি' হল লোপ গো।' কলকাতায় এলে দাদাঠাকুর নিয়মিত নির্মলচন্দ্রের আড্ডায় যেতেন, ভূরিভোজে 'না' বলতেন না, রাত্রি হয়ে গেলে নির্মলবাবু ট্যাক্সিভাড়া দিলে, সেটাও নিয়ে নিতেন।

৩.

দাদাঠাকুরের আয়রন-চেস্ট তো দূরের কথা, মানিব্যাগ পর্যন্ত ছিল না। বলতেন : চেস্ট যাদের আয়রনের মতো অনুভূতিহীন, তারাই আয়রন চেস্ট-এ রাখার মতো টাকা সঞ্চয় করতে পারে। বলতেন : আমার অ্যাকাউন্ট খোলা আছে রিভার ব্যাংকে, এ ব্যাংকে আবার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করা সোজা নয়। ফ্লোটিং অ্যাকাউন্ট, সিংকিং ফাণ্ড সব আছে।

প্রবল বৃষ্টির দিনে খড়ের চাল ভেদ করে বৃষ্টির জল পড়ায় ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে বিছানা সরাতে-সরাতে জ্যামিতি বর্ণনা করতেন হাসির উপাদানরূপে, বলতেন : দেখলাম এক কোণ আর এক কোণের সমান এবং সব কোণ সেই কোণের সমান, এতএব কোণগুলো পরস্পর সমান।

শরৎ পন্ডিত কখনও হাতে নেননি লাঠি, পায়ে দেননি চটি, ছিলেন না কারুর অধমর্ণ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে খালি পায়েই টো টো করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াতেন হেঁটে। ভিড় বাসে বা ট্রামে উঠতেন না, কেননা ওখানে নিত্য রাস, নিত্য ঝুলন।

একবার রঘুনাথগঞ্জে এক বড়োলোক বাড়ির সামাজিক অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুর রাতের খাওয়া সেরেছেন। পরদিন ভোরে প্রেসে এসে নলিনীকান্ত সরকারকে (নলিনীকান্ত তখন দাদাঠাকুরের কাছেই থাকতেন) বললেন, 'একটু তামাক সাজ—শরীরটে ভালো নেই।

নলিনীবাবু বললেন, কেন?

—কালকের ব্রাহ্মণ ভোজেনর জের। সারা রাত্তির 'পেট্রিয়ট' হয়ে বিছানায় ছটফট করেছি।

—পেট্রিয়ট হয়ে?

—পেটের মধ্যে রায়ট বাধে বলেই তো লোকে পেট্রিয়ট (Pet-riot) হয়। .... লুচি, মাংস, পোলাও, মাছ, ক্ষীর, সন্দেশ সব পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ায়, অপরিচিতদের দেখে পেটের স্থায়ী বাসিন্দা ডাল, ভাত, শাক, চচ্চড়িরা একসঙ্গে who are you, who are you বলে বাধিয়ে দিলে। ব্যস, কী হট্টগোল সারারাত্তির!

দাদাঠাকুর বলতেন, 'ইংরাজি যত পড়ি, ততই তার মহিমা দেখে অবাক হই। মানুষকে আমরা পেটসর্বস্ব বলে যত গালাগালি দিই না কেন—সত্য কথা বলতে গেলে, সব মানুষই পেটসর্বস্ব। মানুষ সারা জীবন খেটে মরে পোড়া পেটের জন্য। এই বেদবাক্যটি ইংরেজ জাত যেমন বুঝেছে, এমনকি আর কেউ বোঝেনি। তাই পেট (Pet) ওদের কাছে প্রিয়। যত পড়ি ইংরেজির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে যাই। কী খাসা একটি শব্দ রয়েছে ইংরেজি ভাষায়, এরকম সার্থকনামা শব্দ বোধহয় দুনিয়ার কোনো ভাষাতেই নাই। শব্দটি হচ্ছে—neighbour (নেবার)। এর মানে 'প্রতিবেশী'। দেবার নাম করে না, অথচ নেবার বেলায় হাত বাড়িয়ে থাকে—একেই তো বলে প্রতিবেশী। এই নেবার কথাটিকে আমাদের বাংলা অভিধানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত।'

বলতেন, 'ইংরেজ জাত খুব চটপটে। ...তাদের রেলগাড়ি জাহাজ যেমন শনশন করে ছুটে চলে যায়, আমাদের ইংরেজি-পড়া বাঙালিবাবুদের জীবনও তেমনি শনশন করে ছুটে চলেছে। ...একটু কান পেতে শুনুন, তাহলে এর ধ্বনিটা বেশ ভালো করে বুঝতে পারবেন। এই দেখুন না—জন্মানোর সঙ্গে-সঙ্গেই 'বার্থ রেজিস্ট্রেশন', তারপর দুদিন না-যেতেই 'ভ্যাক্সিনেশন'। একটু বড় হতেই দরকার হয় 'এডুকেশন'। তখন একটা 'ইনস্টিটিউশনে' 'অ্যাডমিশন' নিয়ে ডেইলি 'লেশন' 'প্রিপারেশন' করতে 'প্রোনানসিয়েশন' 'কনজাংশন', 'ইন্টারজেকশন' আয়ত্ত করতে হয়।

...ফাইন্যাল 'একজামিনেশন' ছিল এন্ট্রান্স—সরকার দেখলেন, শনশন করে যাওয়ায় বাধা পড়ে, তাই তার নাম দিলেন 'ম্যাট্রিকুলেশন'।...

একবার পুলিশের বড়কর্তাদের সভায় আমন্ত্রিত হয়ে দাদাঠাকুর বলেছিলেন, 'পুলিশদের প্রথম শিক্ষা প্যারেড করা, লেফট রাইট লেফট। কিন্তু পরবর্তীকালে 'রাইট ইজ অলওয়েজ লেফট বাই দেম।' মনে রাখতে হবে, সেটা ছিল ব্রিটিশ আমল।'

'শাক্ত' আর 'বৈষ্ণব'-এর পার্থক্য বোঝাতে বলেছিলেন, 'এরা বলে ঢাক, ওরা বলে খোল।'

'জবাকুসুম তেল'-এর মালিকরা দাদাঠাকুরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন। একটায় এক সাধিকা মা-কালীর পায়ে জবাফুল দিচ্ছেন, আরেকটায় একজন ভদ্রমহিলা চুলে তেল মাখছেন, এরকম দুটো ফোটো দিয়ে দাদাঠাকুরকে 'ক্যাপশন' করে দিতে বলা হয়েছিল। দাদাঠাকুর লিখলেন, 'সাধনে জবাকুসুম, প্রসাধনে জবাকুসুম।'

জবাকুসুম তেলের বিজ্ঞাপনে গৃহিণীর পত্রে লিখেছিলেন এমন এক কবিতা যার ওপর থেকে নিচে প্রতি লাইনের আদ্যক্ষর নিয়েই—'জবাকুসুম তেল আনিও'। দাদাঠাকুর বলতেন, 'দ্যাখো, I first person Singular number, always capital, never takes help of another alphabet?'

তাঁর ভাবনার মৌলিকতা ফুটেছে বিশেষ করে প্যালিনাড্রোম সৃষ্টিতে। তিনি চমকিত করে জানান ইংরেজি EYE শব্দ বা বাংলা নয়ন শব্দ সোজা আর উল্টো একইরকম। যেমন ছিল তাঁর জন্মসাল ১৮৮১—উল্টোলেও সোজা থাকে।

দাদাঠাকুর কোঁচার কাপড় জড়িয়ে বেড় দিয়ে কোমরে বেঁধে, ধুতির ওপর একটা সুতির চাদর গায়ে দিতেন আর খালিপায়ে থাকতেন। শীতকালে শীত করে কি না জিজ্ঞেস করলে ট্যাঁক থেকে একটা পয়সা বার করে সেটা উঁচু করে তুলে ধরে বলতেন, 'পয়সার গরম বড্ড বেশি কিনা, তাই একটি করে পয়সা ট্যাঁকে রাখি।'

শরৎচন্দ্রের দেব-দেবীতে তেমন অবস্থা ছিল না। যদিও মুখে-মুখে, কৌতুক ও শ্লেষের কবিতা বানানোর জন্য লোকে তাঁকে 'সরস্বতীর বরপুত্র' বলত। তাঁর স্পষ্ট যুক্তি : মন্ত্র বলতে গেলে 'দেহি' বলতে হবে, অর্থাৎ চাইতে হবে, তাই সরস্বতী পুজোই করব না। শুধু সরস্বতী ঠাকুর নয়, অন্য দেবদেবীর ওপরও বিশ্বাস ছিল না তাঁর। স্ত্রী ছেলের অসুখ সারানোর জন্য মানত করেছেন শুনে বলেছিলেন, 'যে ঠাকুর নিজের ছেলের শুঁড় ঠিক করে দিতে পারে না, সেপরের ছেলের ভালো কি করে করবে?' একবার দাদাঠাকুর চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কাগজে কিছু লিখছিলেন সম্ভবত তাঁর পত্রিকার জন্য। সামান্য ঝুঁকে-পড়া বসার ভঙ্গি, গায়ে সুতির সাদা চাদর, পরনে ধুতি। মাথায় কিছুটা পাতলা হয়ে-আসা সাদা চুলে হঠাৎ ওপরের দেওয়াল থেকে পড়ল এক টিকটিকি। পড়ল তো পড়ল, আর যায় না। মেয়ে ঘরে ঢুকে বলে উঠল—বাবা, আপনার মাথার ওপর টিকটিকি—টের পাননি? দাদাঠাকুর হেসে বললেন, 'জানি মা, শুনেছি মাথায় টিকটিকি পড়লে নাকি রাজা হওয়া যায়, তাই একটা চান্স নিচ্ছি, আর কি!'

'জঙ্গীপুর সংবাদ' প্রকাশ করার জন্য আরও বেশি প্রেস-সামগ্রীর প্রয়োজন হল, দাদাঠাকুর গেলেন কলকাতায় এক সাহেবের অফিসে। সাহেব দাদাঠাকুরের চকমকি জ্বালিয়ে হুঁকো খাওয়ার 'বিদ্যে' দেখে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি তো বাঙালি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন হে।'

(প্রসঙ্গত বলা যায়, দাদাঠাকুর গড়গড়া সচরাচর খেতেন না, বলতেন, ওসব নল দময়ন্তীতে আমি নেই।) সেই সাহেব তাঁকে 'যখন সুবিধে হবে শোধ করলেই হবে' হিসেবে একটি মেশিন দিতে চেয়েছিলেন। দাদাঠাকুর রাজি হননি কারুর ধার ধারতে। ওই সাহেবই তখন তাঁকে অন্য জায়গা থেকে অপেক্ষাকৃত সস্তা প্রেস কিনিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি ট্রেনে করে নিয়ে এসে জঙ্গীপুর রোড স্টেশনে নামানোর সময়ে একটু চোট খায়। দাদাঠাকুর এ জন্য রেল কোম্পানির থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলেন।

একবার নাটোরের মহারাজার আমন্ত্রণে অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে দাদাঠাকুর এক সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে দু চারজন উটকো বড়োলোকও ছিলেন। তাঁদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, দাদাঠাকুর তাঁদের অঞ্চলে গিয়েছেন কি না?

দাদাঠাকুর।—না মশাই, ধনীরা আমাকে দেখে ভয় পান বলে ও-পথ মাড়াইনি।

ধনীব্যক্তি। কেন?

দাদাঠাকুর। যতই তিনি পরিচয় দেন না কেন, তার 'বেশ' দেখে বাড়ির দারোয়ানই ভ্রূ কোঁচকাবে আর মালিককে বললে তিনি ভাববেন, একে ব্রাহ্মণ তায় এরকম বসন, নিশ্চয়ই যাচক।

প্রশ্নকর্তা স্তম্ভিত।

পাদপূরণ করে দাদাঠাকুর বললেন, 'সংসারে যাচকের চেয়ে হালকা অর্থাৎ লঘু আর নাই। মানুষ তো মানুষ, বাতাসও তার কাছে যেতে ভয় করে সেকিছু চাইবে বলে।

এক সাহিত্যসভায় একবার এক জমিদারকে সভাপতি করা হল। অথচ অনেক নামিদামি সাহিত্যিক সেখানে এসেছেন। দাদাঠাকুর এক সাংবাদিক বন্ধুকে বললেন, 'তোমরা আমাকে বঙ্গীয় জমিদারসভার সভাপতি করে দিতে পারো?'

—জমিদারসভার? সাংবাদিক তো হাঁ। দাদাঠাকুর বললেন, 'যদি একজন জমিদারকে সাহিত্যসভার সভাপতি করা যায়, তাহলে আমি কেন জমিদারসভার সভাপতি হব না?

বিখ্যাত সাংবাদিক ও মজলিশি মানুষ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে শরৎ পন্ডিত মহাশয়ের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। একবার তাঁর বাড়িতে ঢুকতেই বাড়ির কুকুর এসে হঠাৎ দাদাঠাকুরকে কামড়ে দিল। অপ্রস্তুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাড়াতাড়ি টিংচার আয়োডিন দিয়ে তুলো লাগিয়ে ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতেই দাদাঠাকুর হেসে বললেন, ও কুকুরে কামড়াবে বলে বুঝি সবরকম নিয়াময়ের ফার্স্ট-এড-এর ব্যবস্থা রেডি করে রেখেছ? হেমেন্দ্র ক্ষণিকের জন্য বিমূঢ়ভাব সামলে পালটা রসিকতা করে বললেন, 'না না, ও তো সবাইকে কামড়ায় না। ভদ্রলোকদের ও চেনে, তাদের কামড়ায় না।' দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ব্যাপারটা অন্য, বুঝলে কি না। কায়েতের কুকুর তো, তাই ওর মনিবের মতো বামুনের পা পেয়ে আর ছাড়তে পারেনি।'

দাদাঠাকুর রাজা রাজড়াদেরও রেয়াত করতেন না। একবার নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় তাঁকে খুব খাতিরদানি করে নেমন্তন্ন করেন। আহারাদি হতে দেখা গেল রাজভৃত্য তাঁর পরিচর্যার জন্য রুপোর গাড়ুতে জল আর সাবান তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। দাদাঠাকুর সেসব অ্যাপায়ন অগ্রাহ্য করে হাত ধুয়ে এলেন পুকুরে। তাই দেখে জগদীন্দ্র ব্যঙ্গ করে বললেন, ঠিকই তো, এসব অ্যাপায়ন পাড়াগাঁর মানুষদের সইবে কেন?

দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—ব্যাপারটা তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি? কী জানেন মহারাজ, রাজবাড়ির হিসেবের পুরোনো খাতা খুললেই বুঝতে পারবেন এই রূপোর গাড়ু বানাতে কত টাকা লেগেছে। আসলে আমি তো আবার কম দামের জিনিস ব্যবহার করতে পারি না—বনেদি মেজাজ আমার, বুঝলেন?

আগেই বলা হয়েছে, নলিনীকান্ত সরকার দাদাঠাকুরের প্রেসে কাজ করতেন এবং পরিবারের একজন হয়ে থাকতেন। একবার এই নলিনীকান্তকে স্বদেশি করার জন্য পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। দাদাঠাকুরকেও পুলিশ ডেকেছিল। পুলিশ দাদাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল :

—নলিনী সরকার আপনার প্রেসে কাজ করে?

—হ্যাঁ

—কেমন লোক সে?

—খারাপ লোককে কেউ নিজের কাছে রাখে!

—সেস্বদেশি।

—সেতো স্বদেশিই, একই মহকুমায় নিমতিতা গ্রামে ওর বাড়ি।

—সেকথা নয়। স্বদেশি আন্দোলন করে?

—হ্যাঁ করে। স্বদেশি গান গেয়ে চাঁদা তোলে।

—সেস্বদেশি নয়। সেকি বিপ্লবী?

—হ্যাঁ। তার মাসতুলো ভাই বিপ্লবী বলে ইনটার্ন হয়ে আছে। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

—তার কাছে আপনার অপরিচিত কেউ আসে?

—হ্যাঁ আসে। কেউ ওর চেনা, কেউ আমার চেনা।

—পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স, গায়ের রং কালো, চোখে চশমা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, এমন কেউ আসে? (এটি বিপ্লবী গোপেশচন্দ্র রায় সম্পর্কে বলা)

—হ্যাঁ আসে। আমাদের সুশীল মোক্তার। সবে মোক্তারি পাশ করেছে।

পুলিশ অফিসার হতাশ, ছেড়ে দেয় নলিনী সরকারকে।

শরৎচন্দ্র পন্ডিত ভোটের গান লিখে একবার, তার এলাকার তেলেভাজার দোকানদার প্রায় নিরক্ষর কার্তিক সাহাকে ভোটে জিতিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার করে দিয়েছিলেন। এরকম একটি গান —'ভোটের লাগিয়া ভিখারি সাজিনু ফিরি গো দ্বারে দ্বারে। '

দাদাঠাকুর 'বোতল পুরাণ' ফেরি করতেন গান গেয়ে।

‘জঙ্গীপুর সংবাদ’, ‘বিদূষক’ ও ‘বোতল পুরাণ’ বিক্রি করেই সংসার চলত শরৎচন্দ্রের। কলকাতার পথে পথে গান গেয়ে, কখনও একটু কোমর দুলিয়ে এই সব পত্রিকা বেচতেন তিনি।

গাইতেন :

বোতল নিবি কে রে?
এই বোতলে নেশাখোরের
নেশা যাবে ছেড়ে।
বোতল নিবি কে রে?

একদিন দাদাঠাকুর ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব কোণে বোতল পুরাণ ফেরি করছেন, এমন সময় লালবাজারের দিক থেকে বেশ কিছু পুলিশ সার্জেন্ট পেছন দিক দিয়ে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল। ডাইনে বাঁয়ে দুদিক দিয়ে শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট দুটিকে তাঁর দিকে আসতে দেখেই তিনি গান ধরলেন :

হিউমার স্যাটায়ার উইট
আর ইন মাই পাবলিকেশন।
জেন্টলম্যান টেক দি বটল
ফর ইয়োর রিল্যাকসেশন।।

বার দুই গাওয়ার পর এক সার্জেন্ট বলল, ইজ ইট ইয়োর হকিং সং?

দাদাঠাকুর বললেন, ইয়েস, দ্য টিউন ইজ ইন বেঙ্গলি, বাট ওয়ার্ডিং ইন ইংলিশ।

কৌতূহলী সার্জেন্ট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললে, গো অন হকিং।

দাদাঠাকুর এই গানে একটি অন্তরা সংযোজন করলেন :

ইট ইজ অব নাইস রাইম
দেয়ার ইজ নো ভাইস ক্রাইম
অ্যাট ইয়োর লিজার টাইম
রিড ইট ফর রিক্রিয়েশন।।

অন্তরাটি শেষ করে গানের নিয়ম অনুযায়ী দাদাঠাকুর গোড়ার লাইনটিতে ফিরে এলেন। সাহেব ভাবলে, গান বুঝি ফুরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল—গো অন, গো অন।

দাদাঠাকুর তখন আরও একটি অন্তরা জুড়লেন :

দি গেট আপ ইজ ভেরি নাইস,
টু অ্যানাস ওনলি প্রাইস,
ইফ ইউ ক্যান স্যাকরিফাইস
নো ফিয়ার অব ল্যামেন্টেশন।।

সাহেব পকেট থেকে একটি দু আনি বের করে একখানি ‘বোতল পুরাণ’ কিনে দলবল নিয়ে অন্য হকার শিকার করার জন্য চলে গেল। গানের গুণে আর বোতলের আকারের আকর্ষণে এই বাংলা বই বোতলপুরাণ অবাঙালিরাও গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনত। বড়োবাজার অঞ্চলে দাদাঠাকুর এই বোতল পুরাণ ফেরি করতেন হিন্দিতে।

গাইতেন :

কালা এইসা বোতলমে
লাল রংকে মাল
দো আনা পৈসা দেকে
পিয়ালামে ঢাল।।
ইসমে নেহি দারু,

খালি হ্যায় মিঠি ঝাড়ু
পিকে শায়েস্তা হোগা
শারাবি মাতাল।

৪.

মনে পড়ে, কুষ্ঠিয়ার কুমারখালি থেকে হরিনাথ মজুমদার অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে প্রকাশ করতেন 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' তিনি অর্থাৎ কাঙাল হরিনাথ ও দাদাঠাকুরের সাংবাদিকতার প্রকৃত মূল্যায়নের সময় এসেছে এখন। মনে রাখতে হবে, সেকালের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় আর আধা মফসসলি পরিবেশে এই দুই ব্যতিক্রমী বাঙালি যে সততা ও সাহসের সঙ্গে সমকালীন দেশকালের প্রতিবেদন লিখে গেছেন স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাষী গদ্যে, তা আমাদের সাংবাদিক ভাষার আদিবৃত্তান্ত ধরে রেখেছে। এ কথা বলেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তী ('একলা মোদের হাজার মানুষ' প্রতিদিন ২ মার্চ ২০১৪)

শরৎচন্দ্র পন্ডিত একই কলমে তিনরকম লেখা লিখতে পারতেন। সবচেয়ে দ্রুত লিখতে পারতেন বৈঠকি রচনা আর হাসির লেখা—ছন্দে হাত ছিল পাকা। আরেকরকম লেখা লিখতেন সমসাময়িক সমাজবীক্ষা থেকে, তাতে থাকত একটু আধটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের রসান। যেমন,

> শুনিয়াছি বহুদিন পূর্বে, একজন বাঙ্গালা সাহিত্যিক বঙ্গভাষার উন্নতির জন্যে বক্তৃতা দিতে দিতে বলিয়াছিলেন, 'হে নেটিভ ব্রাদারগণ' তোমরা 'ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ' পরিত্যাগ করিয়া 'মাদার ল্যাঙ্গোয়েজ' ব্যবহার কর।

সেকালের বহু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, জননেতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায় থেকে কার সঙ্গে না তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল!

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে মহারাজ সৌরীশচন্দ্র রায়ের হাত থেকে নেন 'গোপাল ভাঁড়' পুরস্কার। কিন্তু তাঁর আরও অনেক পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল না কি? নিশ্চয়ই ছিল। নাই বা পেলেন, সেই অঢেল অজস্র আনুষ্ঠানিক সম্মান—তিনি মিথ হয়ে আছেন বাঙালির মনে ও মননে। গ্রামোফোন রেকর্ডে নলিনীকান্ত সরকারের গাওয়া দাদাঠাকুরের গান—'কলকাতার ভুল', 'ভোটের গান' এবং সারদা গুপ্তর গাওয়া 'কলকাতার খেদ', 'বাবু কোনটি তোমার আসল রূপ'—খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল সেসময়ে।

নির্লিপ্ত সাধকের মতো মৃত পুত্রের চিতার সামনে বসে শ্মশানে বন্ধুর কথায় মুখে মুখে গান বেঁধেছেন।

দুখ দিয়ে বুক ভাঙবে তুমি, তাই ভেবেছ ভগবান?
আমি মার খাব তাও কাঁদব নাকো, পরাণ খুলে গাইব গান।
দত্তাপহারী হলে, নিলে জিনিস করে দান
ভাগ্যে আমার যা হবে হোক
হলাম তোমার দুখের গ্রাহক
তোমার ডাক্তারের দুখ খালি করে
করব দুখের অবসান।

মৃত্যুশয্যায় পুত্রবধূ হরলিকস গুলে এনে খাওয়াতে চাইলে দাদাঠাকুর বলেছিলেন : চারধারে লিক করছে বউমা—হরলিকস আর কদিন ঠেকাবে? একথা বলার পর হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্ত্রীকে বললেন: 'আর লিঙ্গার করবে না, ফিঙ্গার দেখাবে'।

তাঁকে নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল, তখন তিনি বেঁচে। ছবি বিশ্বাস দাদাঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

১৮৮১-১৯৬৮—দীর্ঘ সাতাশি বছরের জীবনে তার নির্লোভ, নির্ভীক সংগ্রাম, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন রসরসিকতা প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে। সুখের কথা, 'জঙ্গীপুর সংবাদ' আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে শতবর্ষ অতিক্রম করে।

তথ্যসূত্র : *প্রতিদিন* ২ মার্চ ২০১৪

স্মৃতিময় আকাশবাণী

প্রস্তাবনা

খুব ছোটো বয়স থেকেই শুনতাম বেতারের অনুষ্ঠান। বিশেষ করে নাটক। পরের দিন পরীক্ষা থাকলেও। শুনতাম বিজন বসুর বাংলা খবর, শিশুমহল, সংগীত শিক্ষার আসর (পরিচালনা করতেন পঙ্কজকুমার মল্লিক) জয়ন্ত চৌধুরীর গল্পদাদুর আসর, মহিলামহল আরও কত কী? তখন কলকাতা কেন্দ্র থেকে ওড়িয়া সংবাদ প্রচার হত, পড়তেন যতীন দাস। বেতারের সূচনাপর্বে খবর পড়তেন রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শুনতাম কাজি সব্যসাচীর ঘোষণা ও আবৃত্তি। শুনেছি কাজি নজরুলের কণ্ঠও সব্যসাচীর মতো এত ভালো ছিল না। আর প্রতি শনি ও রবিবার এক ঘণ্টাবাপী অনুরোধের আসর।

'পল্লিমঙ্গল' আসরে তখন ছিল জমজমাট তারকা সমাবেশ, পরিচালনা করতেন 'মোড়ল' সুধীর সরকার। এ আসরে 'কাশীনাথ' ও 'গোবিন্দ'-র ঝগড়া তো তখন মিথ হয়ে গিয়েছিল। রবিবারে আর একটি অনুষ্ঠান হত কলকাতা খ-এ 'কলিং অল চিলড্রেন', পরিচালনা করতেন বুলবুল সরকার (যিনি পরে ডেপুটি চিফ প্রডিউসার হয়েছিলেন)। বুলবুলের কণ্ঠ তখন অসাধারণ। 'কলিং অল চিলড্রেন' সেকালের শ্রোতাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করত। শিশুমহলে ইন্দিরাদি অনুষ্ঠান শুধু করতেন—'ছোট্ট সোনা বন্ধুরা সব আদর ভালোবাসা নাও, কি, ভালো আছ তো?' ইন্দিরাদির কণ্ঠ সেকালের শ্রোতাদের খুবই ভালো লাগত। বেলাদির মহিলামহল শুরু হত 'সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসর শুরু করছি' বলে। এই মহিলামহল—তা বেতারের আদিযুগে প্রচার করা হত 'মহিলা মজলিশ' নামে—পরিচালনা করতেন বিষ্ণু শর্মা ছদ্মনামে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তখনকার দিনে সেঅনুষ্ঠানও খুবই জনপ্রিয় ছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্প্রচারের প্রথম যুগে শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন 'সবিনয় নিবেদন' অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানে তাঁর রসরসিকতা শ্রোতারা খুবই উপভোগ করতেন।

বেতারের আদিপর্বে 'গল্পদাদুর আসর' পরিচালনা করতেন হাইকোর্টের উকিল এবং ভারতীয় প্রোগ্রামের ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের বন্ধু যোগেশচন্দ্র বসু। তিনি অনুষ্ঠান শুরু করতেন 'Calcutta Calling—Good Evening Children বলে। গল্পদাদু আফিম খেতেন। বড়ো গোঁফ ছিল তাঁর। ১৯৩৩-এ তাঁর প্রয়াণের পর 'গল্পদাদুর আসর' পরিচালনা করতে আসেন তাঁরই দুই পুত্র কমল বসু ও নির্মল বসু—এঁরা ক্রমান্বয়ে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। শুনেছি, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বেশ কিছুদিন 'গল্পদাদুর আসর' পরিচালনা করেছেন, করেছেন অমিয় চট্টোপাধ্যায়ও। তখন চারটি পর্বে অনুষ্ঠান প্রচার হত—প্রাতঃকালীন, দ্বিপ্রাহরিক, বৈকালিক এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান। মাঝে মাঝে এর যে হেরফের হত না, তা নয়। কোনো কোনো দিন দুটি পর্বেও অনুষ্ঠান প্রচার হত। অবশ্য প্রাথমিক পর্বে 'অধিবেশন' কথাটি চালু হয়নি। প্রথম পর্যায়ে 'বাংলা গান' বলে সব রকমের গানই প্রচার করা হত, অবশ্য ধীরে ধীরে গানের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। সন্ধে সাড়ে সাতটায় ছিল আবহাওয়ার বিজ্ঞাপন, সংবাদজ্ঞাপন, বাজার দর, পাট ও গানির দর। রাতে অনুষ্ঠান শেষে বলা হত, God Save The King Emperor.

প্রথম যুগে দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পন্ডিত) নিয়মিতই 'ছোটোদের বৈঠক' ও 'পল্লিমঙ্গল' আসরে অনুষ্ঠান করতে আসতেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী করতেন 'ঘটনাপ্রবাহ' বলে একটি অনুষ্ঠান। ছোটোদের বৈঠকে ছিলেন 'দাদুমণি' নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মনোমোহন ঘোষ 'চিত্রগুপ্ত' ছদ্মনামে পরিবেশন করতেন 'বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ'। তখনকার দিনে বেতারে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের পুরস্কৃত করতেন ধনী এবং সংস্কৃতিমান কোনো

কোনো মানুষ। এমনিই পুরস্কার পেয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছাড়াও বেতারের আরও অনেকে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ জানিয়েছেন : 'বেতারের আদিযুগে সময়সংকেত জানাবার জন্যে স্টুডিয়োর নিজস্ব একটা ঘড়ি পর্যন্ত ছিল না। একটা কাঁসর জাতীয় ঘণ্টা বাজিয়ে প্রতি অধিবেশনের আগে সময়সংকেত দেওয়া হত। বাজাবার ভার ছিল রাজেনদার (রাজেন্দ্রনাথ সেন) ওপর। পরে গির্জার ঘড়ি থেকে সরাসরি সময়সংকেত রিলে করা হত। আরও পরে স্টেপলটন সাহেব কলকাতা কর্পোরেশনের লিন্ডসে স্ট্রিটের ক্লকটাওয়ার ব্যবহারের ব্যবস্থা করলেন।'

তখনকার স্টেশন ডিরেক্টর স্টেপলটন সম্পর্কে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন : 'অদ্ভুত মানুষ ছিলেন স্টেপলটন। মোটাসোটা মানুষটি যখন জ্বলন্ত চুরুট মুখে ঘুরে বেড়াতেন, তখন তাঁকে তখনকার দিনের ইংরেজি ছায়াছবির ওয়ালেস বেরির মতো দেখাত। স্টেপলটনের মেজাজ ছিল তিরিক্ষি। কথায় কথায় চটে যেতেন আর আমাদের 'অপদার্থ' বলে গালমন্দ করতেন। তবে বাইরেটা গনগনে হলেও ভেতরটা ছিল ঠাণ্ডা, কোমল স্নিগ্ধ' (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র/পুরোনো সেই...) এবং বলতে গেলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এই স্টেপলটনের কাছেই শিখেছিলেন বেতারের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।

১

১৯৬৬-র মার্চে আমি বেতারে যোগ দিই অনুষ্ঠান-ঘোষক হিসেবে। তখন আমার সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন ইন্দিরা দেবী, স্মৃতিকণা বসু, দিলীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, সত্য চৌধুরী, সৌমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ঘোষণার পাশাপাশি আমি বীরেন্দ্রকষ্ণ ভদ্র-প্রযোজিত নাটকে ছোটো ছোটো চরিত্রে অংশগ্রহণ করতে থাকি। মজদুরমন্ডলীতে একটি নিয়মিত চরিত্র 'বসন্ত' হিসেবে নিয়মিতই অংশগ্রহণ করি। পাশাপাশি 'বিচিত্রা' ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতে আরম্ভ করি। তখন আমার ডিউটি পড়ত বেশিরভাগই বিবিধ ভারতীতে। টেপ বাজাতে বাজাতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। এমনই সময় একদিন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কলকাতা 'ক'-এর কিছু কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তখনও বিবিধ ভারতীতে বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু হয়নি। মাত্র সংবাদের আগে-পরে দু-বার ঘোষণা। তা ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেপ বাজিয়ে যাওয়া। স্টুডিয়ো থেকে বেরোলেই চাকরি খতম হয়ে যাওয়ার ভয়। তবু কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে যেতে লাগলাম। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রোগ্রাম-একজিকিউটিভ আমাকে গ্রন্থনা ও অনুষ্ঠান প্রযোজনার সুযোগ দিলেন। তাতে যোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর আনুকূল্যে পেলাম মাঝেমধ্যে নাট্যপ্রযোজনা করার সুযোগ। এবং এই সূত্রেই সবাই আমার সম্পর্কে আগ্রহী হলেন।

তখন মাঝেমধ্যেই কাহিনির নাট্যরূপ করে নাটক বিভাগে জমা দিতাম। তৎকালীন প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ সুনীল মিত্র আমার একটি নাট্যরূপ 'সংশয়' (বিমল করের অবলম্বনে) সম্পর্কে খুবই প্রশংসা করলেন। পরে সে-নাটক আমি নিজেই প্রযোজনা করি, অবশ্য প্রযোজক হিসেবে আমার নাম যায়নি—গিয়েছিল শ্রীধর ভট্টাচার্যের। যাই হোক, নাটকটি বেতারের অনেকেরই খুবই ভালো লেগেছিল। পরে তৎকালীন স্টেশন ডিরেক্টর দিলীপকুমার সেনগুপ্ত নাটকটি শোনেন। এ-নাটকটি আকাশবাণী কলকাতার আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। সত্তর দশকের গোড়ায় আমি বেতার সম্প্রচারের ইতিহাস নিয়ে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান শুরু করি—'বেতারের ফেলে-আসা পাতা'। এতে পর পর কয়েকটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন: আঙুরবালা, অনাথনাথ বসু, পঙ্কজকুমার মল্লিক, ইন্দিরা দেবী, বেলা দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি যখন খুবই জমে উঠেছে তখন একদিন সুপ্রভা সরকার আমাকে ফোন করে অনুষ্ঠানটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। দৈনিক বসুমতীতেও বেরোয় প্রশংসা। পরে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানটির প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকেই বেতারের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করার কথা ভাবি এবং পড়াশোনা ও নানা অনুসন্ধানে মেতে উঠি। তখনও অনেক কিছু জানি না। পুরো ছবিটা অনেক জায়গাতেই যেন পরিষ্কার হচ্ছে না। এইভাবে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে 'সমতট' পত্রিকায় বেরোয় আমার প্রবন্ধ 'ধ্বনির আয়নায় প্রতিফলন' এবং ১৯৯২-তে এপ্রিল-জুনে প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় কিস্তি।

গবেষণা চলতে থাকে। ছুটি ন্যাশনাল লাইব্রেরি, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি এবং অন্যত্র, কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। অনেক পরে কেন্দ্র-অধিকর্তার অনুমতিক্রমে দেখবার সুযোগ পাই 'বেতারজগৎ'-এর বিভিন্ন সংখ্যা। নোট করতে থাকি। আগে আকাশবাণীর সেকালের বহু গুণী মানুষের কাছে যা শুনেছি, তা যাচাই হতে লাগল। আকাশবাণী সম্পর্কে সংবাদপত্রে, বিভিন্ন ম্যাগাজিনে যা প্রকাশিত হয়, তার কাটিং সংগ্রহ করি। মন দিয়ে পড়ি বেতারসম্প্রচার সম্পর্কে নানা বই। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, আমার কাজ শেষ হয় না। এরই মধ্যে আমার সম্পাদিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা 'শিল্পিত শরক্ষেপ'-এ প্রকাশ করতে থাকি বেতারের বিভিন্ন সময়ের অনুষ্ঠান ও তার বিশ্লেষণ। গুণীজন এবং কিছু কিছু পাঠক জানান, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে। উৎসাহিত হয়ে গত দশ-বারো বছর এই কাজ করতে থাকি। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের অনুষ্ঠানটি প্রখরভাবে লক্ষ করতে থাকি। দেখতে দেখতে বহু বিশেষ সংখ্যা এবং শারদীয় বেতারজগৎ পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে পরিশ্রম করতে থাকি। পেয়েও যাই অসংখ্য জরুরি তথ্য। গবেষণা করি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক সম্পর্কে। 'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র : এক কিংবদন্তি, এক নস্টালজিয়া' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয় ২০০৫ খ্রি.। তারপর বাণীকুমারকে নিয়ে এক বিস্তৃত তথ্যবহুল প্রবন্ধ বেরোয়। 'শিল্পিত শরক্ষেপ'-এ প্রকাশিত হয় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সংখ্যার উল্লেখ তথ্য। এর মধ্যে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে বেতার সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ। পুরোনো দিন থেকে আজ পর্যন্ত কীভাবে বেতার কাজ করে চলেছে, তার পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি ফুটে ওঠে আমার লেখায়।

২

বেতারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুনতাম নানা স্মরণীয় অনুষ্ঠান। শুনেছিলাম সাহানা দেবীর সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ), মহিলামহলে প্রচারিত রাজেশ্বরী দত্তর সাক্ষাৎকার এবং 'দ্বিজেন্দ্রলালের গানে পাশ্চাত্য প্রভাব' নিয়ে দিলীপকুমার রায়ের উদাহরণ সহযোগে একটি অনুষ্ঠান। একদিন শুনেছিলাম কুমার গন্ধর্ব ভ্রাতৃদ্বয়ের কণ্ঠে 'ইমন'। আর একদিন সকালে দেখলাম রেকর্ড হচ্ছে সন্তোষ সেনগুপ্তের কণ্ঠে নজরুলগীতি 'হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে'—কী ভালোই যে লাগল। অখিলবন্ধু ঘোষের রাগপ্রধান গান শুনেও একদিন খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কত ঘটনা দেখেছি, বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাইমা-ফেসি রুলিং' দিয়ে আকাশবাণীতে যখন সাক্ষাৎকার দিতে এলেন, তখন আমাকে অনুষ্ঠানটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল। শুনেছিলাম সেই অসামান্য অনুষ্ঠান।

আকাশবাণীতে কাজ করার সুবাদে অনেক সংগীতশিল্পী ও ওস্তাদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল। যাঁদের মধুর ব্যবহার কোনোদিন ভোলবার নয়। তাঁদের কাছে কত কিছু জেনেছি। কেরামত উল্লাহ খাঁ, মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খাঁ, গৌর গোস্বামী, অলোকনাথ দে, শ্যামল বসু, চন্দ্রকান্ত নন্দী, গোবিন্দ বসু, কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ (চানুবাবু), প্রিয়লাল চৌধুরী, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ ভট্টাচার্য, অমৃতলাল রায়, শৈলেন দাস, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, ফণীভূষণ ভট্টাচার্য, ভি. জি. যোগ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ—এঁদের সঙ্গে প্রায় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অলোকনাথ দে এক সাক্ষাৎকারে আমার সম্পর্কে বলেছিলেন : 'অজিতকে কখনোই নন-মিউজিশিয়ান বলে মনে হত না। উনি না থাকলে আমি শিশুতীর্থের সংগীত করতে পারতাম না।'

তখন ওতুলপ্রসাদ না অ-তুলপ্রসাদ? শ্যামল মিত্র না শ্যা-মল মিত্র? লোকগীতি না লোকোগীতি? দেশবন্দনা না দেশোবন্দনা? এ নিয়ে নানা বিতর্ক ছিল। অনেক উচ্চারণ আমাদের মনোমতো না হলেও কিন্তু বলার উপায় ছিল না। আবার কোনো কোনো সংবাদপাঠক উদ্ভট সব উচ্চারণ করতেন। সেসব উচ্চারণ ব্যাকরণসম্মত কি না সে-প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, সে-উচ্চারণ ধোপে টেঁকেনি।

এ প্রসঙ্গে দেবুদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে শোনা একটি গল্প বলি। একদিন ডিউটি অফিসারকে ধাঁধায় ফেলার জন্য কাজি সব্যসাচী ঘোষণা করলেন প্রবীর মজুমদার। ডিউটি অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, কী

বললেন? কাজি অম্লানবদনে বললেন, রবীন মজুমদার। ডি. ও. বললেন, আমি যেন শুনলাম...বলে বিড়বিড় করতে করতে পালালেন। তারপরই সব্যসাচীর কী হাসি। উচ্চারণে ধ্বনিসাম্যে রবীন ও প্রবীর প্রায় কাছাকাছি। ডি. ও. ঠিকই শুনেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ করতে পারলেন না। কারণ, রেকর্ড করা তো নেই।

এমন আর একটি ঘটনা হয়েছিল বিবিধ ভারতীতে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী তখন ডিউটিতে। তিনি ফোনে ডি. ও.-কে জানালেন, রায়চৌধুরীদা (ডি.ও.), আমার পেটে খুব মোচড় দিচ্ছে, একবার টয়লেটে... রায়চৌধুরীবাবু ছুটে স্টুডিয়োতে এসে দেখলেন, সব ঠিকঠাক চলছে। ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি ফিরে এলেন ডিউটি রুমে। অমনি ফোন, দাদা আবার পেটে মোচড় দিচ্ছে, কী করি। ডি.ও. তো মহা ফাঁপরে। তিনি তো ঠিক সময়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবেন না। ডি.ও. আর দেরি না করে ছুটে আইসক্রিম সোডা কিনে এনে স্টুডিয়োতে ঢুকলেন। বললেন, এটা খান, সব ঠিক হয়ে যাবে। পার্থ ঢকঢক করে খেলেন, তারপর পেট চেপে ধরে ডি.ও.কে বললেন, একটু যেন আরাম বোধ করছি। কিন্তু যদি ফের বেগ আসে, একটু সামলে দেবেন প্লিজ।

৩

সংগীত বিভাগের এক অনিয়মিত সেতারশিল্পী (সম্ভবত পরেশ পাল) প্রতি ২৫ বৈশাখে স্টুডিয়োতে রাখা রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মালা দিয়ে চটি ছেড়ে ভক্তিভরে প্রণাম করতেন। সেই থেকে প্রতি ২৫ বৈশাখে কর্তৃপক্ষের তরফে রবীন্দ্রমূর্তিতে মালা দেওয়া হত।

তখন স্টুডিয়োর লাউঞ্জে বড়ো বড়ো সোফাসেট থাকত। শিল্পীরা এখানে বসতেন। আমরাও অনেকসময়ে বসে গল্পগুজব করতাম। পরে কোনো কারণে সোফাসেট ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

পল্লিমঙ্গলের বিখ্যাত সেই 'কাশীনাথ' (আসল নাম ভুবন মুখোপাধ্যায়) যেদিন বাড়ি ফেরার পথে স্ট্র্যাণ্ড রোডে রাস্তায় হার্টফেল করে মারা গেলেন, সেদিন আকাশবাণীর ডিউটিরত কর্মচারীরা শোকস্তব্ধ হয়ে যে যার প্রোগাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি, সত্যেন মিত্র এবং আরও দু' একজন যখন স্ট্যাণ্ড রোডে অকুস্থলে পৌঁছোলাম, তখন বডি মর্গে চলে গেছে। গেলাম সবাই মিলে মর্গে। দেখলাম ভুবনদার নিথর শরীর। শুনলাম, পোস্টমর্টেম হবে কাল সকালে। পোস্টমর্টেমের পর বডি নিয়ে আসা হল আকাশবাণী ভবনে। মালা দিলেন অনেকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানালেন। ভুবনদার এই আকস্মিক চলে যাওয়া কেউই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। মেয়েদের কারুর কারুর চোখে চিকচিক করছিল জল। 'পল্লিমঙ্গল' আসর যেন খুব ফাঁকা হয়ে গেল।

বরুণ হালদার তখন প্রযোজনা করতেন 'রেডিয়ো নিউজ রিল'। একদিন ওঁর সঙ্গে দেখলাম বি.বি.সি.-র এক সাহেবকে। তিনি দেখছেন, কী করে রেডিয়ো নিউজ রিল প্রযোজনা হয়, দেখলেন, খবর সংগ্রহ থেকে স্ক্রিপ্ট লেখা, এডিটিং সব করছে একজন। সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাদের ওখানে (বি.বি.সি-তে) এই একটি প্রোগ্রামের জন্য অন্তত ৫০ জন কাজ করে। উত্তরে বরুণ একটু হেসেছিল, কী আর বলবে! অনেকেই জানেন না, বরুণ ওয়েস্টার্ন মিউজিক বিভাগে প্রযোজনা করেছিলেন ইংরেজি নাটক। এবং বাংলা নাটক 'শ্বেত ময়ূর'-এ অভিনয় করেছিলেন। বরুণের 'মিউজিক্যাল ব্যাণ্ড বক্স' এবং 'লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি' ছিল সেকালের জনপ্রিয়তম অনুষ্ঠান।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠানে (১০০০ কিলোওয়াট) ঘোষণা করার সময়ে আমাদের কণ্ঠ এমন গমগম করত যে, নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এই পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠানে একসময় বাংলাদেশের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। উদ্বোধনে সিগনেচার-টিউন ছিল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

মনে পড়ে, আমাদের বন্ধু প্রয়াত পরিতোষ রায় (দোতারা শিল্পী) একবার বাংলাদেশে গিয়ে রেকর্ড করে আনেন ওখানকার বিখ্যাত শিল্পীদের গান। ওঁর সংগ্রহ করা গান দিয়ে 'বিচিত্রিতা'য় দু-পর্বে প্রযোজনা করেছিলাম 'বাংলাদেশের গান'। সংবাদপত্রে এই অনুষ্ঠানটির খুবই প্রশংসা হয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অবসর নেবার

পরেও আকাশবাণীতে আসতেন 'মহাভারতের কথা' রেকর্ড করতে বা এমনিই। খুবই খারাপ লাগত বাইরে তাঁকে একা বসে থাকতে দেখে। যাই হোক, রেকর্ডিং সূত্রে ভেতরে এসে রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পরেও ডিউটিরুমে বসে সবাইয়ের সঙ্গে গল্প করতেন। একবার ওঁর 'মহাভারতের কথা' লাইভ প্রচারে আমার ডিউটি পড়ল। উনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, আমাকে 'ফেডার' দিয়ে একটু হাতে ইঙ্গিত করবে, তারপর আমি পড়ব। আর শেষ হওয়ার আগেও ইঙ্গিতে জানাবে এক মিনিট আগে। 'মহাভারতের কথা' আগে কয়েক বার বাড়িতে বসে শুনেছি। কিন্তু লাইভ বীরেনদাকে পড়তে দেখে মনে হল, কত বড়োমাপের ব্রডকাস্টার তিনি। এমন মুগ্ধ হলুম যে ঘোষণা করার কথা মনে নেই। বীরেনদা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হাত নেড়ে ঘোষণা করতে বললেন। ঘোষণা করলাম আপ্লুত কণ্ঠে। ফেডার নামাতে বীরেনদা বললেন, এত দেরি করলে কেন? বললাম, হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম আপনি কী অসামান্য ক্ষমতায় মুগ্ধ করে দেন শ্রোতাকে। বীরেনদা হাসলেন। তারপর নস্যির কৌটো বার করে এক টিপ নিয়ে চালান করে দিলেন নাকে।

আমাদের চাকরির প্রথমদিকে কেন্দ্র-অধিকর্তা ছিলেন পি. সি. চ্যাটার্জি। তিনি খুব কড়া মেজাজের লোক হলেও সব কর্মীর প্রতি তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। কে কাজে কতটা সিনসিয়র, তিনি খুব ভালোই বুঝতেন। দক্ষ প্রশাসক ও সংগীতপ্রেমী এই মানুষটি বেতার সম্পর্কে বেশ কয়েকখানি মূল্যবান বই লিখেছেন, যা সমস্ত গবেষকের কাছে এক অমূল্য দলিল। তাঁর সঙ্গে বি.ডি. নাগচৌধুরী, দীপালি নাগ ও সতীকান্ত গুহর খুবই হৃদ্যতা ছিল।

ঋত্বিক ঘটক যখন 'জ্বালা' নাটক করতে এলেন, জানতে চাইলেন অভিনেতা-অভিনেত্রী কাকে কাকে নেওয়া হচ্ছে? শ্রীধর ভট্টাচার্য তালিকা দেখালেন। ঋত্বিকের পছন্দ হল না। শ্রীধর বললেন, এটা এস. ডি-এর অ্যাপ্রুভ কার লিস্ট। ঋত্বিক বললেন, নেহি চলেগা। কালী ব্যানার্জিকো বোলাও, গীতা দেকো বোলাও—। শ্রীধর বললেন, এস. ডি. রাগ করবেন, তুমি একটু কথা বলে নাও। ঋত্বিক কথা বলার আগেই স্টুডিয়োতে উপস্থিত পি. সি. চ্যাটার্জি দূর থেকে হাত নেড়ে বললেন, যা চাইছে তাই করতে দাও। এরপর মিউজিক। ঋত্বিক এক শিল্পীকে বললেন, 'দেশ' বাজান তো। শিল্পী বাজালেন। পছন্দ হল না। ঋত্বিক ডাক দিতে বললেন, প্রবীর মজুমদারকে। এক ঘন্টার মধ্যে কালী ব্যানার্জি, গীতা দে এবং অন্যান্য শিল্পীরা চলে এলেন, সঙ্গে প্রবীর মজুমদার এবং তাঁর পছন্দের যন্ত্রীরা। ঋত্বিক রিহার্সালে বসলেন। কী অপূর্ব তাঁর শেখানোর ভঙ্গি। তৈরি হল এক অসামান্য প্রযোজনা। বেতার-নাটকের দীর্ঘকালের ধারা থেকে এক ডিপারচার। শ্রোতারা ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

তারপরে স্টেশন ডিরেক্টরের নির্দেশে নাট্য বিভাগে ভারপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম একজিটিকিউটিভ ডাক দিলেন বিভিন্ন খ্যাতিমান গ্রুপ থিয়েটারকে।

এলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসিত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ, বাদল সরকার, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, কেয়া চক্রবর্তী, দীপালি চক্রবর্তী, শীলা পাল প্রমুখ একঝাঁক অভিনেতা-অভিনেত্রী। বেতার নাটকে এল নতুন স্বাদ। যোগ হল সামগ্রিকভাবে চলমান নাট্যধারার সঙ্গে, বেতার-নাটকে এল সুস্পষ্ট বাঁক এবং নতুন চেতনা।

৪

আমাদের ঘোষকদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে শংকর ঘোষের কথা। কী ঘোষণায়, কী গ্রন্থনায়, কী অভিনয়ে শংকর ছিল সেরা। আমার প্রযোজিত 'স্ত্রীর পত্র', 'গৃহপ্রবেশ', 'রবিবার', কাব্যনাট্য 'নিশি পাওয়া' এবং অজিত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত 'বিপন্ন উপগুপ্ত' নাটকে তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন স্মরণীয় হয়ে আছে গৌরী ঘোষ অভিনীত 'রবিবার', 'মালঞ্চ', 'গৃহপ্রবেশ', 'শেষের কবিতা'। গৌরীর গ্রন্থনায় অনুষ্ঠান যেন প্রাণ পেত। আর ঘোষণায় ইন্দিরাদির পরে গৌরীই ছিল অনন্যা। গৌরী পরে চলচ্চিত্রেও খুবই যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ মাইক্রোফোনের খুবই উপযোগী ছিল। পার্থ ঘোষও ছিলেন ঘোষক এবং জনপ্রিয় আবৃত্তিকার।

এই আমরা, ঘোষকেরা, মাঝেমধ্যে বিকেলে ক্যান্টিনের পাশে খোলা জায়গায় বসে আড্ডা দিতাম। তারপর কোনো কোনো দিন স্টুডিয়োতে গিয়ে মাইক্রোফোনে আবৃত্তির আসর বসত। এমনি আবৃত্তি, গল্প পাঠ, রসরচনার আসর বসত রাত্রে বনধ, ধর্মঘটে থাকার সময়। ইঞ্জিনিয়াররাও আগ্রহের সঙ্গে রেকর্ড করত এইসব অনুষ্ঠান। তাতে অংশগ্রহণ করতেন দেবদুলাল, শিবু সরকার এবং আমরা ঘোষকরা কেউ কেউ। হাসিঠাট্টা, মজায় কাটত দিনগুলি।

তখনকার দিনেও কোনো কোনো অনুষ্ঠান লাইভ হত। একদিন স্টুডিয়োতে কেউ নেই দেখে ঘোষক দিলীপ ঘোষ ডি.ও.-র কাছে অনুষ্ঠানের টেপ চাইলেন। পজ যাচ্ছে বলা সত্ত্বেও ডি. ও. বললেন, দিচ্ছি, ওঁর চেকটা আগে পেমেন্ট করে নিই। দিলীপ ছুটে এসে টেপ নিয়ে স্টুডিয়োতে চলে গেলেন। আবার এ-ও হয়েছে ২নং স্টুডিয়োতে সন্ধেবেলা বসে আছেন কেন্দ্র-অধিকর্তা পি. ভি. কৃষ্ণমূর্তি। দেখা গেল, উলটো টেপ এসেছে। ডি.ও-কে জানাতে টেপ এল পাঁচ-মিনিট 'ফিলার' বাজাবার পর। রক্ষে এই যে প্রোগ্রাম-একজিকিউটিভ তখনো বাড়ি যাননি।

শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এমনি নিয়মিতই বিকেল পাঁচটার পর ডিউটি রুমে এসে বসতেন। কখনো কখনো স্টুডিয়োতেও বসে দেখতেন, কীভাবে কাজ করে ঘোষক। তিনি কলকাতা কেন্দ্রে এসে ঘোষকদের সঙ্গে এক মিটিং-এ বলেছিলেন, অনেক স্টেশনে কাজ করেছি, কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রের ঘোষণা সবচেয়ে ভালো। শুনে আমরা যে খুশি হয়েছিলাম কী বলব! রাতের ডিউটির কথা বলি। একদিন যথারীতি বিছানা পেতে শুয়ে আছি ৯নং স্টুডিয়োতে। আমার সহকর্মীরা তখন টেবিল-টেনিস খেলছে বাইরে। আমি একা শুয়ে। হঠাৎ টিউব-লাইটটা দপ দপ করতে লাগল। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ দুম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ! ঘুম ভেঙে গেল। দেখি দরজা যেমন তেমনি, খোলা। উঠে ৮নং স্টুডিয়ো পর্যন্ত দেখে এলাম। কেউ নেই, কিছু নেই। ফিরে ফের শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ চটির আওয়াজ—কেউ যেন আসছে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ এল না। টিউব লাইট তখনও সমানে দপ দপ করে চলেছে। তার অনেক পরে সহকর্মীরা ফিরে এলে সত্যিই ঘুম এল। এবং নিশ্চিন্তে।

একবার বনধের সময়ে আমরা কয়েকজন ঠিক করলাম যে প্ল্যানচেট করব। দেবুদা আমাদের লিডার। রাত ২টো অবধি মটকা মেরে শুয়ে সবাই উঠে পড়লাম। A B C D করে Z পর্যন্ত সাজানো হল। আর আমরা। একটা ছিপিতে সবাই হাত রেখে একমনে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এলেন নারায়ণবাবু। আমাদের সবায়ের নাম বলে দিলেন (মানে লেখা মারফত)। বললেন, যখন সেরিব্রাল অ্যাটাক হল, ওঃ সেকী যন্ত্রণা। তারপর এখন আর কোনো যন্ত্রণা নেই। এখন সব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কিছু করার নেই।

এরপর ডাকা হল হেমন্ত বসুকে, ডাকা হল শ্রীধর ভট্টাচার্যকে। শ্রীধরদা বললেন, ড্রামা সেকশনে দুজন প্রযোজক নেওয়া হবে। বললেন, তখন তোমাদের মধ্যে একজন প্রযোজক হবে। সেভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়নি।

তারপর কাকে ডাকি ডাকি করছি, হঠাৎ এসে গেল লতা মঙ্গল। কে, এই লতা মঙ্গল জানি না। ওই বলল, আমি খুব সুন্দরী ছিলাম। সুগন্ধি সেন্ট মাখতাম। ভালোবাসতাম এক শিল্পীকে (গৌরচন্দ্র বসাক)। সেমোটর-অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তারপর আমি এই স্টুডিয়োতে আত্মহত্যা করি। বললেন, আমার কথা জীবিতদের মধ্যে জানে গৌর গোস্বামী। পরে, গৌর গোস্বামীর কাছ থেকে শুনি, ঘটনাটি সত্যি। কিন্তু গৌরদা বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমরা লতা মঙ্গলের কথা জানলে কী করে? তোমাদের তো জানার কথা নয়। আমরা অবশ্য প্ল্যানচেটের কথা চেপে যাই। এ-প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। সেদিন আমাদের এক সহকর্মী স্টুডিয়োতে বিছানা পাতার আগে তানপুরার তারে একটু গুঞ্জন তুলেছিল। অমনি ভুর ভুর করে জস্মিন আতরের গন্ধ! সহকর্মী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই তোমরা কেউ আতর মেখে এসেছ? সবাই বললে, না। ও তখন চেয়ারে রাখা আমাদের জামাপ্যান্ট শুঁকে দেখতে লাগল। পরে বিছানা সরিয়ে পাতার

পরও সেই আতরের গন্ধ! আমরা সবাই সেই জস্মিন আতরের গন্ধ পেলাম সেখানেও। পরে লতা মঙ্গল জানাল, আমি সংগীত ভালোবাসি। তাই তানপুরায় গুঞ্জন তোলার পর ওই আতরের গন্ধ তোমাদের উপহার দিয়েছিলাম। জানালেন, তিনি উচ্চাঙ্গসংগীতের কণ্ঠসংগীত শিল্পী ছিলেন।

আমরা আকাশবাণীতে জয়েন করার সময় ক্যান্টিনম্যানেজার ছিলেন এক অবাঙালি। তখন দশ পয়সায় এক কাপ চা পাওয়া যেত। ক্যান্টিনের ছেলেরা তখন দৈনিক হিসেবে মাইনে পেত। পরে ওদের স্থায়ী চাকরি হয়। অবাঙালি ম্যানেজারের পরে ম্যানেজার হন অনিলবাবু। তাঁর আমলে খাওয়াদাওয়া ভালোই ছিল। এই সময়ে জনৈক গ্রুপ-ডি কর্মী মাখনবাবু ক্যান্টিনের দেখভাল করতেন। পরে তিনি দূরদর্শনে বদলি হয়ে যান। স্টুডিয়ো ট্রান্সমিটারের মধ্যে টেলিলিঙ্ক ফেলিয়োর হলে আমাদের প্রোগ্রাম মেটিরিয়াল নিয়ে তক্ষুনি ছুটতে হত ট্রান্সমিটারে। ট্রান্সমিটার ছিল আমতলায়। সেখানে স্টুডিয়োর মতো সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই পজ যেত, ফিলার বাজানোর সুবিধাও তেমন ছিল না। তবে ইঞ্জিনিয়াররা খুব সহযোগিতা করতেন। কিন্তু বার বার টেলিলিংক ফেলিয়োর হওয়া সত্ত্বেও ভালো টেপডেক বা টার্নটেবল পাঠানো হত না। এ ব্যাপারে কারিগরি কর্মীদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তেমন নড়েচড়ে বসতেন না। ফলে সুষ্ঠু প্রচারবব্যস্থা বজায় রাখা সম্ভব হত না প্রায়ই। তবে ইঞ্জিনিয়ারদের আতিথেয়তার কোনো অভাব ছিল না—ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসত চা, জলখাবার এবং প্রয়োজনে দুপুর বা রাত্রের খাওয়া। এমনই ঘোষকদের কাউকে কাউকে যেতে হত মগরায় বা কাশীপুর ট্রান্সমিটারে। বনধের সময়ও বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন বা দুজন ঘোষককে পাঠানো হত ট্রান্সমিটারে। কলকাতায় যখন ব্ল্যাকআউট, কারফিউ তখনও আমরা অলিগলি দিয়ে হেঁটে অফিসে এসেছি। একবার তো এমনই ফেরার পথে গুলি লাগল আমার থেকে দু-হাত পিছনে এক ভদ্রলোকের পায়ে। আমার লাগেনি। দেখলাম কয়েকজন দ্রুত তাঁকে রিকশা করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেল। ইন্দিরা গান্ধির প্রয়াণেও এমনই ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছিলাম অফিসে, এবং টানা দু-দিন আটকে ছিলাম। ডিউটি থাকলে আমরা ছটফট করতাম সবসময় এবং যে করে হোক অফিসে পৌঁছোতাম। বলতে গেলে এইরকম নানা ঘটনায় বেতার কেন্দ্র প্রায় আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গিয়েছিল।

সেকাল এবং আমাদের কালেও সমস্ত অফিসার এবং প্রযোজকদের বাড়িতে বসে প্রোগ্রাম মনিটর (monitor) করতে হত। শুনেছি কোনো কোনো অফিসার টয়লেটেও রেডিয়ো-সেট নিয়ে যেতেন। প্রোগ্রাম মনিটর করার ব্যবস্থা যতদূর শুনেছি কেন্দ্র-অধিকর্তা বি. কে. নন্দীর আমল থেকে শুরু হয়। প্রতিদিন সকালে নিয়মিত প্রোগ্রাম মিটিং হতকেন্দ্র-অধিকর্তা বা সহকারী কেন্দ্র-অধিকর্তার সভাপতিত্বে। প্রতিদিনই ডিউটিতে থাকার সময়ে ডি. ও. অনুষ্ঠানের গুণমান সম্পর্কে রিপোর্ট দিতেন, প্রোগ্রামমিটিং-এ সেইসব মন্তব্য নিয়ে আলোচনা হত এবং কোনো সময়ে ডি. ও.-র কমেন্ট বদলে দেওয়া হত। এ বিষয়ে ডি.ও.-র মতামত চাওয়া হলে ডি. ও. তা পেশ করতেন। কখনো তা গ্রাহ্য হত, কখনো বা খারিজ হয়ে যেত। ডি. ও. দের মধ্যে বেশ কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা প্রোগ্রামের গুণমান তেমন বুঝতেন না। অতএব সেইসব কমেন্ট ও মার্কিং অনেক সময়েই গ্রাহ্য হত না। রাতের ডিউটিতে ডি. ও.-রাই দেখতেন নিরাপত্তার ব্যাপারটা। কত ঘটনা ঘটত রাতে, যা থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়াত। সেন্ট্রিরা দোতলায় বারান্দায় বসিয়ে রাখতেন বন্দুক হাতে ডামি। তার মুন্ডুটা খুলে নেওয়া যেত। এই মুন্ডুহীন ডামি দেখে কেউ কেউ আজগুবি সব গল্প ফাঁদতেন। একবার হল কী, আমরা (ঘোষক ও ডি. ও.) ভি. আই. পি. রুমে শুয়ে আছি। টয়লেট থেকে ফিরে মাঝের দরজাটা বন্ধ করে শুয়েছি। অমনি দরজাটা ক্যাঁচকোঁচ করে খুলে গেল। আবার বন্ধ করেছি তো আবার খুলে যায়। তারপরই কোথা থেকে ঠক ঠক করে আওয়াজ হতে থাকে। ডি.ও. তো ভয় পেয়ে সিকিউরিটি একজনকে ডেকে আমাদের সঙ্গে শুতে বললেন। আমি বারণ করলাম। কোথাও কিছু হলে কে দায়ী হবে? সিকিউরিটি লোকটা তো আরামে শুয়ে নাক ডাকছে এবং কখনো কখনো গা-ছমছম-করা গল্প বলছে। যাই হোক এইভাবে রাত কাটছে। আমি টয়লেটে যাবার নাম করে দরজা খুলে দেখিঠক-ঠক করে আওয়াজ হচ্ছে তখনও। দরজাটা দুম করে বন্ধ করতেই দেখলাম পাখি উড়ে যাওয়ার মতো শব্দ। আবার খানিক পরে সেই ঠক-ঠক। ওপরে

চেয়ে দেখি দু-একটা পায়রা এয়ারকন্ডিশন মেশিনের ওপর বসে ঠোকরাচ্ছে। ডি.ও.-কে ডেকে দেখালাম। ডি.ও. নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সিকিউরিটির ওই লোকটাকে বলা গেল না চলে যেতে।

এমনই আর একদিন স্টুডিয়োর ভেতরে একটি ঘরে শুয়ে আছি। হঠাৎ মাঝরাতে দুমদাম করে শব্দ। কী ব্যাপার জানতে তালা খুলে বাইরে এসে দেখি আমাদের এক পাহারাদার গিরি প্রবল চিৎকার করছে। দোতলায় উঠে গিরিকে জিজ্ঞেস করতে বলল, ওই দেখুন সব পালাচ্ছে। তামার তার চুরি করতে এসেছিল। গিরিকে বললাম, ধরলে না কেন? ও বলল, আমি একা, ওরা চার-পাঁচ জন, ভাবলাম, যদি গুলি ছোঁড়ে! বললাম, তাই বলে কিছু করবে না? বিল্ডিং-এর সিকিউরিটি তাহলে কে দেখবে? বলে আমরা ফের স্টুডিয়োতে এসে শুয়ে পড়লাম।

স্টুডিয়োতে ঘড়ি ছিল, কিন্তু যদি ঘুমিয়ে পড়ি, কে ডেকে দেবে? এমনিতে আমরা সজাগ থাকতাম, ঠিক সময়েই উঠে পড়তাম। তখন ব্যবস্থা হল রাতের ডিউটিতে থাকা এক সিকিউরিটি ডেকে দেবে। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী সেভোর বেলা একটা হাঁক দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যেত।

সত্য চৌধুরী তখন ঘোষক হিসেবে আমাদের সঙ্গে চাকরি করতেন। ভালো জ্যোতিষ গণনা করতেন। তিনি মুগুর ভাজতেন এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যায়াম করতেন। এককালে ভবানীপুরে শক্তিমান হিসেবে তাঁর খুব নামডাক ছিল। সংগীতেও একসময় তাঁর খুব নাম ছিল। অকৃতদার সত্যদা আমাদের অধ্যাত্মচেতনা নিয়ে অনেক গল্প বলতেন। বলতেন বেতারের পুরোনো দিনের অনেক গল্প। বেতারের অনেক ভুল ধরিয়ে দিতেন, যেমন 'পাঁচ জন ব্যক্তি'—বলতেন 'জন আবার 'ব্যক্তি' কেন?' পাঁচ ব্যক্তি' বললেই তো হয়। বলতেন, ঘোষণার আগে গলা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করবেন না, এতে ল্যারিংসের ওপর চাপ পড়ে। যেমন আছে সেইভাবেই ঘোষণা করুন। সাহস জুগিয়ে বলতেন, আপনার গলা এমনিতে খুব ভালো। দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। একথা আমি সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, তোমার ঘোষণা শুনলে আর্টিস্টরা খুব খুশি হয়। আইটেম ও শিল্পীর নাম পরিষ্কার, ঝকঝকে। সতীনাথদা আমার 'পত্রলেখা' অনুষ্ঠানেরও খুব প্রশংসা করতেন।

সত্যদা বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ-ক্লাসে একদিন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে প্রশ্ন করেছিলাম : 'আঁধাররাতে একলা পাগল যায় কেঁদে, বলে শুধু বুঝিয়ে দে।' কী বোঝবার কথা বলা হয়েছে? অধ্যাপক বলেছিলেন, এ এক অদ্ভুত ধরাছোঁয়ার বাইরেকে বুঝে নেওয়া। বলেছিলেন, এ ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। আমি নাট্যরূপ দিতাম, প্রযোজনা করলাম—কিন্তু সত্যদা বার বার বলতেন, মৌলিক নাটক লিখুন, খারাপ হোক, তবু লিখুন—লিখতে লিখতেই ভালো হবে। আজও মনে পড়ে সত্যদার গান—'পৃথিবী আমারে চায়', 'পথে পথে ওই বকুল পড়িছে ঝরিয়া'। সত্যদা ভালো কীর্তন ও রাগপ্রধান গান গাইতেন। চলচ্চিত্রে একসময় নায়কের ভূমিকায় নেমেছেন। গেয়েছেন ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' নাটকে।

সত্যদা যেমন ঘোষণায় তেমনি ডিউটিতে আসার ব্যাপারে নিজের খুশিমতো চলতেন। আমাদের বলতেন, ঘোষণা করতে গিয়ে একটুও ভয় পাবেন না। শেখাতেন রাগের যথাযথ উচ্চারণ। খেয়ালকে বলতে বলতেন খয়াল (বড়ো 'খ')। একবার প্রোগ্রাম-একজিকিউটিভ বললেন, অনেকের ঘোষণা যেন ঠিকঠাক হচ্ছে না। সত্যদা বললেন, তাহলে বলে দিন আদর্শ কোনো ঘোষকের নাম—আমরা তাকে অনুসরণ করব। প্রোগ্রাম-একজিকিউটিভ নিজে সংগীতের লোক হয়েও শব্দের সঠিক উচ্চারণ মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, খয়াল নয় 'খেয়াল'ই বলা হোক। সত্যদা মাথা চুলকে বললেন : তাহলে 'গোপীকা বসন্ত'-কে কী বলব 'গোপীর বসন্ত', 'মিয়া কি টোড়ি'কে মিয়ার টোড়ি? প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ সেকথার উত্তর দিতে পারেননি। অবসর নেবার কিছুদিন আগে একদিন সত্যদাকে বললাম, রাজভবনের কাছে দেখা হল, আপনি আমায় চিনতে পারলেন না? সত্যদা বললেন, ঠিক দেখিনি। এখন কী হয়েছে জানেন, ডিউটিতে এলেও হয়, না এলেও হয়। একটা বিষাদের ছায়া ওঁর মুখে। বললেন, অন্যমনস্ক ছিলাম, কিছু মনে করবেন না।

'শিশুতীর্থ' প্রযোজনা করেছি। হঠাৎ তিমিরবরণকে দেখে মনে হল ওঁর একটা সাক্ষাৎকার প্রচার করলে ভালো হয়। বললাম ওঁকে। উনি রাজি হলেন। এবং দু একদিন পরে লিখে আনলেন শিশুতীর্থ নিয়ে স্টেজে ওঁর পারফরমেন্সের কথা। আমি বললাম, আপনি শিশুতীর্থ-র যে সংগীতায়ন করেছিলেন গ্রামোফোন রেকর্ডে, সে-সম্পর্কে বলুন। কীভাবে করলেন সেই সংগীতায়নের পরিকল্পনা এবং কীভাবে তা রূপায়ণ করলেন? হকচকিয়ে গেলেন। বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে যায়। পরে, অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঁচ মিনিটের এক সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিলাম ওঁর করা সংগীতের সঙ্গে। প্রচারের কয়েক দিন পরে দেখা হতে বললেন, সবাই প্রশংসা করছে আপনার অনুষ্ঠানের; বলছে, সংগীতে তুমি কী করেছিলে এই অনুষ্ঠান শুনে তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। জানেন, কুড়ি বছর পরে আপনার অনুষ্ঠান মারফত ফের লোকে আমায় চিনলেন। বললাম, তা কেন, আপনাকে চেনে না এমন কেউ আছে? সবাই চেনে। সবাই জানে আপনি কতবড়ো শিল্পী।

আর একবার। করছি 'গৃহপ্রবেশ'। এতে একটা গান ছিল 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে'—গানটি কখনো Echo, কখনো সাধারণভাবে, কখনো নিস্তব্ধতায় বিলম্বিত লয়ে গেয়েছিল শিপ্রা বসু। অপূর্ব মুড তৈরি হয়েছিল। গানটি গাওয়া হয়েছিল সহযোগী যন্ত্র ছাড়া, খালি গলায় এককককণ্ঠে। প্রচারের পরের দিন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় শিপ্রাকে (শিপ্রা তখন ডি.ও.) জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে...' গানটা কে গেয়েছিল তুমি জানো? খুব চেনা বলে মনে হল না। শিপ্রা বলল, আমি। বলে উঠে দাঁড়িয়ে 'একটু আসছি' বলে বিবিধ ভারতীর ডিউটি-রুম থেকে আমাকে ডেকে আনল। বলল, গানটি ওইভাবে গাওয়ার ডিরেকশন দিয়েছিলেন, অজিতদা, অজিত বসু, উনিই প্রযোজক। ওঁরই নির্দেশে গেয়েছিলাম। কণিকা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি? তুমি গেয়েছ? বলে, আমাকে বললেন, আমার খুব ভালো লেগেছে।

পরে, যখন 'পটলডাঙায় পাঁচালি' করছি, তখন রেকর্ডিং-এর আগে সমীর মজুমদার আমাকে একটু বাইরে আসতে অনুরোধ করলেন, বললেন, এতদিন অভিনয় করছি এত ভালো স্ক্রিপ্ট একটাও পাইনি। কাল রাত্রে পড়তে পড়তে মনে হল, তাই আপনাকে জানালাম। চলুন, রেকর্ডিং শুরু করি। সমীরবাবু এ নাটকে 'চঞ্চু' নামে এক দুর্ধর্ষ গুণ্ডার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এমনই 'মৌরিফুল' করার সময়েও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা খুবই প্রশংসা করেছিলেন স্ক্রিপ্টের। শুধু তাই নয়, তাঁরা সমবেতভাবে নাটক বিভাগে গিয়েও একথা বললেন। তারপরই নাট্যপ্রযোজক এলেন আমার কাছে, বললেন, কলকাতা 'ক'-এর জন্য কিছু করুন। বললাম, করব। করেও ছিলাম—'পটলডাঙার পাঁচালি', 'রাজকীয় পদশব্দগুলি' (কাব্যনাট্য), 'নিশিপাওয়া' (কাব্যনাট্য), 'জবাব' এবং অন্য অনেক নাটক।

আবার অনেক আগে যখন 'স্ত্রীর পত্র' করছি, তখন এক বিবাহের দৃশ্যে বেসুরো সানাই ব্যবহার করব বলে স্থির করে আলি আহমেদ হোসেনকে ধরলাম। আমি কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই সানাইটা রেকর্ড করতে চেয়েছিলাম। আলি বললেন, একটা কোনো সাপোর্ট না হলে...। তখন তানপুরার সাপোর্ট নিয়ে করুণ এক সানাই রেকর্ড হল। নাটকে সেই সানাই ব্যবহার করাতে প্রয়োজনীয় নাট্যমুহূর্ত তৈরি হয়েছিল অনায়াসেই।

'স্ত্রীর পত্রে' অসামান্য সংগীত-সংযোজনা করেছিলেন কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ। ইনি এর আগে আমার প্রযোজিত 'সংশয়' নাটকের সংগীতও করেছিলেন। এরপর থেকে অলোকনাথ দে আমাদের অনেক নাটক ও সংগীতালেখ্যতে সংগীত-সংযোজনা করেছিলেন। যখন 'রুদ্ধগৃহ' বলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শন নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করি তখন থেকেই অলোকনাথ দে আমার প্রযোজনায় সংগীত করতে শুরু করেন। আমার প্রযোজিত 'দুঃখরাতের রাজা'—রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা নিয়ে করা প্রযোজনাতেও অলোকনাথ দে অসামান্য সংগীতরচনা করেন। সংগীতের জন্য এ-অনুষ্ঠানে দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। অলোকদা বলতেন, আপনার অনুষ্ঠান থাকলে বাড়িতে একটা ফোন করে দেবেন, আমি যেখানেই থাকি, দুই তিনদিনের মধ্যেই এসে যাব। অলোকদার কান ছিল অত্যন্ত সজাগ, অনেক যন্ত্রের মধ্যেও কোন যন্ত্র নোটেশন ভুল

করছে, ঠিক বুঝতে পারতেন এবং নিজে হাতে রেকর্ডিং করতেন। আমার 'মহাসরস্বতী' সংগীতালেখ্যতে তাঁর ক্ল্যাসিকাল ঢং-এর মিউজিক বিশেষ মাত্রা এনেছিল। যেমন 'রবিবার' নাটকে নাইনথ সিম্ফনির অনবদ্য 'ইমপ্রোভাইজেশন'। যেমন অলোকদা, তেমনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণও বলতেন, 'তোমার অনুষ্ঠান থাকলে এখানে দেখা হলে আমাকে জানাবে, নইলে বাড়িতে ফোন করবে। তোমার প্রযোজনায় একটা বিশেষত্ব থাকে, আমি জানতে চাই।'

একবার বীরেনদা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন বেতারনাটক সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে। পিয়োনকে গাড়ি ডাকতে বলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম, কী বিষয়ে বলবেন? বললেন, 'ট্র্যাজেডি'। বললাম, তা কী বলবেন, একটু জেনে নিই, শিখে নিই। বললেন, আমার ওই কমনসেন্স থেকে বলব। তখন আমি 'ট্র্যাজেডি' সম্পর্কে নানা আলোচনা শুরু করি, বলি, আমরা তো এইসব পড়েছি। শুনে বীরেনদা পিয়োনকে বললেন, অফিস-টাইম, এখন ট্যাক্সি পাবি না। যা, ট্যাক্সি ডাকতে হবে না। বলে আমাকে বললেন, চলো ভেতরে যাই। আমি বললাম, যাবেন না? বীরেনদা বললেন, যাব অন্যদিন। আগে জেনে নিই কী বলব। বলে আমাকে নিয়ে বসলেন ক্যান্টিনে। বয়দের বললেন, দু-কাপ চা দিয়ে যা, আর একদম এদিকে আসবি না। বলে আমাকে বললেন, হ্যাঁ বলো, কী বলছিলে। অতি সংকোচের সঙ্গে বলে গেলাম এক ঘণ্টা। বীরেনদা অবাক হয়ে শুনছিলেন। শেষে বললেন, তুমি এত পড়াশোনা করো। বাহ্। অনেক কিছু জানলাম তোমার কাছে। এরপর ডাক এলে এইসবই বলব।

৬

সত্তরের দশকে আমরা 'বিচিত্রিতা' বলে একটি অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব পাই। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার দুপুরে নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতেন ঘোষকরা। সিংহভাগ অনুষ্ঠানই করতাম আমি। গাড়ি নিয়ে কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে রেকর্ড করে আনতাম। একবার নাট্যাচার্য শিশিরকুমার জন্মশতবর্ষে করলাম শিশিরকুমারকে নিয়ে তিনটি অনুষ্ঠান। কলকাতা 'ক'-এর জন্য 'শিল্পাদিত্য শিশিরকুমার' ১ম ও ২য় পর্ব। বিবিধ ভারতীয় জন্য 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবাদপুরুষ শিশিরকুমার'। এর জন্যে তখন নানা জায়গায় ঘুরে সাক্ষাৎকার রেকর্ডিং করা হতে লাগল। এন. টি. স্টুডিয়োতে রেকর্ড হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জির সাক্ষাৎকার। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (পি. এল. টি.) রেকর্ড করে গেলেন স্টুডিয়োতে। এ ছাড়া মুক্ত অঙ্গনে রেকর্ড করা হল কমল মিত্র, সরযূবালার সাক্ষাৎকার, রঙ্গনায় গণেশ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু ও গীতা দে-র সাক্ষাৎকার। তা ছাড়া শিশির ভাদুড়ির নাট্যাভিনয় ও আবৃত্তির কিছু অংশ সংগ্রহ করেছিলাম পুরোনো দিনের গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে। এ অনুষ্ঠানগুলি অবশ্য বিচিত্রিতায় সম্প্রচারিত হয়নি। তখনকার দৈনিক বসুমতীতে ও আরও অনেক সংবাদপত্রে এর খুবই প্রশংসা করা হয়। বিচিত্রিতায় আমরা প্রায় ৫২টি অনুষ্ঠান প্রযোজনা করি—এর মধ্যে ছিল 'সংলাপ-আবৃত্তি', 'বেতারনাটকের চরম মুহূর্ত' 'তিমির মৃত্যুর কবি জীবনানন্দ', 'চলতি থিয়েটারের গান', 'বাংলাদেশের গান' প্রভৃতি। কিন্তু কোনো এক প্রোগ্রাম-একজিকিউটিভের নির্দেশে এই টেপগুলি ইরেজ করে দেওয়া হয়।

স্বয়ং বীরেন ভদ্রও একসময় এক প্রেস সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর অনেক মূল্যবান টেপ অমনি গোপনে ইরেজ করে দেওয়া হয়েছে।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রয়াণে করেছিলাম 'সূর্য গেল অস্তাচলে'। এতে ব্যবহৃত হয়েছিল অহীন্দ্র চৌধুরীর নানা বিষয়ে আলোচনা, মন্তব্য ও উপদেশ। দু-ঘণ্টাব্যাপী এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন উপেন তরফদার। এই অনুষ্ঠানটিরও ভূয়সী প্রশংসা বেরোয় দৈনিক বসুমতীতে। সেকালের এক মনে রাখার মতো অনুষ্ঠান ছিল এই 'সূর্য গেল অস্তাচলে'।

করেছিলাম 'আবৃত্তি শিল্প'। এতে ছিল দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার। তা ছাড়া কাজি সব্যসাচী, শম্ভু মিত্রর আবৃত্তি। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের একটি অসামান্য সাক্ষাৎকারও এই অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল। কবি তুষার রায়ও বলেছিলেন, বিভিন্ন ধরনের কবিতা আবৃত্তিতে কী কী বিষয়ে নজর দেওয়া

উচিত। অনুষ্ঠানটি আবৃত্তিজগতে বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল. পরে শম্ভু মিত্র আমার কাছে অনুষ্ঠানটির প্রশংসা করে বলেন, আবৃত্তির এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আমাকে ডাকলে না? বলেছিলাম, দ্বিতীয় পর্ব করতে তো কেউ বলেনি। পরে কবি বিষ্ণু দে এই অনুষ্ঠানটি দ্বিতীয় বার প্রচারের আবেদন জানিয়েছিলেন বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে। দ্বিতীয় বার প্রচারের পরেই অনুষ্ঠানটি ইরেজ হয়ে যায়।

কলকাতা 'ক'-এর 'সবিনয় নিবেদন'-এ দীর্ঘকাল শ্রোতাদের চিঠিপত্র নিয়ে আলোচনা করতেন দিলীপ ঘোষ। সুন্দর গম্ভীর কণ্ঠ ছিল তাঁর। খুবই ভালো অনুষ্ঠান করতেন। পরে তাঁর জায়গায় আসেন মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রোতারা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চিনতেন না। কিন্তু ঘোষণা শুনে ঠিক বলে দিতেন কোন ঘোষণা কে করেছেন। এমনই আমারমা-ও চোখে দেখতে পেতেন না, কিন্তু রেডিয়ো শুনে ঠিক বলে দিতেন কার গলা। এমনও চিঠি আসত এই এই ঘোষকদের অনুরোধের আসর, ছায়াছবির গান বাজাতে দেবেন, অন্য কাউকে নয়। শ্রোতারা বলে দিতেন কোন অনুষ্ঠান প্রচারে কী কী ভুল হয়েছিল।

একবার 'যুগান্তর' বেরিয়ে গেল, অমুক দিন অমুক সময়ে গানের পেছনে ঘোষকদের এই কথা শোনা গেছে। অমনি সজাগ হতেন কর্তৃপক্ষ এবং আমরাও। ইঞ্জিনিয়াররা ছুটতেন যন্ত্র মেরামতি করতে। তারপরও লিক হত। স্টুডিয়ো সহকর্মীদের সঙ্গে অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাও বলা যেত না। মনে হত, লিক হচ্ছে না তো? তবে আমাদের কালে খুবই দক্ষ সব ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন। দেখেছি, প্রয়োজনে টেপ-ডেক বা টার্নটেবল পুরো খুলে অল্প সময়ের মধ্যেই মেরামত করতে।

তখন কোনো ফল্ট হলে ডি. ও. যেমন নোট দিতেন, তেমনি দিতেন কন্ট্রোল রুমের কারিগরি কর্মীরাও। ডি.ও. নোট দেবার পরে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতেন, যাতে দুটো নোট ট্যালি করে। আবার কোনো ফল্ট লেখাই হত না। এ ব্যাপারে ডি. ও. ও ইঞ্জিনিয়াররা উভয়পক্ষই পরস্পরকে অনুরোধ করতেন না-লিখতে। স্টুডিয়োতে মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেত। তখন ঘোষকরা গলদঘর্ম হয়ে ঠায় বসে থাকতেন স্টুডিয়োতে, যাতে বিদ্যুৎ এলে সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ জায়গা থেকে অনুষ্ঠান প্রচার চালু করা যায়।

একবার রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে আমরা সবাই মিলে একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম—'২২শে শ্রাবণ', প্রযোজনা করেছিলেন সত্যেন মিত্র। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন অমিয়া ঠাকুর, সন্তোষকুমার ঘোষ ও আরও অনেকে। সম্পাদনা করেছিলেন নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। আমি ও অমিয় চট্টোপাধ্যায় স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছিল রাত ১১টা থেকে সাড়ে এগারোটা। এতে যে-ডোম রবীন্দ্রনাথকে দাহ করেছিল তার একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছিল। ডোমটি বলেছিল, আমার বাবা বলেছিল, বড়ো করে একটা চিতা কাট, এক বিরাট মানুষ আসছে। দেখলাম কাতারে কাতারে লোক, আর সমস্ত পথ যেন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। সেদিনকার 'সংবাদ-পরিক্রমা'-য় এই ডোমের সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি স্ক্রিপ্ট প্রচার করা হয়েছিল। পরদিন সংবাদপত্রে এই ডোমের সাক্ষাৎকার নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যেন সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। দিল্লি থেকে ওই অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট ও টেপ পাঠাবার জন্য নির্দেশ এসেছিল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান, আর একটিও এযাবৎ সম্প্রচারিত হয়নি।

আজও সেকালের অনেক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী আকাশবাণী ভবনে আসেন, জানতে চান এখন কী কী নতুন ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, ভাবেন সেকাল ভালো ছিল, না আজকের অনুষ্ঠান ভালো। ভাবেন, দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না। মনে হয়, কী চমৎকার ছিল সেই পুরোনো দিনগুলি! কাজ করতে করতে কতবার মনে হয়েছে, কবে মুক্তি পাব। সেই মুক্তির পরেও ফের ফিরে দেখতে ইচ্ছে হয় এখন কেমন হচ্ছে আকাশবাণীর সম্প্রচার। মুক্তি চেয়েছিলাম, কিন্তু স্মৃতির শেকড়ে কী এক আচ্ছন্ন টান ব্যথার মতো জড়িয়ে আছে আমাদের, আজ এতদিন পরেও। পুরোনো মুখগুলো মনে পড়ে, কত ঘটনার কথা মনে পড়ে, যার অনেকটাই আজ ফাঁকা। তবু শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে আকাশবাণী।

বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ

এখন আমরা মার্কনির বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্পর্কে ‘চিত্রগুপ্ত’ ছদ্মনামে খ্যাত মনমোহন ঘোষের বেতার জগতে প্রকাশিত একটি রচনা থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

তিনি লিখছেন, কে না জানে গার্গলিনো মার্কনির (Gurglieino Marconi) কথা। সারা পৃথিবী আজ যে আবিষ্কারের ফল ভোগ করছে, যে-আবিষ্কার দূরকে নিকট করে তুলেছে, তার জন্মদাতার পরিচয় বোধ হয় খুব অল্পলোকের জানা। বেতারবার্তা ও বেতার টেলিফোনের আবিষ্কারের জন্য মার্কনিই যে প্রথম জয়মাল্য লাভ করার একমাত্র পাত্র তা বলা যায় না, কারণ তাঁর পূর্ববর্তী কয়েক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সাধনা তাঁর কর্মধারাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করবার যথেষ্ট সুযোগ না দিলে হয়তো তিনি এর ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের বৈদ্যুতিক নীতি ও তার ব্যবহারকে কার্যকরি করে তোলাতেই মার্কনির গৌরব। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হার্ৎস (Hertz) বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে যান, মার্কনি সেই সূত্র ধরেই বেতারবার্তার আবিষ্কার করেন। সেই হিসেবে তাঁকে বেতারের জন্মদাতা বললে ভুল হয় না।

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকদের জীবনের প্রথম দিকে অর্থকষ্টের যে জ্বালা সহ্য করতে হয়, সৌভাগ্যের বিষয়, মার্কনির তা হয়নি। মার্কনির মা ছিলেন এক সুবিখ্যাত আইরিশ গায়িকা, তাঁর পিতা ছিলেন ইতালিয়ান, ১৮৭৪ সালের ২৫ অগাস্ট (Approx) মার্কনির জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানচর্চার দিকে তাঁর এত ঝোঁক ছিল যে তাঁর মা তাঁকে খেলাঘরের বদলে একটি ছোটোখাটো ল্যাবরেটরি বা বিজ্ঞান গবেষণাগার না করে দিয়ে পারেনি। বেতার-জগতে ছাপা হয়েছিল, মার্কনি রোমের অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হবার পর ইতালির ডিরেক্টর ও অন্যান্য সুধীবৃন্দের সঙ্গে তোলা ছবি।

রসায়ন শাস্ত্রের চর্চায় মার্কনি প্রথম মনোনিবেশ করেন। বোলোনা (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিঘির (Righi) সংস্পর্শে এসে তিনি বৈদ্যুতিক গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৬ বছর যখন তাঁর বয়স সেই সময়েই বেতারবার্তা যে সম্ভবপর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি সেই দিকে কাজ শুরু করে দেন। তিনি জানতেন যে, ১৮৫৪ খ্রি. স্কটল্যাণ্ডে ‘টে’ নদীর অপরপারে বিদ্যুতের সাহায্যে বিনা তারে কতকগুলি সংকেত পাঠানো হয়েছিল, এবং ১৮৮২ সালে স্যার উইলিয়াম প্রিস তাড়িত প্রবর্তনের অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করে বেতারবার্তা প্রেরণ করার একটা সংকেত দিয়ে গেছেন।

কয়েক ইঞ্চি দূরে স্থাপিত দুটি সরু কাঠি হয়েছিল তার প্রথম এরিয়েল, পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে দু-মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পড়ল। পরীক্ষার সময় এত ধীরভাবে তিনি কাজ করতেন যে, তাঁকে দেখে মনে হত তিনি একজন সাধক। এত মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল যে, সাধনা ছাড়া সে-তন্ময়তা অত চট করে কারুর পক্ষে আসাই শক্ত। ২০ বছর বয়সে তিনি প্রমাণ করলেন যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ দূরের ব্যবধান, পাহাড়-পর্বতের বাধা কিছুই মানে না। সেই সময়েই তিনি এই আবিষ্কারকে পেটেন্ট করে নেন। তিনি যখন প্রথম বেতারবার্তা ছাড়েন, তখন পয়সা খরচ করে প্রথমে যিনি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, তার নাম শুনলে আপনারা বিস্মিত হবেন—প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন! প্রথমে উইট দ্বীপ থেকে বোর্নারমথ—তিন মাইল ব্যবধানে বেতারবার্তা প্রেরিত হয়েছিল, তারপর হল ৩২ মাইল দূরবর্তী স্থানে। ক্রমশ পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে ১০০ মাইল কিংবা আরও বেশি দূরবর্তী স্থানে বার্তা পাঠানো সম্ভবপর। অধ্যাপক জে. এ. ফ্লেমিং (যিনি ভ্যালব আবিষ্কার করেন) ও মার্কনি সম্মিলিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে বেতারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। তার পূর্বে কয়েকটি জাহাজে বেতার প্রেরণের সাজসরঞ্জাম রাখার ব্যবস্থা ও ব্যবহার করার প্রথা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ইতালির ক্লিমেনটাইন জাহাজে

প্রথম বেতারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। ১৯০১ খ্রি. এই বেতার প্রেরণের ব্যবস্থা থাকার দরুন বিষম দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে মিডোরা জাহাজ বেঁচে যায়। মার্কনির নাম ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের বার্তাও সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি।

এরপর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কনি কেম্প ও মি. প্যাজেটকে নিয়ে আটলান্টিক সমুদ্রে পরস্পরের সঙ্গে বার্তা চালাবার ব্যবস্থা করেন। বার বার ব্যর্থকাম হয়ে ১২ ডিসেম্বর তিনি ওপারের ইঙ্গিত শুনতে পান। তাঁর সহকারী প্রথম বার্তা পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, কিন্তু তাতেও মার্কনির স্থিরতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। পৃথিবীতে এ সংবাদ তিনি দিলেন না। কিন্তু পরের দিনই খবরটা সম্ভবত তাঁর সহকারীর আগ্রহাতিশয্যে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল যে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় বিনা তারে বার্তা শুনতে পাওয়া গেছে।

অনেকে বিশ্বাস করলেন, অনেকে পাগলামি ভেবে মুচকি হাসলেন, কিন্তু মার্কনি কোনো মত প্রকাশ করলেন না, প্রতিবাদও করলেন না।

ফিলাডেলফিয়া জাহাজে চড়ে তিনি আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সহকারীদের বলে গেলেন, মাঝে মাঝে অমুক অমুক সময়ে বেতারবার্তা প্রেরণ করতে, তিনি জাহাজ থেকে শুনবেন।

জাহাজে বেতার প্রেরণ করার সময় অবিশ্বাসী কাপ্তেন পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হাজার মাইল দূর থেকে মহাসমুদ্রের বুকে আবার এক অজ্ঞাত শব্দতরঙ্গ যখন ইঙ্গিত দিতে লাগল, তখন ফিলাডেলফিয়া জাহাজের প্রত্যেক যাত্রী বিস্মিত হয়ে গেল। এইভাবে বিস্ময়ের মাত্রা বর্ধিত হতে হতে বেতারের বর্তমান পরিণতি সম্ভবপর হয়ে উঠল। আজ হয়তো নতুনত্বের বিস্ময় কারুর মনের কোণে ফুটে ওঠে না, কিন্তু যেদিন প্রথম আপনারা বেতার শুনেছিলেন, সেদিনের আনন্দের কথা স্মরণ করুন। আজ গৃহে বসে স্বল্পব্যয়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তের সংবাদ যিনি মুহূর্তের মধ্যে ঘরে আনার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন, তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এ প্রবন্ধের উপসংহার করছি। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি একটি বড়ো দামি কথা বলে গিয়েছেন এই যে, জগতে এমন কোনো সমস্যা নেই, যা কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে সমাধান করা যায় না। ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকদের প্রতি উপদেশ দিয়ে তিনি বলে গেছেন যে, বিশ্বের সুবর্ণময় যুগের প্রথম দীপশিখা জ্বালিয়ে গেলাম, এখনও বহু দীপ জ্বালতে হবে, তোমরা সে-ভার নাও।

রেডিয়ো

রেডিয়ো কথাটা ইংরেজি ‘Radiate’ থেকে এসেছে। Radiate মানে হল, চারিদিকে কিছু বিকিরণ বা ছড়ানো। তাই থেকে ‘রেডিয়ো’ কথার তাৎপর্য হল এবং তার মানে হল যে জিনিসটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

এরিয়েল

যাদের বাড়িতে রেডিয়ো আছে, তাঁরাই জানেন, তাঁদের বাড়িতে সাধারণত ছাদের ওপর বা অন্য কোনো উঁচু জায়গায় একগাছা তামার তার লম্বাভাবে টাঙানো থাকে। সেই তারের একটা মুখ ঘরের ভেতরের রেডিয়ো গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো থাকে। এর কাজ হল ইথারের ভেতর দিয়ে বেতারের যেসব ঢেউ আসছে, তাদের ধরে বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে পৌঁছে দেওয়া। এই তারকে বলে Aerial।

ইথার

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ‘ইথার’ হচ্ছে, বাতাসের মতো অদৃশ্য এক পদার্থ, যা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ডকে ব্যেপে আছে। এই ‘ইথার’ আছে বলেই বাতাসে বিদ্যুৎতরঙ্গ উঠে আমাদের কানে এসে লাগে, আমরা শুনতে পাই। রেডিয়ো হচ্ছে এই ইথারের আন্দোলন।

আর্থ

এরিয়ালের তার ছাড়া আর একটা তার গ্রাহক-যন্ত্রে লাগানো থাকে। এরই নাম হচ্ছে মাটির তার বা Earth অথবা Ground-এর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই তারের অন্য মুখ জমির সঙ্গে লাগানো থাকে।

মাইক্রোফোন

যে যন্ত্রটির সামনে কথা বলা বা গান গাওয়া হয়, তাকে ‘মাইক্রোফোন’ (Microphone) বলে। এই মাইক্রোফোনের কাজ হল যে, এর সামনে যে শব্দ হবে, তাকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা। বেতার-প্রেরক যন্ত্র আবার সেই সামান্য বিদ্যুৎশক্তিকে প্রবল-শক্তি ইথার তরঙ্গে পরিণত করে। সেই ইথার তরঙ্গ ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে এসে আমাদের বাড়ির এরিয়ালে আঘাত করছে। এরিয়াল বেয়ে সেই ঢেউ রেডিয়ো-সেটে আবার বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। সেই বৈদ্যুতিক শক্তি লাউড স্পিকারের সাহায্যে আবার শব্দে পরিণত হচ্ছে।

বেতারে রবীন্দ্রনাথ

১.

তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো সংবাদ রেডিয়োতে প্রচার হত না। দিলীপ মালাকার তাঁর একটি প্রবন্ধে (‘কলকাতা বেতার কেন্দ্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ’) লিখেছেন : ‘(তখন) দুজন বুখারি ভাই মিলে রেডিয়োর ওপর মহলে ডান্ডা ঘোরাতো। ....ত্রিশের দশকের শেষের দিকে দেশ ভাগ হলে তাঁরা চলে যান পাকিস্তানের লাহোর রেডিয়োতে। এদের আমলে আমরা বেতার কেন্দ্রে একদিনের জন্য নেতাজি সুভাষ বসু এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনো খবর বা কথিকা শুনিনি। তাঁরা বরাবর নেতাজি সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের খবর ব্ল্যাক আউট করেছিলেন।.... চল্লিশের দশক, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজি পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের খবর শোনার জন্য আমরা রেডিয়োয় কান পেতে উন্মুখ হয়ে থাকতাম। আজাদ হিন্দ ফৌজের রেডিয়ো-স্টেশন কত নম্বরে পাওয়া যাবে সেখবর আমাদের জানা ছিল না। আমাদের মধ্যবিত্ত বাড়ীতে যে সাদামাটা রেডিয়ো সেট থাকতো, তাতে রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কখনো সখনো নেতাজির গলা শোনা যেত।...’

তখনও রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য-সংগীত জনপ্রিয় হয়নি। বরং আধুনিক গানের চল ছিল বেশি।... দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও তার পরে রেডিয়োতে খবর লেখা ও পড়া হত ‘সরকারি নির্দেশে কাটাকুটি করে’।...

১৯৩৬-এর মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন দিল্লিতে বিশ্বভারতীর প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন, তখন বেতার কর্তৃপক্ষের আগ্রহাতিশয্যে দিল্লি কেন্দ্র থেকে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। সেই প্রথম এদেশে বেতারযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত হল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর। ১৯৩৭-এর প্রথম দিকে নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বেতারপ্রচারের প্রসঙ্গটি তুললেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বেতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন, তথাকথিত কয়েক জন ‘রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ তাঁর গানের ওপর স্টিম-রোলার চালাচ্ছেন।’ নৃপেন্দ্রনাথ তখন কেন্দ্র-অধিকর্তা স্টেপল টনকে একথা জানালে স্টেপলটন এই বিষয়টি তৎকালীন ‘কন্ট্রোলার অফ ব্রডকাস্টিং’ লায়োনেল ফিলডেনের নজরে আনেন। ফিল্ডেন একথা জেনে মর্মাহত হয়ে জানালেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কলঙ্কের যেন ইতি হয়, এটাই তাঁর ইচ্ছে। ফিল্ডেন শুধু কাগজে-কলমে পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত রইলেন না, দেশের গুণীজনদের সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করলেন। তিনি এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বোধ হয়, এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কলকাতা বেতারের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

পরে নৃপেন্দ্রনাথের নির্দেশে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র গেলেন শান্তিনিকেতনে। ক্ষিতিমোহন সেনকে বললেন সব কথা। ক্ষিতিমোহন বললেন, বীরেনবাবু, আপনার উদ্দেশ্য এখন সফল হবে কি না জানি না, কারণ ওর শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। তা-ছাড়া কিছুদিন পরেই উনি দার্জিলিং চলে যাচ্ছেন, অতএব এখন বোধ হয় উনি ওখানে, বেতার কেন্দ্রে যেতে পারবেন না, এখান থেকে যদি কিছু করাতে পারেন দেখুন।

উত্তরায়ণে দেখা হল কবির সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ একটি ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন—অপূর্ব প্রশান্ত মূর্তি—সকাল বেলার অজস্র আলো পাথরের মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ছে, একটি ক্রিম রঙের আলখাল্লা পরে তিনি বসেছিলেন। সামনে খান দুই চেয়ার। পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়াতে, তিনি বসতে বললেন। ক্ষিতিমোহন পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কবি তাঁর স্বভাবস্নিগ্ধ মিষ্ট স্বরে বলে উঠলেন, দ্যাখো, তোমাদের এই রেডিয়ো যন্ত্রটি ভবিষ্যতে অনেক উৎপাত বাধাবে বুঝতে পারছি, ওর মধ্যে আর আমাকে টানাটানি কেন? আমার শরীর অপটু—তা ছাড়া বাইরে যাচ্ছি, অনেক লেখার কাজ রয়েছে—তাই, এখন তো সময় হবে না।

কবি বললেন, 'আমার গানের একটা নিজস্ব সুর আছে, সেটা যদি কোনো শিল্পী তাঁর খুশীমতো অদল-বদল করে তাহলে মনে হয়, সকলে মিলে আমার ওপর উৎপীড়ন করছে। ও-দিকটায় একটু লক্ষ রেখো তোমরা।'

১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা কেন্দ্রের তৎকালীন কেন্দ্র-অধিকর্তা সেটপলটন দীর্ঘ ছুটি নিয়ে স্বদেশে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় অস্থায়ী স্টেশন-ডিরেক্টর হিসেবে কাজে যোগ দিলেন অশোককুমার সেন, —রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে যাঁর ছিল অপরিসীম অবদান।

১৯৩৮-এর গ্রীষ্মকালে অশোককুমার সেন শান্তিনিকেতনে গেলেন—উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তরায়ণে থাকতেন। চায়ের আসরে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীসেন রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠু প্রচার সম্পর্কে কবি উদাসীন কেন? রবীন্দ্রনাথ উত্তরে জানালেন, অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর স্টুডিয়োর মধ্যে হারমোনিয়ামের দৌরাত্ম্য চলতে থাকলে তার আঘাতে তিনি রবীন্দ্রসংগীতকে হত্যা করতে দিতে মোটেই রাজি নন। কবির ক্ষোভের কথা শুনে শ্রীসেন বিনীতভাবে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন যে, ফিল্ডেনের কাছে তাঁর এই আপত্তির কথা জানাবেন এবং ফিল্ডেন নিশ্চয়ই এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। শ্রীসেনের মনে হয়েছিল যে, তাঁর এই প্রতিশ্রুতির ফলে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবং কবি স্বীকারও করলেন যে, রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের ব্যাপারে বিশ্বভারতীরই সক্রিয় সহযোগিতা করা উচিত। অশোককুমার সেন তখনই সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে যে-কজন সম্ভব শিল্পী নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠালেন। প্রথমে বারোজন শিল্পী নির্বাচন করা হল, যাঁদের মধ্যে ছিলেন অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা, (পরবর্তীকালের স্বনামধন্য চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী ও পরিচালিকা)। হারমোনিয়াম বর্জনের নির্দেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছেছিল আরও এক বছর পরে।

প্রসঙ্গত বলি, বেতার থেকে হারমোনিয়াম চলে যাওয়ার মূল কারণ, রবীন্দ্রনাথ চাইতেন না যে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজুক। ঘটনা এই পাকাপাকিভাবে বেতার কেন্দ্র থেকে হারমোনিয়াম বিদায় নিয়েছিল ১ মার্চ, ১৯৪০। আবার হারমোনিয়াম ফিরে এসেছে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে ৯ জুলাই, ১৯৭৫, যেদিন প্রখ্যাত হারমোনিয়াম-বাদক মণ্টু ব্যানার্জি এককভাবে হারমোনিয়াম বাদনের অনুষ্ঠান প্রচার করে শোনান। তারও কিছু আগে থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর থেকে সংগীতের সঙ্গে সহযোগী যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়ামের সহায়তা আকাশবাণীর নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কিছু শিল্পী পেয়ে আসছেন। আকাশবাণী কলকাতার প্রথম দশকে মণীন্দ্রমোহন ব্যানার্জি, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মণ্টু ব্যানার্জি, সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মুনেশ্বর দয়াল প্রমুখ শিল্পী হারমোনিয়াম বাজিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হারমোনিয়াম একসময়ে যে কারণে বেতার কেন্দ্র থেকে বিদায় নিয়েছিলসে-কারণগুলির কয়েকটি আজও আছে। হারমোনিয়াম প্রস্তুত প্রণালীতে অনেক উন্নতি হয়েছে, কারিগরি দক্ষতায় হারমোনিয়ামের সুর ও স্বর অনেক শ্রুতিমধুর হয়েছে, বেতার মাধ্যমে সংগীতসহ তার প্রচার তবুও কতটা শ্রবণ-সুখকর তা এখনও অমীমাংসিত।...

হারমোনিয়ামের সপক্ষে ও বিপক্ষের মতগুলি এখন বিচার করে দেখা যাক। প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ কোনো এক জায়গায় লিখেছিলেন যে, আজ ঠুংরির যে চমক ও রং তা হারমোনিয়ামের কল্যাণেই অনেকটা প্রসারিত হয়েছে। হারমোনিয়াম বাজানোর মাধ্যমে দক্ষ শিল্পীর হাতে কল্পনার রং কতখানি প্রসারিত হয়ে যায় এবং যে-নোট গায়ক কণ্ঠে প্রকাশ করার কল্পনাও করেননি, হারমোনিয়াম সংগতের মাধ্যমে সেই সুর ও স্বর বৈচিত্র্যের প্রকাশ আশা করি রসিক ও সমঝদার শ্রোতার দৃষ্টি এড়ায় না। কে না হারমোনিয়াম সহযোগে গান করেছেন? চোখের সামনে দেখলাম ফৈয়াজ খাঁ, গোলাম আলি, আমির খাঁ, বেগম আখতারকে। এ হল উত্তর ভারতে। অন্য দিকে দক্ষিণের চেম্বাই বৈদ্যনাথ, এস. জি. কিটাপ্পা, বি. এস. রাজা

আয়েঙ্গার প্রমুখ। লঘু সংগীতে বা লাইট ক্ল্যাসিকাল গানে তো কথাই নেই। সেখানে হারমোনিয়াম হচ্ছে মাস্ট। হারমোনিয়াম সেখানে 'কানু'।

বেতারে সাধারণ শিল্পীদের অর্থাৎ বেতারের ভাষায় যাঁরা বি-গ্রেড, এমনকি বি-হাই যাঁরা, তাঁদের হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাওয়ার অনুমতি এখনও দেওয়া হয়নি। শিল্পীদের একাংশের অভিমত, যাঁরা বেতারের তথাকথিত বি বা বি-হাই গ্রেড শিল্পী, তাঁদের যদি হারমোনিয়াম সহযোগে গাইতে দেওয়া হয়, তাহলে গানের কালার পালটে যাবে।

অপর পক্ষ অবশ্য মনে করেন দুর্বল শিল্পীরা নিজেদের কণ্ঠের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করবেন হারমোনিয়াম সহযোগে। যদি তা-ই হয়, ক্ষতি কী? কে না চায় দুর্বলতা ঢাকতে। আমরা, শ্রোতারা ভালো গান শুনতে চাই। দুর্বলতা ঢেকে যদি তা করা সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই ভালো হবে।

হারমোনিয়ামের অসুবিধার কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের অভিমত হচ্ছে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে শ্রুতির যে স্থান রয়েছে, রাগ-রাগিণীর ক্ষেত্রে হারমোনিয়ামে তার প্রকাশ সম্ভব নয়। কারণ, হারমোনিয়ামের স্বর ও শ্রুতি নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁধা। অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী এ নিয়ে তর্ক করা চলে এবং তাতে কথাটা ঠিক প্রমাণিত হবে। কিন্তু সংগীতে রসের যে স্থান, কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে হারমোনিয়াম সহযোগিতায়, কিংবা একক যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম বাজানো সংগীতে রসসৃষ্টির কখনো হানি হবে না।

মালকোষের গান্ধার-নিষাদ অথবা পুরিয়ার রেখাব ও হারমোনিয়ামে যেভাবে গান্ধার-নিষাদ-রেখাবের অবস্থান আছে, তুলনায় শ্রুতিগতভাবে অঙ্কের হিসেব অনুসারে তফাত হলেও কর্ণ-শ্রুতির পক্ষে খুব তারতম্য ঘটায় না। বিশেষ করে যখন গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম অথবা সারেঙ্গির সহযোগিতা হয় তখন গলার এবং যন্ত্রের সহাবস্থান প্রায়ই হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। সুতরাং সেখানে হারমোনিয়ামে শ্রুতি প্রকাশ অসম্ভব, এ শুধু তর্কের জন্যই তর্ক।

গণপতি রাও ভাইয়া সাহেব, গোবিন্দ রাও ও টেনে প্রমুখ দক্ষ হারমোনিয়ামবাদকরা দেখিয়েছেন যে সূক্ষ্ম কাজ গমক ইত্যাদি প্রকাশও হারমোনিয়ামে কতখানি সম্ভব বেলোর হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, লঘু-গুরু সমন্বয়ে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে হারমোনিয়ামে কত বৈচিত্র্য সম্ভব। তা কি আমরা বাংলাদেশেই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ধীরেন মিত্র, মণ্টু ব্যানার্জির কাছে শুনিনি। আজকাল হারমোনিয়াম প্রস্তুত প্রণালীতে এত উন্নতি হয়েছে যে, ফৈয়াজ খাঁর যুগে সংগীতে যদি তাঁর আগে হারমোনিয়াম শ্রোতার আনন্দবর্ধন করে থাকে, তাহলে আজকের দিনে তো অবশ্যই করবে।

যাই হোক, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল রাত্রের খবরে এবং ১৯ এপ্রিল সকাল ৬-২০ মিনিট বাংলা খবরে বলা হয় যে, আকাশবাণী থেকে আবার সব শিল্পীরা হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে পারবেন।

২

জন্মদিনে কবির বিশেষ বাণী প্রচারের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে রাজি করিয়েছিলেন অশোক সেন। এজন্য শান্তিনিকেতনে বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানের জন্য লাইনে সংযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু জন্মদিনের কয়েক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন কালিম্পং-এ। অশোক সেন কালিম্পং-এ গিয়ে কবির বাণী কালিম্পং থেকেই কলকাতা বেতারে রিলে করার ব্যবস্থা করলেন। আগেই এসেছিলেন প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ। কালিম্পং-এ ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হল। ঠিক হল, রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই লেখা 'জন্মদিন' কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। অনুষ্ঠানের সময়সীমা ১৫ মিনিট। ইঞ্জিনিয়াররা সব পরীক্ষা-টরিক্ষা করে নিলেন। রাত ৮টা—ঘরে একটি বেল বেজে উঠল। যন্ত্রের সামনে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন কবি। কাচের দরজা বন্ধ। কবিকণ্ঠ পাশের ঘর থেকে কলকাতা হয়ে কালিম্পং-এসে আবার ধরা পড়বে। উপস্থিত সবাই রোমাঞ্চিত। লাল আলো জ্বলে উঠল। কবি পড়তে শুরু করলেন :

আজ মম জন্মদিন।
সদাই প্রাণের প্রান্তপথে

ডুব দিয়ে উঠেছে সে
বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।...

পরিমল গোস্বামী ১৯৩৭-এ কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে শুনেছিলেন এই কবিতাটি। তিনি লিখেছেন : 'রবীন্দ্রকণ্ঠে কাব্যের আবৃত্তি প্রথম শুনে ছিলাম ১৯১৭ সালে এবং তাঁর শেষ আবৃত্তি শুনলাম রেডিয়োতে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে।...

'জন্মদিন' অবিস্মরণীয় আবৃত্তি। এবং তার প্রতিটি কথার উচ্চারণে, অর্থে, ইঙ্গিতে এবং ধ্বনিতে শুধু নয়, কবিতাটির অন্তরে এমন এক গভীর বেদনার প্রকাশ ছিল, যার জন্য এ আবৃত্তি অবিস্মরণীয়। সমস্ত মিলে কী অদ্ভুত অনুভূতি! এখনও মনে পড়লে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। জীবন ধন্য মনে হয়েছিল সেদিন। মুখে ভাষা ছিল না, চোখে জল এসেছিল আনন্দে। শোনবার সময় মাঝে সত্যিই ভয় হচ্ছিল কবির হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে না যায়, এমন ঝড় উঠেছিল সেদিন তাঁর কণ্ঠে।'

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার উদ্বোধন হল। এই উপলক্ষ্যে ঠিক হল, 'বেতার জগৎ'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা পাওয়ার জন্য 'বেতারজগৎ'-এর তৎকালীন সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারকে শান্তিনিকেতন যেতে হয়েছিল, সঙ্গে ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। কিন্তু বিফলমনোরথ হয়ে তাঁদের ফিরে আসতে হল। কলকাতায় আসার তিন দিন পরে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর একখানি চিঠি এল। সুধাকান্ত লিখেছেন—আপনি চলে যাবার পরই কবি এই কবিতাটি রচনা করে আমায় নির্দেশ দিলেন আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে। কবিতাটি 'বেতারজগৎ'-এর সেই বিশেষ সংখ্যায় সম্মানের সঙ্গে মুদ্রিত হল। কবিতাটি হল :

ধরার আঙিনা হতে ওই শোনো
উঠিল আকাশবাণী।
অমরলোকের মহিমা দিল যে
মর্ত লোকেরে আনি।...
শান্তিনিকেতন
৫ আগস্ট, ১৯৩৮

এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও শেষ বাণী 'বেতারজগৎ'-এর জন্য। ১৯৩৯, কবি তখন শান্তিনিকেতনে। কলকাতা বেতারের সঙ্গে তখন রবীন্দ্রনাথের এক আন্তরিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। কবি শান্তিনিকেতনে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের একটি সহায়ক স্টুডিয়ো চালু করার জন্য অনুরোধ জানালেন। লাওনেল ফিল্ডেনের কাছে অশোককুমার সেন এই অনুরোধ জানাতে তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। কিন্তু ডাক ও তার বিভাগের চরম ঔদাসীন্যের ফলে সে-প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। অনেক পরে দেশ স্বাধীন হবার কয়েক মাস আগে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেলকে অশোককুমার রবীন্দ্রনাথ যে অনুরোধ করেছিলেন তার কথা জানালে তিনি প্রস্তাবটি কার্যকর করতে বিশেষ আগ্রহী হন এবং শান্তিনিকেতনে কলকাতা বেতারের একটি সহায়ক স্টুডিয়ো চালু করা হয়।

অশোককুমার সেনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একবার 'শেষের কবিতা'-র বেতার নাট্যরূপ কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের অনুমতি দেন। অসুস্থ অবস্থায় 'শেষের কবিতা'-র অভিনয় শুনে অশোককুমারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। 'শেষের কবিতা'-য় অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা দেবী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এর আগে প্রথম যুগের বেতারে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রথম রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্যাপন হয় রবিবার ১৯৩১-এর ১০ মে। তারও আগে ১৯৩০ এর ১০ জানুয়ারি শুক্রবার বেতারে পরিবেশিত হয় 'চিরকুমার সভা'। এতে বীরেন ভদ্র অভিনয় করেন চন্দ্রের ভূমিকায়, 'রসিক' করেছিলেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং 'অক্ষয়' চরিত্রে রূপদান করেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই বছরেই

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে বাঁধা মঞ্চ থেকে রিলে করা হয় 'তপতী'। এতে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'-র ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'গৃহপ্রবেশ' অভিনীত হয় ২৫ এপ্রিল, ১৯৩০। এতে 'যতীন'-এর ভূমিকায় ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। ১৯৩১-এর ৯ জানুয়ারি শুক্রবার সম্প্রচারিত হয় 'শোধবোধ'। ১৯৩৬-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রযোজিত হয় 'শোধবোধ', এতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ করেছিলেন 'সতীশ', পরিচালনার দায়িত্বেও ছিলেন তিনিই। 'শেষরক্ষা' সম্প্রচারিত হয় শুক্রবার ১৯৩৬-এর ১১ ডিসেম্বর। এতে বীরেন ভদ্র করেন 'চন্দ্রকান্ত'। ১৯৪৪-এর ৬ সেপ্টেম্বর অভিনীত হয় 'মাল্যদান'। এ ছাড়া 'ঘরে বাইরে' প্রযোজনা করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। 'শেষরক্ষা' পরে, অভিনীত হয়েছিল যশস্বী সাহিত্যিকদের দ্বারা। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অমল হোম, প্রমথনাথ বিশী, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), নীলিমা সান্যাল, লয়লা খান ও বাণী রায়। ১৯৩৮-এর ৮মে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' অনুষ্ঠানে ছিল অশোকনাথ শাস্ত্রীর স্বস্তিবাচন। তারপর সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় যন্ত্রিসংঘ সংগীতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। আর অনাদিকুমার দস্তিদারের পরিচালনায় 'রবীন্দ্রগীতি বাসর'-এর সদস্যবৃন্দ সম্মেলক ও একক কণ্ঠে শোনালেন ব্রহ্মসংগীত—'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি', বর্ষাসংগীত—'পূর্ব সাগরের পার হতে', শরৎসংগীত 'শেফালি বনের মনের কামনা', বসন্তসংগীত—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', ভানুসিংহের পদাবলি—'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' এবং প্রেমসংগীত—'ও যে মানে না মানা'।

৩

এরপর, রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে। ১৯৩৯-এর মে মাসে কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেতারে তাঁর বাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সেবার পুরীতে গিয়েছিলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার পি. কে. দেব ও অশোককুমার সেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সার্কিট হাউসে। প্রথমে তাঁর পড়বার ঘরে রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা হল। কিন্তু রেকর্ডিং-এর পরে নিজের আবৃত্তি শুনে কবি সন্তুষ্ট হলেন না। ঘরটি ছিল ছোটো আর আবদ্ধ, যা রেকর্ডিং এর পক্ষে উপযুক্ত নয়। তারপর রেকর্ডারটি নিয়ে যাওয়া হল দোতলায়। রবীন্দ্রনাথ এবার বেঁকে বসলেন। কারণ সমুদ্রগর্জনের পটভূমিকায় রেকর্ডের আওয়াজ পানওয়ালার দোকানে চোংওয়ালা গ্রামোফোনের বিকৃত শব্দের মতো মনে হবে। তখন কবিকে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে শোনানো হল। শুনে তিনি কিছুটা খুশি হলেন। এরপর তিনি একটি কবিতা রেকর্ড করাতে রাজি হলেন। শেষ পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিতে মোট আটটি কবিতা রেকর্ড করলেন। এই রেকর্ডের একটি 'সেট' কবিকে পরে উপহার দেওয়া হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। তিনি মহা খুশি হয়ে তাঁর স্বাক্ষরিত একটি পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্র (বুলা মহলানবিশের তোলা) উপহার দেন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর কলকাতা কেন্দ্রকে।

কিন্তু সমস্যা হল 'প্রশ্ন' কবিতাটি নিয়ে। কবিতাটির রচনাকাল ১৩৩৮ সালের পৌষ মাস। নলিনীকান্ত সরকার ভাবলেন, এ রেকর্ড রেডিয়োতে বাজবে কী করে? সারা ভারতে তখন একদিকে মহাত্মা গান্ধির প্রকাশ্য অহিংস-আন্দোলন, আর অন্য দিকে বাংলার রক্ত-পাগল বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম। সীমাহীন অত্যাচার চালাচ্ছে ব্রিটিশ পুলিশ আর গোয়েন্দারা। কিন্তু যথানির্দিষ্ট দিনে ব্রডকাস্ট করা হল রেকর্ডিংটি বিনা দ্বিধায়, বিনা আপত্তিতে।

১৯৩৯ সালে কবির জন্মদিবস পালিত হয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে : রবীন্দ্রবাণী কালিম্পং থেকে রিলে করে শোনানো হয়, কবির জন্মদিনে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি করেন, গ্রামোফোন রেকর্ডে বিভিন্ন শিল্পীর রবীন্দ্রসংগীত বাজানো হয়, পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাটক—'রক্তকরবী'।

এই ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি সময়ে ঘটল একটি ঘটনা। ব্রিটিশ রাজদম্পতির কানাডা পরিদর্শন উপলক্ষ্যে কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ভারতবর্ষ থেকে কোনো হাতির মাহুত বা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটে—এমন কোনো জাদুকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক মিনিটের অনুষ্ঠান তৈরি করে পাঠাবার অনুরোধ করে। ফিল্ডেন এ প্রস্তাবে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন। দিল্লি থেকে ট্রাঙ্ককল করে ফিল্ডেন অশোককুমার সেনকে বললেন যে, তিনি কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের বড়োকর্তাকে কঠোর ভাষায় চিঠি লিখে ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের

উপস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। ওদের কাছে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর যাতে মুখরক্ষা হয়, সেজন্যে তিনি অশোককুমার সেনকে তক্ষুনি শান্তিনিকেতন গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। দেখা হতে রবীন্দ্রনাথ রাজদম্পতির সফর উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। শেষে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধীরেন্দ্রমোহন সেন এবং অশোককুমার সেনের অনুরোধে কবি রাজি হলেন। অশোকবাবুর অনুরোধে কবি প্রথম ত্রিশ সেকেণ্ডে বাংলায় বাণীটি বলতে এবং পরবর্তী ত্রিশ সেকেণ্ডে সেটিকে ইংরেজি কবিতায় তর্জমা করে পাঠ করতে সম্মত হলেন। এর জন্য কানাডা ব্রডকাস্টিং করপোরেশন যাতে বিশ্বভারতীকে দক্ষিণা প্রদান করে, তার জন্য অশোককুমার সেন ফিল্ডেনকে টেলিগ্রাম পাঠান। তিনি কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে বলে বিশ্বভারতীকে এক হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

এর আগে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চোখ পরীক্ষার জন্য খ্যাতনামা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞডা. শশীভূষণ সেনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন অশোকবাবু। ফেরার পথে কবিকে কিছু না জানিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল ১ নং গারস্টিন প্লেসে, অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর স্টুডিয়োতে। অশোককুমার সেদিনের সেই মুহূর্তটিকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে। রেডিয়ো স্টেশনের সমস্ত কর্মী সেদিন কবির আগমনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রেডিয়ো স্টেশনের প্রধান প্রবেশপথে পুষ্পস্তবক আর মালা নিয়ে কবিগুরুর অপেক্ষায় বহুক্ষণ থেকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। কবির আগমনে মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করলেন। বেতার কেন্দ্রে এসে কবি খুবই খুশি হলেন।

গারস্টিন প্লেসের রেডিয়ো অফিসের প্রবেশদ্বার থেকে কুড়ি ফুট দীর্ঘ ও আট ফুট প্রস্থ প্রবেশপথটির মাঝখানে একটি বৃত্তের মধ্যে সবুজ সিমেন্টের একটি রেখাচিত্র ছিল। চিত্রটি ভারতবর্ষের মানচিত্র। প্রবাদপ্রতিম রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক সেদিন ১ নং গারস্টিন প্লেসে উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

'কবিকে পথ দেখিয়ে আগে এগিয়ে এলেন বোখারি সাহেব তৎকালীন ডাইরেক্টর জেনারেল ও সেন মহাশয় (অশোককুমার সেন)। তাঁরা দু-জনে অনায়াসেই বৃত্তটি মাড়িয়ে সোজাসুজি হেঁটে গেলেন। কবি কিন্তু বৃত্তটির সামনে এসে কয়েকমুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ভারতজননীর সিমেন্ট-রচিত রেখাচিত্রটিকে আনত-মস্তকে নিরীক্ষণ করলেন এবং এক অপরূপ প্রশান্ত ভঙ্গিতে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে অর্ধবৃত্তাকার ঘুরে গিয়ে মানচিত্রে তাঁর পদস্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে পথপ্রদর্শকদ্বয়ের অনুসরণ করলেন। বেতারের কর্তা দু-জন, যাঁরা ঠিক তার আগেই ভারতজননীর চিত্ররেখাকে সম্পূর্ণ অকারণেই দলন করে গিয়েছেন, পিছন ফিরে কবির এই সশ্রদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত আচরণ দেখে স্বভাবতই অপরিসীম লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়েছিলেন। পরে কবি ভিতরে গিয়ে বলেছিলেন—ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। এই পঙক্তির 'মাটি' শব্দটি আবার ধীরে ধীরে মা-টি এইভাবে পুনরুচ্চারণ করেছিলেন, যেন বলতে চাইছিলেন যে, মায়ের অঙ্গে মাথা ঠেকানো যায়, পা ঠেকাব কেমন করে—মা যে মা-টি।'

১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়ে দীর্ঘকাল 'সংগীত শিক্ষার আসর' পরিচালনা করেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। এর জন্য গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুমতি নিয়ে ওই অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই পঙ্কজকুমার মল্লিককে বলেছিলেন, 'তোমার সংগীত শিক্ষার আসরে আমায় গান শেখাতে পারো, তাতে আমি আপত্তির কারণ দেখি না, বরং আনন্দই পাব।' সঙ্গে সঙ্গে এও অনুরোধ করেছিলেন যে, 'তাঁর গানের সঙ্গে তবলার ব্যবহার যেন মৃদু হয়, সুরের সঙ্গে মিশে গিয়ে তা যেন সুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে, সুরকে ছাপিয়ে উঠে যেন অতিরিক্ত শব্দবিস্তার না করে।'

এর পরের মাসেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলকাতা বেতারের জন্য ইংরেজিতে তিনটি বক্তৃতা রেকর্ড করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ওই প্রতিশ্রুত লেখা তিনটি তৈরি হয়ে গেলে তাঁর সেক্রেটারি নিজেই শ্রীসেনকে খবর দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার দেবকে সঙ্গে নিয়ে অশোক সেন কবির বক্তৃতা রেকর্ড করার জন্য শান্তিনিকেতনে গেলেন। শুধু তাই নয়, সেবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী এবং তাঁর স্বামী কৃষ্ণ কৃপালনীর

সাহায্যে কবির কাছ থেকে চিত্রাঙ্গদা-র পুরো রেকর্ড করার সম্মতিও অশোকবাবু আদায় করে নিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নন্দিতা কৃপালনী এবং অর্জুনের ভূমিকায় রূপদান করেছিলেন নন্দলাল বসুর পুত্রবধূ।

এর পরের বারও অশোককুমার সেনের শান্তিনিকেতন যাওয়া সার্থক হয়েছিল। সেবার রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে এবং তাঁর নির্দেশে অমলা বসু, ইন্দুলেখা ঘোষ, ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত কলকাতা বেতারের জন্য রেকর্ড করেন অশোককুমার। শ্রীসেন বলেন :

> আমার সবচেয়ে আনন্দ হয়েছিল আর একটি রেকর্ডিং করার ব্যাপারে। প্রায় ত্রিশ জন পুরুষ ও নারীর মিলিত কণ্ঠে গাওয়া কবিগুরুর 'নীল আকাশের কোণে কোণে' আর 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান দুটি রেকর্ড করতে গিয়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম। শেষোক্ত গানটি সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল। কবি নিখুঁত সৌন্দর্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তৃতীয়বারের রেকর্ডিং শুনে তবে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন।

একবার মংপু থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতা কলকাতা বেতারের জন্য রচনা করে সেটি আবৃত্তি করেন এবং এই আবৃত্তি কলকাতা বেতারের জন্য রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডিং করতে নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মংপু গিয়েছিলেন। সে-সময়ে টেপ রেকর্ডিং ব্যবস্থা ছিল না, তাই Disc Record-এ রবীন্দ্রনাথের এই আবৃত্তিটি রেকর্ড করা হয়। পরে, দুঃখের বিষয় কয়েক বার বাজাবার পর রেকর্ডটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। একথা জানিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

রবীন্দ্রনাথ রেডিয়ো থেকে প্রচারিত সংবাদের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। মংপুতে থাকতে বিজন বসুর সংবাদ পাঠ তাঁর খুব ভালো লাগত। তিনি বলেছিলেন, যে-লোকটা বাংলায় বলে, বলে কিন্তু বেশ। বেশ ভালো অনুবাদ, ও কি তখুনি তখুনি অনুবাদ করে?

সেইদিন সকালে অর্থাৎ ১৯৩৯-এর ৮ জুন রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় নিয়ে একটি বড়ো কবিতা লিখলেন। তারপর সেটি পরিবর্তিত হতে হতে দুটি-একটি বড়ো কবিতায় এসে দাঁড়াল। এর একটি কবিতার নাম 'সাড়ে নটা।' যেটি 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবিতাটিতে রেডিয়োর প্রসঙ্গ এসে পড়েছে :

> সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে;
> সকালের মৃদু শীতে
> তন্দ্রাবেশে হাওয়া যেন রোদ পোহাইছে
> পাহাড়ের উপত্যকা—নীচে
> বনের মাথায়
> সবুজের আমন্ত্রণ-বিছানো পাতায়।
> বৈঠকখানার ঘরে রেডিয়োতে
> সমুদ্রপারের দেশ হতে
> আকাশে প্লাবন আনে সুরের প্রবাহে,
> বিদেশিনী বিদেশের কণ্ঠে গান গাহে
> বহু যোজনের অন্তরালে।
> সব তার লুপ্ত হয়ে হয়ে মিলেছে কেবল সুরে তালে।...

কবিতাটি লেখার আগে সেদিন মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে সকাল সাড়ে ন'টা দশটার সময় খাওয়া হয়ে গেলে বসবার ঘরে এসে রবীন্দ্রনাথ একটি চৌকিতে বসে বেতারের অনুষ্ঠান শুনছিলেন। এমন সময় মৈত্রেয়ী দেবী কাছে আসতেই কবি বললেন, 'ইউরোপের সংগীত শুনছিলুম গো আর্যে, কী আশ্চর্য এই যন্ত্রটা। কোন সুদূর থেকে কত রাজ্য পার হয়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি। সে-দেশে এখন কত কান্ডই চলেছে, মারামারি হানাহানি, সব পার হয়ে আসছে একখানি সুর, তার মধ্যে একটুও ছায়া পড়েনি সেখানকার জীবনের।' এরপরেই লেখা হয় এই কবিতা।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে কবির জন্মদিবসেও ছিল সারাদিন নানা অনুষ্ঠান। সকালে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী শোনালেন 'ধ্রুপদ সংগীত (রবীন্দ্রনাথ রচিত) এবং 'উচ্চাঙ্গসংগীত' (রবীন্দ্রনাথ রচিত)। সন্ধেবেলা 'পল্লিমঙ্গল' আসরে সজনীকান্ত দাস বললেন 'রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়'। বিভিন্ন সময়ে গান শোনান লীলা দেবী, উত্তরা দেবী (আসল নাম ঊষা, গিরিজাকুমার বসু মেয়েটির নতুন নাম দিয়েছিলেন 'উত্তরা)। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ গেয়েছিলেন 'আমাদের শান্তিনিকেতন' 'ওরে আয় রে' প্রভৃতি গান।

এরপর রবীন্দ্রনাথ আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রয়োজন হল অস্ত্রোপচারের। কবিকে শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৪১-এর জুলাইতে নিয়ে আসা হল। অস্ত্রোপচারের পর কবি কেমন থাকেন তা জানার জন্য দেশবাসী, বিশেষ করে কলকাতার মানুষ, তখন অধৈর্য। তাই এ সংবাদ জানানোর জন্য প্রত্যেক ঘণ্টায় জোড়াসাঁকো থেকে জেনে বেতার মারফত তা দেশবাসীর কাছে জানানোর জন্য কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ওপর চার-পাঁচ দিন মাইক্রোফোনের সামনে বসে কবির অবস্থা জানানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল। এদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে লাগল।...

অবশেষে, সেই অভিশপ্ত ২২ শ্রাবণের মধ্যাহ্নে সজনীকান্ত দাস জোড়াসাঁকো থেকে সর্বাগ্রে খবর পাঠালেন যে, রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদ কলকাতা বেতারে প্রচার করেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ছুটে গেলেন জোড়াসাঁকোয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন :

> বেতারের যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে শ্মশান ঘাটে ছুটে গেলাম আমরা। আমার সঙ্গী ছিলেন মনমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত)। দু জনে সেখানকার ব্যবস্থা ঠিক করেই ছুটলাম জোড়াসাঁকোয়। লোকে লোকারণ্য। গেটের মধ্যে জোর করে ঢুকে কবিকে শেষ দর্শন করবার জন্য অগণিত জনতা গেটে ধাক্কা দিচ্ছে—তার ফলে একটি গেট ভেঙে গেল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশাধিকারই পেলেন না বা পাওয়া সম্ভব ছিল না।
>
> ঠাকুর বাড়িতে শবদেহ বেশিক্ষণ রাখার রীতি নেই—বিশেষত মধ্যাহ্নে যিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন, তাঁকে বৈকালের মধ্যেই নিয়ে যেতে হবে।... অগণিত জনতা রবীন্দ্রনাথের শবানুগমন করতে থাকে। আমরাও সংবাদ সংগ্রহ করতে নিমতলা শ্মশানঘাটে উপস্থিত হই।
>
> তিলধারণের স্থান নেই কোথাও। একটি মই সংগ্রহ করে শ্মশান ঘাটের একটি চূড়ায় উঠলাম আমি—তারপর নামলাম একটি ভগ্ন আলসের ওপরে—হাত দিয়ে ধরবার মতো কোনো জিনিস সেখানে ছিল না এবং সেইখানে বিপদ তুচ্ছ করে বসে এক হাতে মাইক্রোফোন ধরে রেকর্ড করতে লাগলাম রবীন্দ্রনাথের শেষকৃত্যের সংবাদ। দুঃখের বিষয় সেদিন যে আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে আমি ধারাবিবরণী রেকর্ড করিয়েছিলাম সেই রেকর্ডটি বেতারে আর নেই—সহস্র রেকর্ডের সঙ্গেই ভগ্ন হয়ে গেছে, তার কোনো নকলও করে রাখা হয়নি।
>
> তবে সেই ধারাবিবরণী শুনে একদিন রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী সরলা দেবী স্বয়ং বেতার অফিসে এসে আমাকে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। সমগ্র বাঙালির জাতির মনে যে দুঃখের ঝড় সেদিন বয়েছিল তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পেরেছিলুম—'সুমুখে দেখছি অপরাহ্নের সূর্য শেষ বিদায়ের পাঠ নিচ্ছে—ভাগীরথীর গৈরিক জলপ্রবাহে উঠেছে এক করুণ তাপ—আজ সমস্ত বাংলার বুকে দীর্ঘনিশ্বাসের ওঠা পড়া—বাতাসে হাহাকার—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ আর নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের জানি, কিন্তু তিনি বাঙালির রবিঠাকুর, বাঙালির গৌরব, বাঙালির প্রাণের প্রাণ অতি আপনজন। ...আজ সূর্যকে কি বিসর্জন দিয়ে চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বাঙালি জাতি আত্মগোপন করবে—না আবার সেনবসূর্যের আলোক সভাতলে জ্যোতির সমুদ্রে স্নান করতে পারবে? সমগ্র বাঙালির মনে এই প্রশ্ন উঠছে বার বার, আজ তাই সকলের মনে এই প্রার্থনাই জেগে উঠছে, হে

কবি, হে পুরাতন, হে চিরনূতন—রাত্রির অবসান ক্ষণিক হোক—আগামীকালের নবপ্রভাতে নূতনরূপে তুমি দেখা দাও,—দেখা দাও আরবার হে নূতন।'

প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং চিত্রগ্রাহক পরিমল গোস্বামী সেদিন কলকাতা বেতারের অনুষ্ঠানগুলি শুনেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেদিনের সেই স্মৃতি তাঁর গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন :

কী বিপুল বিষণ্ণতা আর শোক বিহ্বলতা বাংলার বুকে।...

—যখন তাঁর সত্য মৃত্যু ঘটল, তখন চিন্তা অসাড় হয়ে গিয়েছিল। রেডিয়োতে খবর, চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। আমি তখন কৈলাস বসু স্ট্রিটে বাস করি।... বাংলার সমস্ত পরিবেশ থেকে, সমস্ত বাঙালির হৃদয় থেকে, রবীন্দ্রনাথরূপী সুন্দর পুরুষমূর্তি এবং তার ভাবমূর্তি হঠাৎ 'নেই' হয়ে গেল, মনের উপর এ এক নির্মম আঘাত। এর প্রচন্ডতা মনকে যে কী পরিমাণ চিন্তামূঢ় করে তুলেছিল তা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। দৈহিক ব্যাধি বেদনা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর রাত্রে আবার রেডিয়ো—শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা। সুনীল রায়ের কণ্ঠে গান শুনছি :

সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।

বিজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শরৎচন্দ্র পন্ডিত যাঁর মাতামহ) একবার বীরেন দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'আপনার অনেক কীর্তি তো বেতারে ছড়িয়ে আছে, সেগুলির মধ্যে কোনটি আপনার মতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে?' বীরেন্দ্রকৃষ্ণ জানিয়েছিলেন : সর্বাগ্রে 'মহিষাসুরমর্দিনী', আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর তাঁর শবযাত্রায় আমার দেওয়া ধারাবিবরণী। উল্লেখ করার মতো ঘটনা হল, এই ধারাবিবরণীর ফাঁকে ফাঁকে কাজি নজরুল 'রবিহারা' কবিতা লিখে যাচ্ছেন রেডিয়ো অফিসে বসে আর সেটি স্টুডিয়ো থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছেন।

১৯৬১-তে উদ্যাপিত হয়েছিল রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ। তখন বেতার অফিস চলে এসেছে ইডেন গার্ডেনে। ১৯৬১-র ৮ মে অর্থাৎ ২৫ বৈশাখ সারাদিন নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিকে স্মরণ করা হল। সকাল ৬-৪০-এ রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ অনুষ্ঠান 'পরমলগ্ন'-তে অংশ নিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ ও পূরবী মুখোপাধ্যায়। সকাল ৭-১০ এ ছিল 'কবিকণ্ঠ'—রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে আবৃত্তি। দুপুর ১টায় গীতিঅর্ঘ্য সাজালেন শুভ গুহঠাকুরতা ও সহশিল্পীবৃন্দ। রাত ১০টায় বিশ্বভারতী নিবেদন করল 'মাটির টানে।'

১৯৬১ সালে শুধু আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রেই নয়, সারাদেশ জুড়ে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ কীভাবে পালিত হয়েছিল, তারও বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন অশোককুমার সেন। বেতারে রবীন্দ্রচর্চার সূচনা (তাঁর গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাস-গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশনা) প্রায় শুরু থেকেই। তার মধ্যে জন্মশতবর্ষে বেতারে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অশোককুমার সেন লিখছেন :

শুধু কবি ও কবিতার গীতিকার রূপেই নয়, বহুমুখী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নানা দিক থেকে উপস্থাপিত করার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা আকাশবাণী কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। ভারতবর্ষের নানা মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে চিন্তাধারার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনা ও কাজের মধ্যে, তা শুধু তাঁর সমসাময়িক কালেরই নয়, আমাদের বর্তমান কালের চোখেও প্রগতিশীল। আকাশবাণীর মতে রবীন্দ্রনাথের এই রূপটির সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন আর আকাশবাণী পরিচয় দিতে চায় মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের—যিনি সকল বন্ধনপাশ ছিন্ন করে মানবমনকে মুক্তির ডাক শুনিয়েছিলেন।

গোটা দেশের আকাশবাণীর জন্যই ভাবা হয়েছিল এটা। বহুমুখী রবীন্দ্রনাথের জীবনকেই ধরার চেষ্টা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে। এক বছর ধরে চলবে এই অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে কী কী ছিল তারও একটি তালিকা দিয়েছেন শ্রীসেন :

আকাশবাণীর সাহিত্য সমারোহ।

অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনি অবলম্বনে ফিচার।

কবিবন্দনা—আঞ্চলিক ভাষার কবিদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, ডকুমেন্টারি ফিচার।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করেছিলেন—তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে সর্বভারতীয় একটি ফিচার।

আকাশবাণী ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অনুষ্ঠান।

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই উপলক্ষ্যে বেতার ভাষণ।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসার বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণন। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে এই উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথিকা (সংখ্যা দুশোরও বেশি), রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও নির্বাচিত কয়েকটি নাটকের বেতার অভিনয়।

পাশ্চাত্য সংগীতে রবীন্দ্রনাথ—আকাশবাণী কলকাতা ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের পাশ্চাত্যসংগীতের মাধ্যমে রূপায়ণের রেকর্ড করা ও পরে আকাশবাণীর ওই অনুষ্ঠানে তা প্রচার।

এ ছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাজ নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। নির্বাচিত একশো একটি রবীন্দ্রসংগীত বিশিষ্ট শিল্পীদের দিয়ে রেকর্ড করানোর কথা ভাবা হয়েছিল। এই গানগুলি প্রথমে বাংলা ভাষায় এবং পরে তার মূল সুর অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দি ভাষান্তর প্রচার করা হয় আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। ভাবা হয়, রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম প্রকাশের কথাও। এ ছাড়া বিদেশের জন্য কবির স্বকণ্ঠে আবৃত্তি ও গানের একটি অ্যালবাম প্রকাশের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। সঙ্গে ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও টীকাসহ মূল রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রগীতিনাট্য।

বেতারজগৎ-ও পিছিয়ে থাকেনি। এই উপলক্ষ্যে নানা লেখা প্রকাশিত হয় পাক্ষিক এই অনুষ্ঠানপত্রে। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে এসেছেন এমন তিনজনের সাক্ষাৎকার ১৯৬০ খ্রি. প্রকাশিত হয় বেতারজগৎ-এ। এঁরা হলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। আকাশবাণীর হয়ে এঁদের সাক্ষাৎকার নেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সবশেষে বলি, সম্ভবত সত্তরের দশকের শেষদিকে যৌথভাবে আমরা, আর্টিস্টরা, রবীন্দ্র-প্রয়াণ দিবসে একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম—'২২-শে শ্রাবণ'। এটি প্রযোজনা করেছিলেন সত্যেন মিত্র। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুমুহূর্ত বর্ণনা করেছিলেন অমিয়া ঠাকুর। সন্তোষকুমার ঘোষ ২২ শ্রাবণের তাৎপর্য নিয়ে বলেছিলেন। এতে যে-ডোম রবীন্দ্রনাথকে দাহ করেছিল তার একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছিল। ডোমটি বলেছিল, আমার তখন বছর সতেরো বয়স। ওইদিন (২২ শ্রাবণ) আমার বাবা বলেছিল, বড়ো করে একটা চিতা কাট, এক বিরাট মানুষ আসছে। কে সেই বিরাট মানুষ জানি না। দেখলাম কাতারে কাতারে লোক আর খাটটা যেন উড়ে আসছে। চারিদিকে ফুলে ফুলে ছয়লাপ, সমস্ত পথ যেন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। সেদিনকার 'সংবাদ-পরিক্রমা'য় এই ডোমের অপূর্ব সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি স্ক্রিপ্ট প্রচার করা হয়েছিল। পরদিন সংবাদপত্রে এই ডোমের সাক্ষাৎকার নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। 'বাইশে শ্রাবণ' প্রচারিত হয়েছিল রাত ১১টা থেকে সাড়ে এগারোটা। অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যেন সদ্যপ্রয়াত হয়েছেন। দিল্লি থেকে ওই অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট ও টেপের কপি পাঠাবার নির্দেশ এসেছিল। আর অভিভূত শ্রোতাদের চিঠিতে প্রশংসার বান ডেকে গেল। সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল না কাউকে নতুন করে চেনা এবং নতুন মূল্যায়ন। স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম আমরা সবাই মিলে—সত্যেন মিত্র, অমিয় চট্টোপাধ্যায় ও আমি (অজিত বসু)। সম্পাদনায় ছিলেন নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ও পঙ্কজ সাহা। তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। তবু মনে

হয় কেউই ভোলেনি বেতারে রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠান—অন্তত সেই সময়ের মানুষ। তাই, আমরা যখন 'বাইশে শ্রাবণ' করি শুনতে শুনতে চোখে জল এসেছিল।

তথ্যসূত্র :

১. কলকাতা বেতার ও রবীন্দ্রনাথ/তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য

২. হারমোনিয়াম বন্ধ হল কেন?/অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী

পরিশিষ্ট

গান্ধিজির প্রথম বেতার ভাষণ দেবদত্ত

বেতারজগৎ ৪০ বর্ষ : ২০ শত সংখ্যা। ১৬-৩১ অক্টোবর ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এখন যেখানে বিরাট বিরাট বাড়ি, বহুলোকের ভিড়, সোদপুর রেলস্টেশনের বাঁদিকের সেই জায়গাটার একদিন ছিল আশ্রম, জাতির জনক বাপুজির আশ্রম। আকাশবাণী তার ক্রমবিবর্তনের বাঁকে বাঁকে ইতিহাসের নানা বিচিত্র অধ্যায়ের সাক্ষী হয়েছে, তার শামিল হয়েছে। এই আশ্রমটিও আকাশবাণীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে রয়েছে কেননা এখানেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের এক শারদসন্ধ্যায় আকাশবাণীর রেকর্ডে সর্বপ্রথম বাঁধা পড়েছিল বাপুজির অমৃতময়ী কণ্ঠস্বর। সেই প্রথম আকাশবাণী বাপুজি বাণী পেল।

গান্ধিজি বেতার মাধ্যমের ‘বিরাট শক্তি’ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, জানতেন, বেতার জাতীয় জাগরণে নিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অথচ আমাদের জাতীয় জাগরণের যিনি অধিনায়ক, সেই গান্ধিজির কাছ থেকে দূরে থাকত তদানীন্তন আকাশবাণী। কারণ সেদিন আকাশবাণী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচার মাধ্যম। তবুও তারই মধ্যে দু-একজন বিদেশি হয়েও মনে করতেন জাতীয় জীবনের সঙ্গে শামিল হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আকাশবাণীর প্রাণশক্তি। এঁদেরই একজন ছিলেন তদানীন্তন আকাশবাণীর কন্ট্রোলার (অব প্রোগামস) লাওনেল ফিলডেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরি কংগ্রেসের সময় তিনি চেষ্টা করেছিলেন বেতারে গান্ধি কণ্ঠ প্রচারের। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অনুমতি দেননি। ক্রুদ্ধ ফিলডেন সার্কুলার পাঠিয়ে ছিলেন আকাশবাণীর কর্মীদের কাছে। দস্তাবেজখানায় সেই সার্কুলারটি খুঁজে পাওয়া গেলে দেখা যাবে তাতে লেখা রয়েছে The Government of India is in rut এবং তিনি কর্মীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন তাঁরা এই পাকচক্রে না পড়েন।

দিন গড়িয়ে মাস কেটেছে। মাস গড়িয়ে বছর এবং বছরের পর আরও অনেকগুলি বছর। গান্ধিজি বেতার থেকে দূরেই রয়ে গেছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই এই কলকাতা কেন্দ্রের তদানীন্তন স্বদেশপ্রেমিক বিচক্ষণ স্টেশন ডিরেক্টর আকাশবাণীর বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী অশোককুমার সেন উদ্যোগী হলেন গান্ধীজির কণ্ঠস্বর বেতারমাধ্যমে ধরে রাখবার শুভকর্মকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য। বলা বাহুল্য, এঁরই উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বেতারে সর্বপ্রথম রেকর্ড করা হয়। শ্রীযুত সেনের চেষ্টা ও সক্রিয়তার ফলে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি মিলল। স্থির হল সোদপুর আশ্রমে বাপুজির প্রার্থনান্তিক ভাষণ রেকর্ড করা হবে। সোদপুরের আশ্রমের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন শ্রী সেন।

গান্ধিজির বেতারভাষণ

গান্ধিজির অনুমতি মিলল। শ্রী সেন এই অনুষ্ঠান রেকর্ড করবার ভার দিলেন দুইজন দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য কর্মীর ওপর—একজন সহকারী স্টেশন ডিরেক্টর ও অপরজন ইঞ্জিনিয়ার। উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং উদ্বেগ ও আনন্দের মিশ্র প্রতিক্রিয়াতে দুলতে দুলতে ওঁরা গেলেন সোদপুর আশ্রমে। সেসময়ে টেপ রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা ছিল না, ডিস্কে রেকর্ড করা হত। কাজেই যান্ত্রিক নিরাপত্তা ছিল কম, উদ্বেগ ছিল বেশি।

বিকেলের এক প্রৌঢ় প্রহরে সোদপুর আশ্রম প্রাঙ্গণে গান্ধিজি এসে বসেছেন প্রার্থনাসভায়। বেতারের মাইক্রোফোনটা রাখা হল সামনে। ঠোঁটটা উলটে সামনের এক সঙ্গীর কানের কাছে মুখ দিয়ে কী যেন বললেন বাপুজি। সঙ্গী কী যেন বললেন গান্ধিজিকে। মুখের ওপর থেকে ঔৎসুক্যের ভাবটা মুছে গিয়ে নেমে এল সুপ্রাচীন ভারতীয় প্রশান্তি। ভাষণ শুরু করলেন। ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ভারতাত্মার মর্মবাণী, মৈত্রী ও শান্তির বাণী। রেকর্ডে ধরা পড়ল সমস্ত নিখুঁতভাবে। আকাশবাণীর ইতিহাসে তারিখটা লাল হরফে লেখা পড়ল।

সেই প্রথম শ্রী অশোককুমার সেনের উদ্যোগে পরিচালিত ও ব্যবস্থিত সেই যে গান্ধিবাণী রেকর্ড করা শুরু হল বাপুজি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সেই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল।

আকাশবাণীর সংবাদ

দ্বীপেশচন্দ্র ভৌমিক

আকাশবাণী সংবাদ বিভাগের প্রাক্তন মহানির্দেশক দ্বীপেশচন্দ্র ভৌমিকের '*প্রসঙ্গ : আকাশবাণীর সংবাদ*' (*কলকাতা বেতার* গ্রন্থে প্রকাশিত—সম্পাদনা ভবেশ দাস ও প্রভাত কুমার দাস পৃ. ২০৭-২১৩) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত মূল্যবান আলোচনা আছে। এটি থেকে পাঠক জানতে পারবেন অতীতের নানা ঐতিহাসিক তথ্য। লেখক ও সম্পাদকদ্বয়ের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করা হল।

লেখক

আমেরিকার পিটসবার্গে বেতার তরঙ্গে প্রথম অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে ১৯২০ খিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি লণ্ডনের চেমসফোর্ড থেকে 'মার্কনি' কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে বেতার সম্প্রচার শুরু করে। দু-বছর পর ১৯২২-এর নভেম্বর মাসে মার্কনি কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়, আর সেই সময়ই আত্মপ্রকাশ করে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বি.বি.সি.।

সম্প্রচারের জগতে 'বি.বি.সি.'-কে আদর্শ মেনেই ভারতে বেতারের সূচনা। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় শুরু হয়েছিল অপেশাদারি সম্প্রচার। ১৯২৪-এর জুন মাসে বোম্বে ও মাদ্রাজ রেডিয়ো ক্লাবের মাধ্যমে প্রতিদিন আধঘণ্টার সম্প্রচার শুরু হয়। কিন্তু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি রেডিয়োক্লাব ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দর অক্টোবরে আর্থিক দুর্দশার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে অনেক তর্কবিতর্ক ও চিঠিপত্রের লেনদেন এবং সরকারি ও বেসরকারি মহলের চেষ্টায় ১৯২৬-এর ১৩ সেপ্টেম্বর সরকার ও ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৭-এর ২৩ জুলাই বোম্বাই-এর ওরলিতে এবং একই বছরে ২৬ অগাস্ট কলকাতায় বেতারকেন্দ্র চালু হয়। এই কেন্দ্রগুলি চালু করার ব্যাপারে বি.বি.সি. খুব সাহায্য করেছিল।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল সংবাদ সরবরাহের। কারণ, শুরুতে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির নিজস্ব কোনো সংবাদদাতা ছিল না। এক অর্থে সংবাদ বিভাগও ছিল না বলা যায়। রয়টারের সংবাদই ছিল একমাত্র সূত্র। এই সংবাদ সংস্থার খবর অনুবাদ করে দুটি করে নিউজ বুলেটিন দেশীয় ভাষায় প্রচার করা হত। বোম্বাই থেকে হিন্দুস্থানিতে, আর কলকাতা থেকে বাংলায়। হিন্দুস্থানি হল হিন্দি আর উর্দুর মিশ্রণ। জওহরলাল নেহেরু প্রথমদিকে এমনটাই চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা রাখা হয়নি। পরের দিকে হিন্দিতেই সংবাদ পরিবেশিত হত। দুটি করে ইংরেজি সংবাদও প্রচারিত হত বোম্বাই এবং কলকাতা থেকে। মাদ্রাজ থেকে একটি ইংরেজি সংবাদই প্রচার করা হত কোম্পানির জমানায়।

১৯৩০ থেকে ৩৫ পর্যন্ত বেতার সম্প্রচার এক অস্থির অবস্থার মধ্যে ছিল। ১৯৩৫ খ্রি. বি.বি.সি.-র মুখ্য প্রযোজক লায়োনেল ফিল্ডেনকে (Lionel Fielden) ভারতীয় সম্প্রচার ব্যবস্থাটি স্বনির্ভর ও সুসংহত করার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন বার্তা সম্পাদক। একজন হলেন এইচ. এল. কির্ক (H. L. Kirke), অন্যজন চার্লস বার্নস (Charles Burns)। ১৯৩৬-এর ৮ জুন থেকে বেতার সম্প্রচার সংস্থার নাম হল অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো। এ ব্যাপারেও আসল কৃতিত্ব দিতে হবে লায়োনেল ফিল্ডেনকেই। তিনি তখনকার ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো-কে বোঝালেন, সহজ উচ্চারণের সুবিধার্থে 'অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো' নাম রাখলেই ভালো হয়। ভাইসরয় রাজিও হলেন। ফিল্ডেন একই সঙ্গে AIR-এর air (বায়ু) শব্দ দুটিকে সমার্থক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি সফলও হয়েছিলেন।

ফিল্ডেন এবং চার্লস বার্নস একটি কেন্দ্রীয় সংবাদ সংগঠন বা বিভাগ গড়ে তুললেন। কয়েক জন সাংবাদিকও নিযুক্ত করা হল। কিন্তু কাউকেই স্থায়ীভাবে নয়।

কলকাতা বেতার থেকে যখন বাংলা সংবাদ প্রচার করা হত তখন মোহনবাগানের নাম করা ফুটবলার রাজেন সেনগুপ্ত প্রধান দায়িত্বে ছিলেন। পরে ১৯৩৯-৪০-এ যখন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দিল্লি থেকে সংবাদ বুলেটিন প্রচার শুরু হল, তখন রাজেনের ডাক পড়েছিল দিল্লিতে। নতুন এলেন বিজন বসু। সর্বভারতীয় স্তরে বাংলা সংবাদকে জনপ্রিয় ও শ্রুতিগ্রাহ্য করে তুলতে বিজনবাবুর অবদান ছিল অসামান্য। দ্রুত বাংলা তর্জমা করা এবং সংবাদ পাঠে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না। পরে দিল্লির বাংলা সংবাদ বিভাগকেও তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিভূতিভূষণ দাস, সমর ঘোষ এবং যুদ্ধোত্তর যুগে সমর বসু। ১৯৪২-এ পার্ল হারবারে জাপানি আক্রমণের পর ভারতের আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্রগুলিতে সম্প্রচারের ওপর আরও জোর দেওয়া হয়। প্রথম আঞ্চলিক সংবাদ চালু হয় ১৯৫৩ সালে লখনউ, নাগপুর ও পুনেতে। পরে ১৯৫৪ সালে কলকাতা-সহ অন্যান্য কেন্দ্রে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ভাষায় আঞ্চলিক সংবাদ চালু হয়। ৬০ সালের মধ্যে কুড়ি-একুশটি ভাষায় খবর সম্প্রচার হতে থাকে। তবে কলকাতার আঞ্চলিক সংবাদ বিভাগের শুরু ১৯৫৪ সালের মে মাসে। এটা ছিল আঞ্চলিক বা স্থানীয় সংবাদ প্রচারে চতুর্থ উদ্যোগ। এই আঞ্চলিক সংবাদ বিভাগে প্রথম সহকারী বার্তা-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন বিভূতিভূষণ বসু। আগে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে কাজ করতেন। তিনি অবশ্য বেতারে নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৯৫২ খ্রি.। নরেন শেট্টি বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে সংবাদ বিভাগে যোগ দেন। গারস্টিন প্লেসের বাড়ির কোণের দিকে একটা ছোটো ঘর ছিল নিউজ রুম। নির্মল সেনগুপ্ত ছিলেন সাব-এডিটর। আগে তিনি তদানীন্তন ভারত-কথার এডিটর ছিলেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে নিউজ এডিটর পদে উন্নীত হয়ে বিভূতিভূষণ বসু দিল্লি চলে গেলেন। নরেন শেট্টিও কলকাতায় বেশিদিন কাজ করেননি। কিষেণকুমার সুদ এসেছিলেন বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে। তখন একটাই সংবাদ বুলেটিন হত। তখনই নাম হয়ে যায় স্থানীয় সংবাদ। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে বলা হয় আঞ্চলিক সংবাদ। সংবাদ বুলেটিনের নামকরণের ব্যাপারে বিদগ্ধ মানুষজনের মতামত নেওয়া হয়েছিল। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নৃপেন মজুমদার—সকলে মিলে আলোচনা করে ‘স্থানীয় সংবাদ’ নাম স্থির করেন। এই সংবাদ বুলেটিনের জন্য খবরের সূত্র ছিল পি.টি.আই.। এই সংস্থা সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করেই বেশিরভাগ সংবাদ সরবরাহ করত।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিধানচন্দ্র রায় একবার গারস্টিন প্লেসে এসেছিলেন। তখন তিনি কেন্দ্র-অধিকর্তার কাছে জানতে চান, এত ছোটো জায়গায় কীভাবে একটা রেডিয়ো-স্টেশন চলছে। তিনি বেতারের নতুন বাড়ি তৈরির উদ্যোগ নেবার কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও কলকাতা বেতারকে একটি উপযুক্ত জায়গা দেওয়া নিয়ে কথা হয়। ১৯৫৪ খ্রি. পরিকল্পনা করে চার বছরের মধ্যেই নতুন ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়। এই কাজ তদারকির জন্য প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন জোগলেকর। তিনি ছিলেন মারাঠি। মুম্বইয়ের মানুষ। মুম্বইবাসীরা পশ্চিমমুখী বাড়ি করা পছন্দ করতেন। তাই বর্তমান আকাশবাণী ভবনটির পশ্চিম দিক খোলা। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর আকাশবাণীর নতুন (বর্তমান) ভবনটি চালু হয়েছিল। যেকোনো কারণেই হোক সংবাদপত্রে এই ভবন চালু হওয়ার খবর বেরিয়েছিল ১৭ সেপ্টেম্বর। দ্য স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় এই খবর একই দিনে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দৈনিক বসুমতীতেই খবরটির জন্য বেশি জায়গা দেওয়া হয়। তবে সব পত্রিকাতেই মূল খবরটির ভাষা ছিল অভিন্ন। এর কারণ হতে পারে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত কোনো প্রেস রিলিজ বা লিখিত বয়ান, যা প্রত্যেকটি সংবাদপত্রেই একযোগে দেওয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রে সেটি হুবহু সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ছাপা হয়েছিল। দৈনিক বসুমতীতে লেখা হয়েছিল—

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে আকাশবাণী স্থাপিত হওয়ার পর এতদিন উহার কলিকাতা কেন্দ্র ১ গারস্টিন প্লেসস্থিত ভাড়াবাড়িতে ছিল। ওই বাড়ির সামান্য অদলবদল করিয়া স্টুডিয়োতে পরিণত করা হয়। কাঠামোর এই সামান্য অদলবদলের ফলে স্টুডিয়োগুলিতে শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ঠিকমতো অবলম্বন করা হয় নাই।...

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গরূপে কলিকাতা কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান অনুষ্ঠানসূচি প্রচারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সর্বসুদ্ধ চোদ্দোটি স্টুডিয়োবিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত করা হয়। ...এই কেন্দ্রের ডিরেক্টর ও পরিকল্পনা অফিসারের অফিস নির্মাণ করারও সিদ্ধান্ত করা হয়। স্টুডিয়োর মধ্যে যাহাতে শব্দের কম্পন না হয়, সেজন্য উহার গড়নে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য রাখা হয় না—ইহা লক্ষ করিলে দেখা যাইবে। কর্মসূচির অনুষ্ঠানে যাহাতে যতটা সম্ভব স্বাভাবিকতা বজায় থাকে, সেজন্য হার্ডবোর্ড ও গ্লাস সিল্ক ব্যবহার করিয়া স্টুডিয়োগুলির শব্দের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিশেষ বিশেষ ধরনের কর্মসূচির জন্য শব্দগতির উত্তম চালনা ব্যবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের সজ্জিত কতগুলি স্টুডিয়ো রহিয়াছে।

ঠিক এভাবে স্টুডিয়োর ভেতরে আধুনিক 'কারিগরি সুবিধা' 'শব্দতরঙ্গ পরিচালনা', 'বিদ্যুৎ সরবরাহ' ব্যবস্থা সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেক সুযোগসুবিধার উল্লেখ করে সাব হেডিং ব্যবহার করা হয়।

১৯৫৫ খ্রি. কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে। নতুন ভবন চালু হওয়ার সময়ে কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। উদ্বোধনের সময়ে আশা করা হয়েছিল কাজ শেষ হবে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে। ভবনটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫০ লক্ষ টাকা।

প্রথমদিকে ন-টি স্টুডিয়ো ছিল। দুটি টেলিফোন পাওয়া গেল। একটি বসানো হল ডিউটি রুমে। অন্যটি নিউজ রুমে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ফিল্ড পাবলিসিটি, ডি. এ. ভি. পি., চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ফিলম ডিভিশনকে অফিসঘর দেওয়া হল নতুন আকাশবাণী ভবনের পূর্ব দিকে। আর প্রোগ্রাম ও ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের জন্য ঘর দেওয়া হল পশ্চিম দিকে। কিন্তু নিউজ-এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ঘর ছিল না। সংবাদপাঠক দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেচু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন নিউজ-এর ঘর কোথায় হবে? কেন্দ্র-অধিকর্তা বললেন, চারতলায় জায়গা আছে। তখন সহকারী কেন্দ্র-অধিকর্তা ছিলেন সুদেব বসু। সুদেববাবু এবং আরও একজন মিলে বললেন, নাটক বিভাগের বড়ো হলঘর ও 'পল্লিমঙ্গল আসর'-এর ঘরের পাশে সংবাদকে জায়গা দেওয়া হবে। তখন 'বেতারজগৎ'-এর জন্য দোতলায় জায়গা ছিল। গারস্টিন প্লেসে জায়গার অভাব ছিল বলেই আগে সিনিয়র করেসপণ্ডেন্ট বাড়ি থেকেই অফিসের কাজ করতেন। সেই সময় থেকে ঠিক হল তাঁকে অফিসে আসতে হবে। ১৯৬০-৬১ খ্রি. শিবু দাশগুপ্ত সিনিয়র করেসপণ্ডেন্ট হয়ে আসেন। বিভূতিভূষণ বসুর পরে সুধীর সরকার সহকারী বার্তা সম্পাদক পদে যোগ দেন। তার সঙ্গে কারও বনত না। ১৯৬৩ খ্রি. তিনি বদলি হয়ে যান। ১৯৬৪-তে ওই পদে আসেন খগেন দে সরকারের ভাইপো রবীন দে (আর. সি. দে)। এর আগে এক বছরের জন্য বিভূতিভূষণ দাস দিল্লি থেকে এসে এই পদে যোগ দেন। তিনি খবরও পড়তেন। কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় সহকারী বার্তা সম্পাদকের পদের সংখ্যা হয় দুটি। ফলে বিভূতিভূষণ দাস এবং রবীন দে দু-জনেই সহকারি বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৬০-৬১ তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে দার্জিলিং-এ একটি বেতার কেন্দ্র চালু করা হবে। কিন্তু এই কেন্দ্রটি দার্জিলিং না কার্শিয়াং কোথায় হবে তা নিয়ে বামপন্থী ও কংগ্রেসের সাংসদদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। কংগ্রেস সাংসদ মায়া দেবী ছেত্রির বাড়ি ছিল কার্শিয়াং-এ। অবশেষে কার্শিয়াং-এ এই বেতার কেন্দ্র চালু হয় ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দর ১০ জুন। উদ্বোধন করেন তদানীন্তন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বি. গোপাল রেড্ডি। কেন্দ্রটি স্থাপনে ব্যয় হয়েছিল চার লক্ষ টাকা। ভারত-চিন সংঘর্ষের সময় এই কেন্দ্রের ট্রান্সমিটারের ক্ষমতা ২০ কিলোওয়াট থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোওয়াট করা হয়। ১৯৬৫ খ্রি. ভারত-পাক যুদ্ধের সময় কলকাতা 'ক'-এর প্রচারক্ষমতা বাড়িয়ে করা হয় ১০০ কিলোওয়াট। কলকাতা 'খ'-এর ক্ষমতা তখন ছিল ২০ কিলোওয়াট। এর সঙ্গে ক-এর ৫০ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটারকে কলকাতা 'খ'-এর সঙ্গে যুক্ত করা হল। ২০ কিলোওয়াট সহযোগীশক্তি হিসেবে ছিল।

১৯৬৮ খ্রি. এই সহযোগী ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারকে কমার্শিয়াল ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের কাজে ব্যবহার করা হয়। পরে ২.৫ কিলোওয়াট একটি শর্ট ওয়েভকে মিডিয়াম ওয়েভে রূপান্তরিত করা হয়। তার মাধ্যমে প্রচারিত হত 'যুববাণী'র অনুষ্ঠান।

১৯৫৯ খ্রি. খাদ্য আন্দোলন এ-রাজ্যে সাড়া ফেলেছিল। খাদ্য আন্দোলনের মিছিল ও প্রশাসনিক তৎপরতা —আকাশবাণীর খবরে যথার্থ প্রতিফলিত হত না। সরকারি সূত্রের খবরের বাইরে অন্যান্য খবর বিশেষ গুরুত্ব পেত না। বিশেষ করে দিল্লির বাংলা খবরে তো নয়ই। তখন দিল্লি থেকে খবর পড়তেন অসিতভূষণ দাস, বিভূতিভূষণ দাস, সমর বোস প্রমুখ। সমর বোস ছিলেন দিল্লির বাংলা নিউজ রুমের সাব অডিটর। পরে তিনি পি. আই. বি.-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট জার্নালিস্ট পদে যোগ দেন।

শ্রী দ্বীপেশচন্দ্র ভৌমিক আসেন ১৯৬৪ সালে—তাঁর প্রথম পোস্টিং হয় দিল্লি পি. আই. বি.-তে। তবে পি. আই. বি-র কাজ সেরে অনেকসময় তাঁকে All India Radio-র নিউজ সার্ভিসেস ডিভিশন অর্থাৎ NSD-তে আসতে হত। পি. আই. বি.-র অফিসার হিসেবে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে দেশবিদেশের সাংবাদিকদের সীমান্তের পরিস্থিতি দেখানোর জন্য যেতে হত। ১৯৬৫-তে ভারত-পাক যুদ্ধের পর ১৯৬৬ খ্রি. সরকার সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ববাংলার ওপর অনুষ্ঠান ও সংবাদপ্রচারে বিশেষ জোর দিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকাল ন-টা পাঁচে একটি এবং রাত দশটা পাঁচে একটি বুলেটিন চালু হয় এবং সহকারী সংবাদ-সম্পাদকের একটি পদে উন্নীত করা হয় সম্পাদককে। দ্বীপেশ ভৌমিক ওই পদে যোগ দেন ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে। রবিন দেবের পদোন্নতি হয় এবং উনি কলকাতাতেই সিনিয়র করেসপণ্ডেট হিসেবে যোগ দেন। শিবু দাশগুপ্তের পদোন্নতি হওয়ায় দিল্লিতে ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ নিউজ-এ যোগ দেন। এবং একটি নতুন অনুষ্ঠান 'সংবাদ পরিক্রমা' নামে রাত দশটায় প্রচার হতে শুরু করে। এটি মূলত পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির পর্যালোচনা।

তার আগে ১৯৬২ খ্রি. ভারত-চিন সংঘর্ষের সময় দিল্লি থেকে 'সমীক্ষা' চালু হয়েছিল। তখন লাইন বুক করে কলকাতায় 'সমীক্ষা' শোনানো হত। এই সময় 'ওভারসিজ নিউজ স্ক্রিপ্ট রাইটার' নামে একটি পদ সৃষ্টি হয়। এই নিয়ে তখনকার কেন্দ্র অধিকর্তা—পি. সি. চ্যাটার্জি ও সিনিয়র করেসপণ্ডেন্ট রবীন দে-র মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। প্রশ্ন উঠেছিল, এই পদটিকে 'সাব-এডিটর হিসেবে ঘোষণা করা হবে না কেন? কিন্তু তখন সিদ্ধান্ত হয় যে 'স্টাফ আর্টিস্ট' এডিটরের সাব পদটি বিলোপ করা হবে। নতুন পদটির নাম হল 'স্ক্রিপ্ট রাইটার নিউজ'। এই পদের জন্য পরীক্ষায় কুড়ি-বাইশ জন প্রতিযোগীর মধ্যে নির্বাচিত হন প্রণবেশ সেন।

১৯৬৫-৬৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত অশোক মিত্র (IAS) ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের সচিব। প্রত্যেক শনিবার, কখনো কখনো শুক্রবার সকালেও তিনি দিল্লি থেকে কলকাতায় আসতেন। কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ও সমস্যা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কলকাতায় থাকলে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রায়ই মহাকরণে যেতেন। সঙ্গে নিতেন কখনো দ্বীপেশ ভৌমিককে, কখনো রবীন দে-কে। দুপুরে লাঞ্চ সেরে আবার তিনটের সময় আসতেন আকাশবাণীতে।

১৯৬৬-র মার্চের মাঝামাঝি সম্প্রচার মন্ত্রকের উপদেষ্টামন্ডলীর একটি বৈঠক ডাকা হয়। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি, তথ্যমন্ত্রী রাজ বাহাদুর ও নতুন সচিব অশোক মিত্র এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল, সংবাদপ্রচার ও প্রসারণের রীতিনীতি কী হবে। এই বৈঠক প্রসঙ্গে অশোক মিত্র তাঁর 'তিন কুড়ি দশ' গ্রন্থে লিখেছেন :

> উপদেষ্টামন্ডলীতে আমাদের মন্ত্রকের যাবতীয় বিভাগের অধ্যক্ষরা, দিল্লির সব সংবাদপত্রের সম্পাদকরা এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত মনোনীত রমেশ থাপার সদস্য ছিলেন। মন্ত্রী রাজ বাহাদুর প্রত্যেকের কাছে তাঁর মন্তব্য জানতে চাইলেন। সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন সংস্থার সম্পাদক ও স্থানীয় কর্তারা যা চলেছে বা চলছে, মোটামুটি ভালোই হচ্ছে বলে কর্তব্য সারলেন। আমরা অফিসাররা বসে শুনছি। রমেশ থাপারের ডাক পড়ায় তিনি তাঁর গমগমে গলায় বললেন, 'আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য মিসেস গান্ধির সমস্ত কিছু কাজে সম্পূর্ণ ইতিবাচক সমর্থন দিয়ে সংবাদ ও মন্তব্য বিতরণ

করা। জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা করে দেওয়া যা-কিছু হচ্ছে ভালোর জন্য হচ্ছে, এর থেকে ভালো হতে পারে না। যাতে জনসাধারণের মনে সম্পূর্ণ আস্থা আসে, বিরুদ্ধভাব চলে যায়। সকলেই চুপ করে শুনলেন। মন্ত্রী রাজ বাহাদুর জানতেন, রমেশ শ্রীমতী গান্ধির কত কাছের লোক। তাঁর বক্তব্য সমর্থন করে অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নতুন সচিবের কিছু বলার আছে কি না।

সংবাদ, বিশেষত প্রচারজগতে একান্ত অনভিজ্ঞতার জন্য মাপ চেয়ে বললুম, আমি রমেশের সাথে একমত হতে পারছি না। সাধারণ নাগরিক হিসেবে সরকারি সংস্থা থেকে তথ্য ও প্রচারে আমার যা মনে হয়েছে তাই নিবেদন করছি। রেডিয়োর ও অন্যান্য সরকারি প্রচার এমনভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় যাতে তার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না, স্পষ্টত সরকারের যাবতীয় ত্রুটি ঢাকার সপক্ষে প্রোপাগাণ্ডা বলে মনে হয়। আমাদের সংবাদপত্রেও ব্যক্তিগত মত প্রচারে সংবিধানমতে যে-স্বাধীনতা আছে, তার পাশে যেকোনো দিনের রেডিয়ো বা টেলিভিশন সংবাদ পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে সরকারের বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে অপ্রিয় প্রায় সমস্ত সংবাদই রেডিয়ো বা টেলিভিশনে বাদ গেছে। সুতরাং আসল সংবাদ সরকারি সূত্রে পাওয়া যায় না। সংবাদপত্রেই পাওয়া যায় ...যা মিথ্যা বা অশুভ সংবাদ তাকে সর্বদা সভ্য বা শুভ বলে লোককে মানিয়ে নিতে গোয়েবলসও পারেননি। জার্মানির লোকও চরমদন্ডের ভয় সত্ত্বেও অতি সন্তর্পণে বি.বি.সি. শুনেছে, বি.বি.সি.-ও যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতিদিনের ক্ষয়ক্ষতির কথা কোনোদিনই ঢাকার চেষ্টা করেনি। অতএব আমার নিবেদন হচ্ছে, সরকারি প্রচার যন্ত্রে সংবাদের সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রথম গুণ হওয়া উচিত এবং প্রতিক্ষেত্রেই আসল সংবাদ, সেযত খারাপই হোক—দিয়ে সরকার তার প্রতিকারের কী ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নিচ্ছেন, পরিপূরক হিসেবে সেটি সঙ্গে সঙ্গে বলা, যাতে দুই দিক থেকে ভারসাম্য রেখে সংবাদটি গ্রহণযোগ্য হয় ...ভুল সংবাদ বিতরণ করলে বা আসল সংবাদ চেপে গেলে সরকার সম্বন্ধে অবিশ্বাস এমনকী ঘৃণা বাড়বে। আমার মতে নীতি হওয়া উচিত সংবাদ বা মন্তব্য এমনভাবে হবে, যাতে জনসাধারণ অপ্রিয় সত্যটি নিতে পারে এবং সেইসঙ্গে তাঁর বিশ্বাস আসে যে, সরকার সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত এবং যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়েছেন। ইংরেজিতে বলি 'give the rough news with the smooth and let the smooth end with this point that the Government is aware and taking adequate steps…'

মন্ত্রী থেকে সকলেই একটু থতোমতো খেয়ে গেলেন। মন্ত্রী নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এ বিষয়ে নিজে থেকে কোনো উল্লেখ করেননি। তাঁর কানে আর কেউ না হোক অপদস্থ রমেশ যে রং চড়িয়ে বলবে এই অনুমান করে কিছুদিন অন্তর অন্তর প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই নীতিগুলি মৌখিক অনুমোদন করিয়ে নিই। লিখিত হলে হয়তো মন্ত্রী ব্যথিত বোধ করতেন।

১. রেডিয়ো বা অন্য কোনো প্রচার বিভাগে কোনো অপ্রিয় সত্য চেপে দেওয়া চলবে না, সেইসঙ্গে প্রতিকারকল্পে সরকার কী করছেন তারও সবিশেষ উল্লেখ করে আশার উদ্রেক করতে হবে।

২. সাময়িক সংবাদ বা সমস্যার ওপরে রেডিয়ো-তে যথাসম্ভব দুইয়ের অধিক অভিমতের গোলটেবিল আলোচনা যত বেশি হয় ততই বাঞ্ছনীয়, যাতে যেকোনো সমস্যার চারিদিক শ্রোতা তলিয়ে নিজের মতো করে দেখতে পারেন। যিনি এই বৈঠক চালনা করবেন তিনি এমনভাবে শেষ করবেন যাতে শ্রোতার মনে বিশ্বাস জন্মায় যে, সরকার সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

৩. এই নীতি সব প্রচার বিভাগেই পালিত হবে... কর্তাভজা নীতি থেকে এই নীতি মেনে নিতে অন্তত দু-বছর লাগল। ১৯৬৬-র শেষে ইডেন গার্ডেন্সে টেস্ট ম্যাচের সময় মাঠে অগ্নিকান্ড ঘটেছিল। সেটি কলকাতার রেডিয়োতে রাত ন-টার সংবাদে চেপে দেওয়া হয়। দিল্লি থেকে রাত সাড়ে ন-টার সময় টেলিফোনযোগে মন্ত্রকের সচিব কলকাতা রেডিয়োর ডিরেক্টরকে সাময়িক পদচ্যুত করার হুঁশিয়ারি দেবার ফলে সেই রাত্রে বিশেষ ঘোষণা হিসেবে অগ্নিকান্ডের উল্লেখ করা হয়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষ থেকে উক্ত তিন নীতি মোটামুটি চালু হয়।

তখন কলকাতা কেন্দ্রের নিউজ রুম যেখানটায় ছিল, প্রচন্ড গরম হত। কারণ ওটা ছিল পশ্চিম দিকের ঘর। এত গরম যে জামা খুলে বসতে হত। একদিন পীযূষ (বন্দ্যোপাধ্যায়) খবর পড়তে যাওয়ার সময় স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যান। মাথা ফেটে রক্ত বেরোয়। বুলেটিনের প্রথম পাতায় রক্তের দাগও লেগে যায়। এই অবস্থায় তিনি যখন ডিউটি রুমের পাশ দিয়ে স্টুডিয়োতে ঢুকছেন, ডিউটি অফিসার দেখতে পান। তিনি নিউজ রুমে খবর দেন। আমরা ছুটে স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখি পীযূষ ওই অবস্থায় খবর পড়তে শুরু করেছেন। এই খবরটা অশোক মিত্রর কানে গিয়েছিল। এরপর তিনি যখন কলকাতায় এলেন, তখন কেন্দ্র-অধিকর্তা প্রেমস্বরূপ ভাটিয়াকে ফোন করে বলেন, ওই দিনই তিনি আকাশবাণীতে আসবেন এবং কীভাবে নিউজ হয় তা দেখবেন। অশোক মিত্র নিউজ রুমে এসে বসার তিন-চার মিনিট পর অসহ্য গরমে জামার বোতাম খুলে ফেলেন। তিনি বললেন, এটা তো নিউজ রুমের পক্ষে সঠিক জায়গা নয়। তিনি ভাটিয়াকে বললেন, 'এরকম হট ফার্নেসে বসে এদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। আমি চললাম। এক সপ্তাহের মধ্যে যথাযথ নিউজ রুমের ব্যবস্থা করে আমাকে জানাবেন।' এর মাস খানেক পর দিল্লির সংবাদ বিভাগের অধিকর্তা (Director, News Services) আর. কে. চ্যাটার্জি ফোন করে বললেন, পাকিস্তান সরকার সংবাদ ও সংবাদভাষ্য নিয়ে কিছু অভিযোগ করেছে। গত চার দিনের স্ক্রিপ্ট অনুবাদ করে একদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। তারপরই জিজ্ঞাসা করলেন, নিউজ রুমের জন্য নতুন অ্যাকোমোডেশন পেয়েছেন? আমি বললাম, না। পুরো ঘটনাটা লিখে পাঠান। তড়িঘড়ি রবীন দে-র সঙ্গে আলোচনা করে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের স্টেনোকে দিয়ে চিঠি টাইপ করা হল এবং চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হল। বর্তমানে যেখানে নিউজ রুম সেখানে আগে ছিল লাইব্রেরি। লাইব্রেরি চলে গেল তিনতলায়। আর এই জায়গায় নিউজ রুম চলে এল। এই পরিবর্তনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সরল গুহ, বিমান ঘোষ—এঁরা খুশি হতে পারেননি। কারণ দোতলায় লাইব্রেরি থাকায় তাদের পক্ষে কাজের সুবিধা হত। ১৯৫৬ থেকে ৭২ খ্রি. পর্যন্ত আকাশবাণী কলকাতা থেকে ত্রিপুরার শ্রোতাদের জন্য আলাদা বুলেটিন হত সন্ধে ছ-টা থেকে সাড়ে ছ-টার মধ্যে। সুধীর দেববর্মন ও প্রিয়বন্ধু দেববর্মন—এরা দু-জন ছিলেন নিউজ রিডার কাম ট্রানস্লেটর। দশ মিনিটের মধ্যে পাঁচ মিনিট ককবরক ভাষায় এবং পাঁচ মিনিট বাংলা ভাষায় খবর হত।

১৯৭২ খ্রি. আগরতলা কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরি বুলেটিনের প্রচার শুরু হয়, আর কলকাতা থেকে সেই জায়গায় শুরু হল সাঁওতালি বুলেটিন।

কলকাতার সংবাদ বিভাগের জন্য পার্ট-টাইম করেসপণ্ডেন্ট (PTC) নিয়োগ শুরু হয় ১৯৬২ খ্রি.। শিবসনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসানসোলে, দিলীপ বসুকে দার্জিলিং-এ এবং কনক দত্তকে মেদিনীপুরে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৬৮-৬৯ খ্রি. সর্বপ্রথম কলকাতা সংবাদ বিভাগ প্রত্যেক জেলায় একজন করে সংবাদদাতা নিয়োগের অনুমতি পায়। তা ছাড়া ওই সময়ই 'জেলার চিঠি' অনুষ্ঠানও শুরু হয়। প্রথমদিকে বিভিন্ন জেলার সংবাদদাতা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন হাওড়ায় শশধর রায়, মুর্শিদাবাদে সৌরীন্দ্রমোহন সেন, মালদায় ধীরেন ঠাকুর, জলপাইগুড়িতে বীরেন বসু, কোচবিহারে বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, হুগলিতে সৌরীনবিহারী সান্যাল, নদিয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, চব্বিশ পরগনায় কল্যাণ দাস, দিনাজপুরে রাধামোহন মোহান্ত, বীরভূমে জ্যোতির্ময় রায়, শান্তিনিকেতনে দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, পুরুলিয়ায় অশোক চৌধুরী। এ ছাড়া কলকাতায় 'যুববাণী'র খবরের জন্য কয়েক জন আংশিক সময়ের সংবাদদাতা নিয়োগ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন—সূর্যকান্ত বসু, সরল ঘোষ, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতা সংবাদ বিভাগের কাজ বেড়ে যায়। সেই সময় ভোর ছ-টা কুড়ি মিনিটে দিনের প্রথম সংবাদ শুরু হয়। কিছুদিন রাত বারোটাতেও একটা সংবাদ প্রচার হত। ১৯৭৫-এ দেশের মধ্যে কলকাতা কেন্দ্রই 'গ্রামীণ সংবাদ' চালু করে। ১৯৭৬ খ্রি. নাগাদ মোট বারোটি সংবাদ বুলেটিন এবং চারটি সংবাদভিত্তিক ভাষ্য প্রতিদিন প্রচার হত। আর সংবাদ বিচিত্রা হত সপ্তাহে তিন

দিন, দ্বিভাষিক বাংলা ও ইংরেজিতে। আর এখন তো সংবাদ-ভাষ্যের সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে সংবাদ বুলেটিন। প্রতি ঘণ্টায় দু-মিনিটের ‘এফ. এম.’ বুলেটিন প্রচারিত হচ্ছে। শুরু হয়েছে খেলার খবরও।

রবীন্দ্রজন্মের সার্ধশতবর্ষ এবং 'আকাশবাণী'-বিতর্ক

প্রসাদরঞ্জন রায়

সারাদেশ জুড়ে রবীন্দ্রজন্মের সার্ধশতবর্ষ পালিত হচ্ছে বেশ সাড়ম্বরে—কোথাও পালিত হচ্ছে ২০১০-১১ অর্থ বর্ষে, আবার কোথাও বা ২০১১-১২ অর্থবর্ষে, কারণ উদ্যোক্তারা স্থির করতে পারছেন না যে, রবীন্দ্রজন্মের ১৪৯ থেকে ১৫০ বছর না ১৫০ থেকে ১৫১ বছর ধরে উৎসব করাটা সংগত হবে। অথচ দক্ষিণ ভারতে একটা বিতর্ক উঠেছে 'আকাশবাণী' নামটির উৎস নিয়ে এবং কর্ণাটক ও কেরল দুই রাজ্যই এই সম্মানের দাবিদার। খবরটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছোয়নি এবং আমরা বাঙালিরা জেনে এসেছি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা থেকেই এই নামের উৎপত্তি। অথচ, *The Hindu, Indian Express* এবং অন্য দু-একটি খবরের কাগজ এবং ইন্টারনেটে এ নিয়ে বছর খানেক ধরে লেখালেখি চলছে।

১৯৩৫ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ডা. এম ভি গোপালস্বামী নিজের উদ্যোগে নিজের বাড়িতে একটি বেতার ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে সম্প্রচার আরম্ভ করেন। অর্থ সমস্যার জন্য তিনি ১৯৪১ সালের পর আর কেন্দ্রটি চালাতে পারেননি। তদানীন্তন মহীশূর 'নেটিভ স্টেট' প্রশাসন কেন্দ্রটির ব্যবস্থাপনার ভার নেন, যদিও ডা. গোপালস্বামীই স্টেশন ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৪৩ সালে সে-দায়িত্ব নেন আর এক অধ্যাপক ডা. এন কস্তুরী। এই বেতারকেন্দ্রটি নাকি 'আকাশবাণী মহীশূর' নামে পরিচিত ছিল। এই দাবিরও কিছু প্রমাণ আছে। লক্ষণীয় যে স্বাধীনতার পরে মহীশূর রাজ প্রশাসন ভারত সরকারের অঙ্গীভূত হয় এবং ১৯৫০ সালে এই বেতার কেন্দ্রের সরঞ্জামগুলি নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাঙ্গালোরে। ১৯৫৫ সাল থেকে ব্যাঙ্গালোর থেকেই চলছিল AIR, Mysore; আবার ১৯৭৪ সালে ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্র ছাড়াও মহীশূর কেন্দ্র চালু হয় মহারাজের আমলের সেই সুদৃশ্য বাড়িতে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আকাশবাণী, মহীশূরের প্ল্যাটিনাম জুবিলি পালিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে *The Hindu* পত্রিকায় ১৮ সেপ্টেম্বর ও ৩০ অক্টোবর দুটি খবর প্রকাশিত হয়। তাতে ডাঃ গোপালস্বামীকে 'radio pioneer' আখ্যা দিয়ে লেখা হয় (৩০ অক্টোবর, ২০১০) :

> 'The radio station flaunted with aplomb the title 'Akashvani Mysore' on its facade and later on when AIR came under the administrative fold of the Indian Government, the radio stations continued to use the name 'Akashvani' and hence the credit for lending this beautiful name to all the AIR stations in the country goes to Mysore Akashvani.'

এই উপলক্ষ্যে আকাশবাণী, মহীশূরের বর্তমান স্টেশন ডিরেক্টর শ্রী এম এল বিজয়া হরণের উদ্যোগে একটি ৪০৬ পাতার souvenir-এ শ্রী এম এস বিজয়া হরণ নিজে লিখেছেন :

> Dr. M. V. Gopalswamy is the father of Mysore *Akashvani*. He served as the professor of psychology and principal of the Maharaja's college. The radio stations that he started in 1935 in Mysore is his great contribution to the field of culture. This was the first private radio station in the whole of India and it speaks volumes of a person's interest, passion, hard work and the instinct to do good to his fellow human beings...
>
> For six long years Dr. Gopalaswamy ran AIR single-handedly spending money from his own pocket. Owing to financial constraint he handed over the administration to the

Mysore city municipality. Later from 1 January 1942, the provincial government of the Maharaja assumed the responsibility of running the organisation.

'Even then Dr. M. V. Gopalaswamy continued to be director (till 2 August 1943). After that his colleague, Prof. N Kasturi was appointed full-time chief executive with the designation 'assistant station superintendent.' The radio station continued to function under the care of Kasturi, who was a thorough gentlemen and a well-known humourist...

এই সাধুবাদ ডাঃ গোপালস্বামীর অবশ্যই প্রাপ্য, তবে মহীশূরই ভারতের প্রথম 'প্রাইভেট' রেডিয়ো স্টেশন—এ বক্তব্যটি সর্বৈব মিথ্যা—কারণ ১৯২৩ সালে বা আরও আগে বোম্বাই ও কলকাতায় Radio Club-এর মাধ্যমে নিয়মিত সম্প্রচার হত এবং Indian Broadcasting Company এ-দুটি শহরে প্রথম বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে ১৯২৭ সালে। কিন্তু সমস্যা কেবলমাত্র এখানে নয়—প্রশ্ন উঠেছে—'আকাশবাণী' নামকরণ করেন কে—গোপালস্বামী না কস্তুরী? ডাঃ বিজয়া হরণ এর পরে আরও লিখেছেন :

It was during that [Kasturi] period that All India Radio was baptised as 'Akashvani' a name that has been an appropriate metaphor for this wonderful organisation. The radio station flaunted with aplomb the title, 'Akashvani Mysore' before its facade. It wafted on the waves and reached the hearts of listeners lending them undimmed pleasure. Later on, when All India Radio came under the administrative fold of the Indian government, the radio stations continued to use the name 'Akashavani'. The credit of lending the beautiful name 'Akashvani' to all the radio stations of the conutry belongs to Mysore Akashvani.

এ প্রসঙ্গে *Star of Mysore* সান্ধ্য পত্রিকায় রাধা চেঙ্গাপ্পা আরও লিখেছেন :

The truth is revealed by late N. Kasturi in his book *Loving God*,...where he referes to his colleague Dr. M V. Gopalaswamy of Maharaja's College, Psychology Department.

He writes that Dr. MVG has bought a mini Philips transmitter and desired to use it to broadcast educational programmes for the common man an hour everyday. After some years, he managed to secure persmission to use short wave transmission programmes.

For this project, he had roped in Kasturi and when he wanted an Indian word for the broadcasting station, Kasturi's choice was *Akashvani* and this word stuck for AIR (All India Radio)'.

লক্ষণীয় যে কস্তুরী দায়িত্বভার নিয়েছেন ২ অগাস্ট, ১৯৪৩ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাটি লিখবার পাঁচ বছর পরে। অথচ মহীশূর থেকেই AIR-এর নাম পরিবর্তন হয়ে 'আকাশবাণী' হয়েছে এ সংবাদটি মহীশূরে এত প্রচলিত যে আকাশবাণী, মহীশূরের প্রাক্তন স্টেশন ডিরেক্টর জ্যোৎস্না কামতে তাঁর ওয়েব-সাইট Kamat's Potpourri-তে তা উল্লেখ করেছেন, Wikipedia-তে মহীশূর এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রিতে একথা ঢোকানো হয়েছে। অন্য দিকে All India Radio-র ওয়েবসাইটেও এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। অন্যত্র AIR-এর ইতিহাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া আছে।

এদিকে souvenir-টি প্রকাশের পর একটি নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে :

palini r swamy writes: Mysore's pre-eminent position in the setting up and christening of All India Radio as 'Akashvani' has gone uncontested for well over half a century. Now, in the 75th year of AIR, an unlikely challenger has emerged from 300 km away.

A 70-year-old woman has stood up in Udupi to assert that it was her late father, Hosbet Rama Rao, a former district education officer in Mangalore, who was the man who first

> used—and thus gave the nation—the unquestionably evocative brand-name, 'Akashvani', for the radio. In other words, the claim busts the belief widely held by Mysoreans that it was their townsman M. V. Gopalaswamy who coined the word after setting up the nation's first private radio station in his residence 'Vittal Vihar', about 200 yards from AIR's current location.

রামা রাও-এর কন্যা, অনুরাধাগিরি রাও বলেছেন তাঁর বাবা ১৯৩২ সালে 'আকাশবাণী' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, অবশ্য পুস্তিকাটিতে লেখকের নাম ছাপা হয়নি। ১৯৮৭ সালে *Indian Express* পত্রিকায় নাকি একথা লেখা শুরু হয়েছিল। এ নিয়েই কেরল-কর্ণাটক দ্বৈরথ যুদ্ধের শুরু। লক্ষণীয় যে ১৯৩২ সালে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কোনো বেতার কেন্দ্রই ছিল না। আবার All India Radio ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও মহীশূর বেতারকেন্দ্র ছিল তার আওতার বাইরে। ১৯৫৭ সালে যখন All India Radio-র নাম সরকারিভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'আকাশবাণী' হয়, তখন মহীশূরে বেতার কেন্দ্রটি ছিলই না। তা হলে?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বেতারের সম্পর্কটি একটু খতিয়ে দেখা যাক। বেতারের জন্মমুহূর্ত থেকে কলকাতার সঙ্গে বেতারের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ জগদীশচন্দ্র বেতার গবেষণায় একজন পথিকৃৎ এবং ১৮৯৫ সালে তিনি জনসমক্ষে বেতার তরঙ্গ সম্প্রচার ও গ্রহণ ব্যবস্থার প্রদর্শন করেন কলকাতা টাউন হলে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির সামনে। আমাদের দেশে অনেকেরই ধারণা এজন্য জগদীশচন্দ্রের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্য ছিল, তা কোনো মতে ছিনিয়ে নিয়েছেন মার্কনি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের (যার একটি অংশ রেডিয়ো বা বেতার-তরঙ্গ) তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৬৪) এবং তার পরীক্ষানিরীক্ষার অগ্রণী ছিলেন জার্মানি বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্ৎজ। তবে ১৮৮৮ সালের পর হার্ৎজ এই গবেষণায় আর এগোননি, এর ব্যাবহারিক গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না তিনি এবং মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ১৮৯৪ সালে তিনি মারা যান। হার্ৎজের পর প্রায় সমান্তরাল ভাবে এই গবেষণা চালিয়ে যান ইংল্যাণ্ডে অলিভার লজ, ভারতে জগদীশচন্দ্র, ফ্রান্সে এদুয়ার্দ ব্রানালি, রাশিয়াতে আলেকজাণ্ডার পোপভ, আমেরিকার নিকোলা টেসলা এবং ইটালিতে (পরে ইংলণ্ডে) গুগিয়েলমো মার্কনি। প্রসঙ্গত বলা যায়, বিষয়টিকে তখন বলা হত Wireless Telegraphy। বাংলায় Wireless কথাটির সহজ অনুবাদ হয়ে দাঁড়ায় বেতার। Radio কথাটি ১৯২০-র দশকের আগে তেমন চালু হয়নি। তখনকার দিনে গবেষণা নিবন্ধে এই তরঙ্গকে (অর্থাৎ উচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ) বলা হত 'হার্ৎজীয় তরঙ্গ', জগদীশ নিজের বাংলা লেখায় ব্যবহার করেছেন 'আকাশ স্পন্দন' বা 'অদৃশ্য আলোক'। আমরা রেডিয়ো তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গ বলতে পারি। বিলেতে জগদীশের যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখে অলিভার লজও বিস্মিত হন। কিন্তু ১৮৯৯ সাল থেকে তাঁর গবেষণার গতিপথই পালটে যায়, অভিমুখ গিয়ে পড়ে উদ্ভিদ ও নিষ্প্রাণ বস্তুর ওপর বিভিন্ন উত্তেজকের প্রভাব নিয়ে। গবেষণাকে অর্থকরী কাজে লাগানোতে বরাবরই তাঁর আপত্তি ছিল এবং ১৯০১ সালে তিনি দুটি বিরাট টেলিগ্রাফ কোম্পানির বেতার বিষয়ক পেটেন্ট নেওয়া ও তাঁর আবিষ্কারকে কার্যকারী ও অর্থকরী দিকে নেবার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর দুটি চিঠিতে (৩ জানুয়ারি ও ১৭ মে, ১৯০১) তা স্পষ্ট। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৮৮৭ সালে শুরু হলেও রবীন্দ্র-জগদীশ সম্পর্ক দু-বছরের মধ্যে গভীর সৌহার্দ্যে পরিণত হয়—তাঁদের পত্রালাপই তার প্রমাণ। অন্যদিকে মার্কনি নিজের আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে ইটালি ছেড়ে sponsor-এর খোঁজে ইংল্যাণ্ডে আসেন, ১৮৯৭ সালে Salisbury Plains-এ বেতার সম্প্রচার প্রদর্শন করেন এবং ১৯০২ সালের মধ্যে আটলান্টিক পেরিয়ে বেতার সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তখন বেতার তরঙ্গে মর্স কোডে সংকেতেই পাঠানো যেত, পরে ভাষ্য সম্প্রচারের ব্যবস্থা হয়। ১৮৯৭ সালে তিনি মার্কনি কোম্পানি খোলেন, সেবছরই পেটেন্ট পান এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংল্যাণ্ডে ও ইউরোপে তাঁর প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। কেবল আমেরিকাতে আগেই পেটেন্ট নিয়ে টেসলা তাঁকে আইনি যুদ্ধে ঠেকিয়ে

রেখেছিলেন, সেখানেও আইনি লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত মার্কনি জিতে যান সুপ্রিমকোর্টে। বেতার সম্প্রচারের জন্য মার্কনি ১৯০৯ সালে যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জগদীশ তার অনেক আগেই বেতার-গবেষণা থেকে সরে এসেছেন, কিন্তু আজও বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, তাঁর তৈরি Coherer (বা গ্রাহক যন্ত্র) ছিল অনেক উন্নত এবং Semiconductor-এর ব্যবহার ও 'মাইক্রোওয়েভ' তরঙ্গ (যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিলিমিটার-এর ঘরে) উৎপাদনে তিনিই পথিকৃৎ।

জাহাজে বেতার সম্প্রচার ও গ্রহণ ব্যবস্থায় মার্কনি ছিলেন সারাদুনিয়ায় এক নম্বর। কলকাতাতেও ১৯১২ সালে মার্কনি কোম্পানি অফিস খোলে British India Steamship Navigation Company-র বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। অবশ্য স্বয়ং মার্কনি সাহেব কখনো জগদীশচন্দ্রের শহরে পদার্পণ করেননি। সম্প্রতি জগদীশচন্দ্রের সার্ধশতবর্ষ উৎসবে কলকাতায় (২০০৮) যোগ দিতে আসেন তাঁর নাতি জ্যোতির্বিদ ফ্রানসেস্কো মার্কনি। তিনিই সপরিবারে প্রথম কলকাতায় আসেন ২০০৬ সালে। তবে মার্কনি-জগদীশচন্দ্র সাক্ষাৎ হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে (১৯০০)। তাঁদের অফিস ছিল প্রথমে হেস্টিংস স্ট্রিটে এবং পরে ৬নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে 'টেম্পল চেম্বার্স' নামে এক ঐতিহাসিক বাড়িতে। এখান থেকেই মার্কনি কোম্পানি প্রথম পরীক্ষামূলক সম্প্রচার করেন এবং তাঁদের সম্প্রচার যন্ত্র নিয়েই গড়ে ওঠে Bengal Radio Club (১৯২৩)। আবার মার্কনি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয় Indian Broadcasting Company (১৯২৬) যাঁরা ১৯২৭ সালে বোম্বাই ও কলকাতায় 'নিয়মিত' বেতার কেন্দ্র চালু করেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কাজ শুরু হয় ওই 'টেম্পল চেম্বার্স'-এ, যদিও তাঁরা শীঘ্রই চলে যান ১ নং গারস্টিন প্লেসের ভাড়া বাড়িতে। Indian Broadcasting Company কিন্তু বেশিদিন চলেনি, আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে তা liquidation-এ যায় ১৯৩০ সালে। ওই বছরের ১ এপ্রিল থেকে সরকার বেতারকেন্দ্র দুটির দায়িত্ব নেয় Indian State Broadcasting Service নামে, ১৯৩৬ সালে তা রূপান্তরিত হয় All India Radio-তে।

১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট কলকাতা বেতার কেন্দ্র চালু হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান করেছিলেন দিনু ঠাকুর, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হয়েছিল। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে বেশ কয়েকজন গায়ক রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন এবং ১৯৩০ সাল থেকে 'সংগীত শিক্ষার আসর' পরিচালনা করতেন রবীন্দ্রস্নেহধন্য পঙ্কজকুমার মল্লিক। সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানও শেখানো হত, বলা হয় ১৯৩১ সালে কলকাতা বেতারেই পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রথম 'রবীন্দ্রসংগীত' কথাটি ব্যবহার করেন। ১৯২৮ সালে 'বেতার নাটুকে দল' গঠিত হবার পর ১৯৩০-৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের *গৃহপ্রবেশ, শেষরক্ষা* ও *শোধবোধ* অভিনীত হয়। পরে অবশ্যই বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং অন্যান্যদের প্রযোজনায় বহুবার সম্প্রচারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহু নাটক, নৃত্যনাট্য ও গল্প/উপন্যাসের নাট্যরূপ। ১৯২৯ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল *পাক্ষিক বেতার জগৎ* পত্রিকা, সম্পাদনায় ছিলেন প্রথমে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও তাঁর পরে নলিনীকান্ত সরকার। এতে অনুষ্ঠানসূচি ছাড়াও শিল্প-সাহিত্যের কথাও কিছু কিছু ছাপা হত। রবীন্দ্রসাহিত্যও তার পরিধির বাইরে ছিল না।

কিন্তু কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের কর্তাদের একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও বেতারে কবিকণ্ঠ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না, কারণ কবি ছিলেন গররাজি। অথচ ১৯৩৬ সালে তিনি দিল্লি বেতার কেন্দ্রের অনুরোধ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। শেষপর্যন্ত জানা গেল তাঁর আপত্তির কারণ—কয়েকজন তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের বারংবার স্বরলিপি লঙঘন এবং 'হারমোনিয়ামের দৌরাত্ম্য'। বেতার-কর্তারা, বিশেষত ভারতীয় অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, সংগীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, স্টেশন ডিরেক্টর স্টেপলটন সাহেব ও তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী স্টেশন ডিরেক্টর অশোককুমার সেন, এমনকী Controller of Broadcasting লায়নেল ফিলডেন সাহেব শুদ্ধ, এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং আদেশনামা বলে হারমোনিয়াম ব্যবহার নিষিদ্ধ হল ও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে বারোজন শিল্পী নির্বাচিত হলেন

রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য। ১৯৩৮ সালেই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁর কণ্ঠস্বর সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। কবি তখন কালিম্পঙে। ট্রাঙ্ক টেলিফোনের মাধ্যমে ২৫ বৈশাখ রাত ৮টায় সম্প্রচার করা হয় :

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছি সেবিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে, কী জানি,
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে, নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এইযে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।
আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন, মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম—
একমন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

এই তাঁর কলকাতা বেতারে প্রথম সম্প্রচার।

এর পর তাঁর সঙ্গে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে ওঠে। তিনি *শেষের কবিতা*-র বেতার নাট্যরূপ কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারের অনুমতি দেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর জন্মদিনে পুরী থেকে আবার রেকর্ডিং ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা হয়। তিনি বাংলা ইংরেজিতে শেষপর্যন্ত আটটি কবিতা রেকর্ড করেন। এর মধ্যে ছিল তাঁর বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি। সে-বছরেই অশোককুমার সেনের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ আসেন ১নং গারস্টিন প্লেসের কলকাতা বেতারকেন্দ্রে। সেদিন ফিলডেন সাহেবের পরিবর্তে Controller General of Broadcasting বোখারি সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। এদিনের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে পঙ্কজকুমার মল্লিকের স্মৃতিচারণে, *কলকাতা বেতার* (১৯২৭-১৯৭৭) বইতে তার অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হয়েছে। এর পরেই তিনি শান্তিনিকেতনে কলকাতা বেতারের জন্য তিনটি বক্তৃতা রেকর্ড করেন। সেই সঙ্গে বেতার কর্তৃপক্ষ রেকর্ড করেন কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত ও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য। চিত্রাঙ্গদা-রূপে অভিনয় করেছিলেন নন্দিতা কৃপালনী।

১৯৩৯ সালেই রবীন্দ্রনাথ দু-বারে দীর্ঘ সময় মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে ছিলেন। সে-সময়ে তাঁর একটি আবৃত্তিও কলকাতা বেতারের জন্য রেকর্ড করা হয়, যদিও সে-রেকর্ডটি নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ বেতারে গান ও সংবাদ শুনতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১৯৪৩) গ্রন্থে লিখেছেন :

> সকাল সাড়ে নটা দশটার সময় খাওয়া হয়ে গেলে বসবার ঘরে এসে বসতেন একটা চৌকিতে, হাতে থাকত একটা বই বা কোনো মাসিক পত্র—রেডিওতে বাজত সুশ্রাব্য অশ্রাব্য মেশানো প্রোগ্রাম, কিছু শুনতেন, কিছু শুনতেন না। 'ইয়োরোপের সংগীত শুনছিলুম গো আর্যে, কী আশ্চর্য এই যন্ত্রটা। কোন সুদূর থেকে কত রাজ্য পার হয়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি। সেদেশে এখন কত কান্ডই চলেছে, মারামারি, হানাহানি, সব পার হয়ে আসছে একখানি সুর, তার মধ্যে একটুও ছায়া পড়েনি সেখানকার জীবনের। যেখানে এই গান গাওয়া হচ্ছে সেখানেও তো নানারকম ব্যাপার চলেছে, নানা রকম ঘটনাপ্রবাহ। কত লোক আসছে যাচ্ছে—যে গান গাইছে তারও একটা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সেসমস্তকে বাদ দিয়ে একটি সকল সম্পর্করহিত নিরাসক্ত সুরের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। মনে

পড়ে যখন বোটে বসে লিখতুম, চারিদিকে জল বয়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনিতে, দূরে দেখা যায় বালির চর ধূ ধূ করছে, আমি লিখে চলেছি লিখেই চলেছি 'মানসী' (মানসসুন্দরী)। যখন শুরু করেছিলাম তখন ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর, তারপরে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল আলো, আকাশ রঙ্গীন করে অস্ত গেল সূর্য। একটিমাত্র চাকর বোটে থাকত আমার নীরব সঙ্গী, সেকখন নীরবে মিটমিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল। আমি লিখেই চলেছি মানসী। আজ কোনো কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে ছন্দ-বন্ধ-গ্রন্থ-গীত এসো তুমি প্রিয়ে। কোথায় গেল সেই দিন। সেই পদ্মার চর, ধূ ধূ করে সোনালি বালি, সেই মিটমিটে শিখার ম্লান আলো, সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে, শুধু আছে মানসী, তার যে পরিবেশ ছিল সেতো মুক্ত হয়ে গেল—এমনকি তার সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে তার কবিও। চারিদিকের সমস্ত সূত্র তার ছিন্ন, সেশুধু একখানি সূত্রছিন্ন বাণী।...তোমার এই রেডিওর গান শুনছি আর এইসব ভাবছি।

সেইদিন একটা প্রকান্ড কবিতা লিখেছিলেন এ বিষয়ে নিয়ে। তারপর পরিবর্তন করতে করতে একটা কবিতা থেকে দুটো কবিতা হয়। তার একটা 'সাড়ে নটা' নামে নবজাতকে, আর একটি 'মানসী' নামে সানাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'সাড়ে নটা' কবিতাটি (নবজাতক, ১৯৪০) প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

রেডিওর মধ্য দিয়া দূরদূরান্তের যে বিচিত্র সুরতরঙ্গ
ভাসিয়া আসে তাহার রহস্য কবিকে মুগ্ধ করে।
দেহহীন পরিবেশহীন
গীতস্পর্শ হয়েছে বিলীন
সমস্ত চেতন ছেয়ে।...
একাকিনী, বহি
রাগিণীর দীপশিখা,
আসিছে অভিসারিকা
সর্বভারহীনা।

অরূপা সে, অলক্ষিত আলোকে আসীন। সকল গিরিসাগর ঝড়-ঝঞ্ঝার বাধা অতিক্রম করিয়া যেমন সুরতরঙ্গ ভাসিয়া আসিতেছে, তেমনি দূরকালের ছন্দ ধ্বনিত হইয়া রূপ লইয়া আছে কাব্যে।

যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।...
যুগ যুগ হয়ে গেল পার

যে-রেডিয়ো যন্ত্র সম্বন্ধে একদিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে বলেছিলেন, 'তোমাদের এই রেডিও যন্ত্রটি ভবিষ্যতে অনেক উৎপাত ঘটাবে বুঝতে পারছি, ওর মধ্যে আর আমাকে টানাটানি কেন?' যে-প্রসঙ্গে অশোককুমার সেনকে রেডিও-র রেকর্ডিং মেশিন সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'ক্ষুদে শয়তান' তাকেই মেঘদূতের সঙ্গে তুলনা? এ নিশ্চয়ই বেতার সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন।

মংপু থেকে ফিরে অসুস্থ শরীরেও মেদিনীপুর যান 'বিদ্যাসাগর হল' উদ্বোধন করতে। অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করে কলকাতা বেতার। সম্ভবত কলকাতা বেতারে এই তাঁর শেষ অনুষ্ঠান। ১৯৪১ সালে যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলকাতায় আসেন, কলকাতা বেতার ১৫ মিনিট অন্তর তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে 'বুলেটিন' সম্প্রচার করত। ২২ শ্রাবণ সব শেষ হয়ে যাবার পর তাঁর শেষযাত্রার ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র চোখের জলে ভিজে। সেও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

১৯৩৮ সালের অগাস্ট মাসে কলকাতা বেতারকেন্দ্রে শক্তিশালী শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার চালু হয়, উদ্বোধন করেন বাংলার গভর্নর স্যার রবার্ট রিড। এই উপলক্ষ্যে *বেতার জগৎ* পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত

হয় ও তার জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী চাইতে শান্তিনিকেতন যান সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ তখনই কিছু লিখে দিতে পারেননি, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে *বেতার জগৎ* দপ্তরে পৌঁছে যায় এই নামহীন কবিতাটি, রবীন্দ্রনাথের নিজ হস্তাক্ষরে এবং তাঁর একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর চিঠি সমেত :

‘ধরার আঙিনা হ’তে ঐ শোনো
উঠিল আকাশবাণী,
অমরলোকের মহিমা দিল যে
মর্ত্যলোকেরে আনি।
সরস্বতীর আসন পাতিল
নীলগগনের মাঝে
আলোক-বীণার সভামন্ডলে
মানুষের বীণা বাজে।
সুরের প্রবাহ ধায় সুরলোকে
দূরকে সেনেয় জিনি,
কবি-কল্পনা বহিয়া চলিল
অলখ সৌদামিনী।
ভাষা-রথ যায় পূবে-পশ্চিমে
সূর্যরথের সাথে,
উধাও হইল মানবচিত্ত
স্বর্গের সীমানাতে।’

ঐতিহাসিক এই নামহীন কবিতাটির রচনাকাল আগস্ট, ১৯৩৮। রবীন্দ্র হস্তাক্ষরেই ব্লক তৈরি করে তা ছাপা হয় *বেতার জগৎ* পত্রিকার ১৬ অগাস্ট ১৯৩৮ সংখ্যায়। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় স্ফুলিঙ্গ (১৯৪৫) এবং রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তার একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৯৬১), তাতেই কবিতাটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ একটি brochure প্রকাশ করেন, তাতে এর একটি ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়। অনুবাদটি নীচে দেওয়া হল :

Hark to Akashvani upsurging
From here below
The earth is bathed in Heaven’s glory
Its purple glow
Across the blue expanse is firmly planted
The altar of the Muse
The lyre unheared of light is throbbing
With human hues,
From earth to heaven distance conquered
In waves of light,
Flows the music of man’s divining
Fancy’s flight.

To East and West speech careers

Swift as the Sun
The mind of man reaches Heaven's confines
Its freedom won.

(অনুবাদক অজ্ঞাত)

আমরা বরাবর জেনে এসেছি যে, এই কবিতায় ব্যবহৃত 'আকাশবাণী' শব্দটি থেকেই All India Radio-র নাম হয়েছে 'আকাশবাণী'। ১৯৫৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে নামটি চালু হয়েছে এবং এর পরের বছর গারস্টিন প্লেস ছেড়ে ইডেন গার্ডেনসে কলকাতা বেতারকেন্দ্র উঠে যায় তার পাকাপাকি ঠিকানা 'আকাশবাণী ভবন'-এ। কর্ণাটক-কেরল নামের মালিকানা নিয়ে সমস্যা দেখে সবিস্ময়ে লক্ষ করি All India Radio-র ওয়েবসাইটে (সরকারি অথবা Wikipedia) এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। বর্তমান বছরে (২০১১) পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে কলকাতা বেতার (১৯২৭-১৯৭৭) নামে একটি চমৎকার বই বেরিয়েছে, তাতে বহু মূল্যবান তথ্য আছে, তার বেশ কিছু এই প্রবন্ধে ব্যবহারও করা হয়েছে। 'ধরার আঙিনা হতে' নামে একটি লেখকনামহীন রচনায় এই কবিতাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হলেও এ সম্বন্ধে শুধু বলা হয়েছে 'তাৎপর্যপূর্ণ 'আকাশবাণী' শব্দটির ব্যবহারও'। ওই বইয়ের পরিশিষ্টে 'রেডিওয়োপঞ্জি' নামে মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় বহু মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। তিনি ১৯৩৮ সাল প্রসঙ্গে লিখেছেন 'সেবছর ৫ অগাস্ট লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি—'ধরার আঙিনা হতে ঐ শুনি উঠিল আকাশবাণী' আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। আবার ১৯৫৭ সাল প্রসঙ্গে লিখেছেন '১ এপ্রিল 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-র অন্যতম নাম 'আকাশবাণী' রাখা হয় পাকাপাকিভাবে। যদিও কলকাতা বেতারে এর কয়েক বছর আগে থেকেই ঘোষণায় অবরে-সবরে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে 'আকাশবাণী কলকাতা' কথাটি উচ্চারিত হত এবং *বেতার জগৎ*-এও মুদ্রিত হত। ১৯৫৫ সালে মহীশূরের দেশীয় রাজ্যের প্রাইভেট বেতার সম্প্রচার 'আকাশবাণী' অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় 'অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো'-র অন্যতম 'আকাশবাণী' নামকরণে আর আইনগত জটিলতা ছিল না। এই নামকরণে অশোককুমার সেনের আগ্রহ ও ভূমিকা ছিল উল্লেখ্য। এতেও কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হল না। 'আকাশবাণী' কর্তৃপক্ষের কি উচিত নয় তাঁদের তৎকালীন নথি ও ১৯৫৭ সালের আদেশনামা দেখে একটি স্পষ্টীকরণ (Clarification) দেওয়া?

প্রসঙ্গত, আর একটি প্রশ্ন উঠে আসে। সত্যিই কি All India Radio-র সরকারিভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'আকাশবাণী' হয়েছে, নাকি এটি 'All India Radio'-র হিন্দি প্রতিশব্দ? এখনও দেখছি বিভিন্ন নোটিশ বা সরকারি আদেশনামায় DG, AIR বা DDG, AIR এরকমই লেখা হচ্ছে, কেবল ভবনের নাম হয়েছে 'আকাশবাণী ভবন'। এমনকী ইন্টারনেটে দেখছি দ্বিভাষিক AIR Mannual, তার হিন্দি পাতায় দেবনাগরী হরফে লেখা 'আকাশবাণী নিয়ম পুস্তক'। সঠিক কী ছিল সেই আদেশনামায়? অথচ Doordarshan বা Prakash Bhrarati নাম দুটি এরকমভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে ইংরেজিতেও।

পরিশেষে আবার বলি, কারুর কৃতিত্ব ছোটো করে দেখানো এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। Radio pioneer হিসেবে ডাঃ গোপালস্বামী বা ডাঃ কস্তুরী যা করে গেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। হোসবেটে রামা রাও-এর লেখা বইটিও ফেলে দেবার নয়। তবে ভারত সরকার কোথা থেকে নামটি গ্রহণ করলেন, তা স্পষ্ট করে দেওয়া তাঁদেরই কর্তব্য। আরেকটি কথা, যদি 'আকাশবাণী' শব্দটি আগে ব্যবহার করাই নামটির 'মালিকানা'-র (?) প্রমাণ হয়, পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই *সন্দেশ* পত্রিকায় সুকুমার রায়ের Wireless Telegraphy ও Wireless Telephony সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের কথা : নাম 'আকাশবাণীর কল'। এই প্রবন্ধে সুকুমার লিখেছেন :

> এমনি করে 'যে গান কানে যায় না শোনা', যে গান আকাশের তরঙ্গে চড়ে বিদ্যুতের মতো বেগে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, সেই অশব্দ গানকে আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ আবার তাকে কলের মধ্যে ধরে আকাশের ভাষা ও আকাশের সুর শুনছে। আমাদের দেশে গল্পে ও পুরাণে যে আকাশবাণীর

> কথা শুনতে পাই, এও যেন সেই আকাশবাণীর মতো। কোথাও কোন আওয়াজ নাই, জনমানুষের সাড়া নাই, অথচ কলের মধ্যে কান দিলেই শুনি আকাশময় কত কণ্ঠের কত ভাষা, কত বিচিত্র গান আর কত যন্ত্রের সুর।

প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ অর্থাৎ ১৯২২ সালের মে/জুন মাস, অর্থাৎ হোসবেট রামা রাও-এর দশ বছর আগে। তাহলে বর্তমান অর্থে (পৌরাণিক ক্ষেত্রে নয়) 'আকাশবাণী' কথাটি প্রথম ব্যবহারের কৃতিত্ব কি বাংলা দেশেই আসে না?

চতুরঙ্গ পত্রিকায় এই দীর্ঘ আলোচনা মানানসই হবে কিনা, প্রশ্ন ছিল। কিন্তু দেখলাম ১৯৪২ সাল থেকে *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় বেতার প্রসঙ্গে লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, অশোক মিত্র, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯) :

> আধুনিক বিজ্ঞান এ পর্যন্ত যত আজব কল বানিয়েছে তার মধ্যে আজবতম হচ্ছে রেডিয়ো। কিন্তু এই তাজ্জব যন্ত্রটির ঠিক যে-রকম ব্যবহার হওয়া উচিত, এবং যতখানি হওয়া উচিত, তা এখনো হতে পারছে না। তার কারণ অবশ্য না-বললেও চলে: যুদ্ধের সম্ভাবনা কিংবা সাক্ষাৎ যুদ্ধ, মার্ক্সিস্টদের ভাষায় সাদা লড়াই কিংবা লাল লড়াই। রেডিয়োর জন্ম বিশ শতকে এবং ইতিহাসের ঘূর্ণিচক্রে বিশ শতকের প্রথম থেকেই পৃথিবীর বড়ো বড়ো দেশগুলিতে সাদা কিংবা লাল লড়াই লেগেই আছে, এবং প্রত্যেক দেশেই অন্য সব শক্তির মতো বেতারকেও প্রধানত লড়াইয়ের কাজেই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। ১৮৪৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত পশ্চিম ভূখণ্ডে যে অপেক্ষাকৃত শান্তির সময় গেছে, রেডিয়ো তার কিছুই প্রায় ভোগ করতে পারেনি, বেচারা জন্ম থেকে দেখছে বিশ্বব্যাপী অশান্তি। যেকোনো আকারে যুদ্ধ যখন চলতে থাকে তখন যুদ্ধের প্রয়োজনই সবচেয়ে বড়ো, সে-দাবি মেটাতেই রেডিয়োর দম প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে। সে যা করতে পারে তা করবার সুযোগই সে বলতে গেলে এখনো পায়নি। অসীম ক্ষমতা তার, মানুষে মানুষে মিলনসাধনে, ভেদবুদ্ধির দূরীকরণে, বিশ্বমানবিকতার ভিত্তি স্থাপনে তার যতখানি প্রভাব এমন আর কোনো একটি জিনিসেরই নয়, কিন্তু ও-সব কাজে লাগাবার সুযোগ বা সময় তার কই?

যতদিন বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তি না হয়, ততদিন রেডিয়োর পূর্ণ সার্থকতা অসম্ভব এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ। এর থেকে কিছুটা সরে গিয়ে প্রতিভা বসু লেখেন (চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯) :

> বৈজ্ঞানিক সাফল্যে আজকাল সমস্ত পৃথিবীতেই যে একটা পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তার সবচেয়ে বড়ো সূত্রই হচ্ছে রেডিয়ো। কাজে কাজেই রেডিয়োর কাছে দাবিটা আমাদের সকলেরই একটু বেশি। সারা পৃথিবীর মুখপাত্র এই ছোট্ট বাক্সটি যখন নানা ভাষায় নানা কণ্ঠে কলকল করে ওঠে তখন বাস্তবিকই রোমাঞ্চিত না হয়ে পারি না। কিন্তু একথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে যে, কলকাতার বেতার কেন্দ্র এদিক থেকে আমাদের বড়ই হতাশ করে। কলকাতা এমন একটি নগর যেখানে জ্ঞানী-গুণীর অভাব নেই কিন্তু রেডিয়োর মারফৎ তাঁদের আমরা পাই-না বলতে গেলে শুধু এর মধ্যে গাইয়েদের কিছু কিছু পাওয়া যায় কিন্তু সাহিত্যিক বা চিত্রশিল্পীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বড়ই উদাসীন।

আরও কড়া ভাষায় অশোক মিত্র লিখলেন (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩২৬) :

> ছাত্র বয়সে কিছুদিনের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত এক হস্টেলে ছিলাম। সেবয়সে যা স্বাভাবিক ঘটনা, অল্প সময়ের মধ্যেই হস্টেলের বেতনবাহী তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে একটা আদ-কাঁচকলা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ছারপোকা আচ্ছন্ন চৌকিতে লম্বা হয়ে শুয়ে বলাবলি করতাম আমরা : পৃথিবীর অর্ধেক অপদার্থ ঢোকে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে, বাকি অর্ধেক ঢোকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটিতে। পরে জেনে চমৎকৃত হয়েছিলাম যে তত্ত্বাবধায়ক ভদ্রলোকটি ওখানে চাকরি নেবার আগে কিছুদিন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কাজ করে এসেছেন, বলতে গেলে পুরোপুরি রাজযোটক।

সেশৈশবমূঢ়তা এতদিনে কেটে যাবার কথা। ওই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গেও অবশ্য কোনো সংযোগই নেই আজকাল। অথচ, খুবই অবাক লাগছে ভেবে, অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগের অন্ত নেই। যা নিয়ে আমরা প্রত্যহ অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকি, যেমন নির্জীব গতানুগতিকতা, কল্পনাহীনতা, রুচিদৈন্য, আসলে এসব ব্যাপারে আমাদের সমালোচনা এক হিসেবে প্রক্ষিপ্ত, অকেজো। খুঁটিনাটি খুঁত দেখিয়ে বিপ্লব সংসাধন সম্ভব নয়, সংস্কৃতির উজ্জীবন এখানে ওখানে সামান্য মেরামতির কাজ নয়। সেজন্য প্রয়োজন শিক্ষার ঐতিহ্য, সৎসাধনার ধৈর্য্য, সাহসে দীপ্তি। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর বর্তমানে যাঁরা হাল ধরে আছেন, রূঢ় ভাষণ হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি তাঁদের কাছ থেকে ইত্যাকার চরিত্র আশা করা যায় না।

সবরকম মত নিয়েই তো আমাদের রেডিও।

তথ্যসূত্র :

১. *The Hindu* (Sep 18, 2010 & Oct, 30, 2010)–ইন্টারনেট থেকে।

২. Rebindranath Tagore Sans Serif–ইন্টারনেট থেকে।

৩. Acharya J C Bose : *The Scientific Legacy*–Bose Institute, 2004।

৪. The Inventions that Changed the World–*Readers' Digest*, 1982।

৫. *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র* (দ্বিতীয় খন্ড), শতবার্ষিকী সংস্করণ, আনন্দ, ১৯৮৯।

৬. All India Radio (website)–ইন্টারনেট থেকে।

৭. All India Radio (Wikipedia)–ইন্টারনেট থেকে।

৮. All India Radio, Kolkata (unofficial site)–ইন্টারনেট থেকে।

৯. *রবীন্দ্রজীবনী* (খন্ড ৪)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী।

১০. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (বিভিন্ন খন্ড)—পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১১. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ষোড়শ খন্ড)—গ্রন্থ পরিচয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।

১২. *কলকাতা বেতার,* সম্পাদনা ভবেশ দাশ ও প্রভাতকুমার দাস—পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১১।

১৩. *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ,* মৈত্রেয়ী দেবী, ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৪৩।

১৪. ব্যক্ত অব্যক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, *অনুষ্টুপ,* ২০১১।

১৫. *চতুরঙ্গ* থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিগুলি মূল সূত্র অবশ্যই *চতুরঙ্গ* পত্রিকা, তবে এখানে উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে *কলকাতা বেতার* বইটি থেকে।

সৌজন্য : *চতুরঙ্গ* বর্ষ ৬৯ সংখ্যা ১—২, বৈশাখ—আশ্বিন ১৪১৮

আকাশবাণী কলকাতার মুখপত্র 'আকাশতরঙ্গ' প্রথম সংখ্যা থেকে
সম্পাদকের সম্মতিক্রমে মুদ্রিত।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের আলোর বেণু

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

শরতের ভোরের আকাশ জুড়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের আলোর বেণু বেজে উঠলেই দুর্গাপুজো এসে যেত! এ আমাদের ছেলেবেলায় দেখা। সেও প্রায় অর্ধশতাব্দী হল, কিন্তু অবস্থাটা আজও একই রকম থেকে গেছে। শারদোৎসবের সূচনা আজও হয় মহালয়ার ঊষালগ্নে, আকাশবাণীর সেই চিরকালের অথচ চিরনতুন অনুষ্ঠানটির মধ্যে দিয়ে।

'মহিষাসুরমর্দ্দিনী!'
রচনা ও প্রবর্তনা : বাণীকুমার।
গ্রন্থনা ও শ্লোকপাঠ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।
সঙ্গীত পরিচালনা : পঙ্কজকুমার মল্লিক...

বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক—এঁদের কেউই আজ আর ইহলোকে নেই; শুধু বেঁচে আছে ওই অনুষ্ঠানটি, হয়তো বেঁচে থাকবে যতদিন বাঙালি পুরোপুরি আত্মবিস্মৃত না হয়।

যখন সঙ্গীত আর শিল্পের নামে প্রতিদিন নিবেদিত হচ্ছে পাহাড় প্রমাণ বিকৃতি আর কোলাহল এবং তা গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করছে এই নিশ্চেতন পিন্ডবৎ সমাজ, তখনো মানুষের 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' প্রীতি অবাক করে বৈকি! যখন বাংলা সংস্কৃতির মহত্তম সম্পদ পদাবলী কীর্তন বাঙালির কাছেই 'কেত্তন' রূপে চিহ্নিত, যখন এমনকি রবীন্দ্র সঙ্গীতই মুম্বাই-এর শিল্পীর উচ্চারণে না হলে প্রত্যাখ্যাত হয়, যখন বিজ্ঞানমনস্কতা ছাড়া আর সমস্ত মানবিক বৃত্তিই মিথ্যা এবং অর্থহীন বলে প্রচারিত, ধর্ম যখন কুসংস্কার বলে পরিত্যক্ত তখন এমন একটি অনুষ্ঠানের এই জনপ্রিয়তার অন্তর্নিহিত রহস্য কি, তা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার বিষয়। শুধুমাত্র স্মৃতিবৈধুর্য? শুধুমাত্র আশৈশব অভ্যাস?

যদি পুরোপুরি অস্বীকার নাও করি, যদি মেনেই নিই শৈশবের, বাল্যের, কৈশোরের সেই শারদ স্মৃতির আনুষঙ্গিকতা, তবু সেটাই একমাত্র কারণ যে নয়, তাও বুঝতে পারি নিশ্চিতভাবেই। আনুষঙ্গিকতা সত্ত্বেও শৈশবের সব কিছুই কি ধরে রাখতে পেরেছি? সমাজও কি অতীতের সব কিছু ধরে রেখেছে, রাখতেও চেয়েছে কি? পুরোনো দিনের কত শিল্পী, কত অসাধারণ গান কি হারিয়ে যায়নি আমাদের স্মৃতি থেকে? ওস্তাদ মৌজুদ্দীন খাঁ, কালে খাঁ, জোহরা বাঈ-এর মতো শিল্পীকে কি আমরা ভুলে যাইনি? প্রায় একশো বছর আগের সেসব অসাধারণ রেকর্ডের কথা আজ আর কজনই বা জানেন? শোনা যায়, গহরজান বাঈ-এর জনপ্রিয়তা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পীদের কাছে ছিল বিস্ময়েরও অতীত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁরও শতাধিক রেকর্ড বেরিয়েছিল। কালের বেড়া ডিঙিয়ে সেই সময়ের শিল্পীদের মধ্যে কেবলমাত্র আবদুল করিম খাঁর কিছু রেকর্ড আজও শোনা যায়, উচ্চারিত হয় তাঁর নাম; কিন্তু গহরজান মুছে যান, মুছে যান মৌজুদ্দীন খাঁ, কালে খাঁ! 'দুই হাতে কালের মন্দিরা' বাজিয়ে কোনো এক শরতের সকালে আমাদের বাড়িতে গেয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কিন্নরী সুধা মুখোপাধ্যায়। কলের গানের সেদিন আর নেই। নেই সুধা মুখোপাধ্যায়, নেই তাঁর স্মৃতিও। শুধু আমার সঙ্গে কোনোভাবে একবার দেখা হলে বলতাম, 'সুধা, বিশ্ব তোমায় ভোলেনি!' ভুলতে পারি না সুপ্রীতি ঘোষ, বিনতা রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত। কীর্তনশিল্পী উত্তরা দেবী, হরিদাস করের মতো শিল্পীর নাম কেই বা মনে রাখে! কীর্তনই আজ কলকাতিয়া সংস্কৃতিতে ব্রাত্য, কীর্তনীয়ার সমাদর তো আশা করাই ভুল।

তবু এই ব্যাণ্ডের শহর, জীবনমুখী গানের শহর, এই ধর্মহীন শহরেও 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র সমাদর আজও কেন? কি কারণে?

প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, এ শহরের ঐ বাইরের পরিচয়টা যতই সোচ্চার হোক, যতই প্রচারিত হোক—আসলে অপূর্ণ। আসলে মানুষ আর কলকাতার মানুষে তো খুব একটা পার্থক্য নেই, থাকার কথাও নয়। কলকাতার মানুষ কলকাতার বাইরে এই বিপুল ব্যাপ্ত জীবনকে যতই অস্বীকার করুক; কলকাতাকে যতই ব্রহ্মান্ডের কেন্দ্র ভাবতে চেষ্টা করুক, তাকেও মাঝে মাঝে তাকাতে হয় মনের কোণার বাইরে। এই আধুনিকতার অর্থহীন অভিমান ভুলে খুলে দিতে হয় চিরকালের অনন্তের জানলা। প্রকৃত শিল্পে অনন্তের প্রকাশ ঘটে। 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'তেও ঘটেছে এবং তার অম্লান আকর্ষণ সেখানেই। পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্যের বিচারকে মেলাতে গেলে যদি সংঘাত বাধে, তাতে পুরাণের মূল্যহীনতা প্রমাণিত হয় না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমর্থনে আমরা কি বেদ-পুরাণ অনুসন্ধান করি? আসলে করি না কখনোই এবং তার কারণ, সাহিত্য-শিল্পের কাছ থেকে আমরা যা আশা করি, যে রস আশা করি, বিজ্ঞানের কাছে ঠিক তা আশা করি না। যাঁরা রসগ্রাহী তাঁরা বস্তুতান্ত্রিক সত্যের জন্য শিল্পের, সাহিত্যের দ্বারস্থ হন না। শিল্পের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা গভীরতা, আনন্দ, সৌন্দর্য; এবং সেই কারণেই 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' আজও তাঁদের কাছে চির নতুন, অম্লান! বিজ্ঞানের জগৎ হল আমাদের এই তথাকথিত বাস্তব জগৎ, যে জগৎ আছে এবং যার অস্তিত্ব দ্রষ্টা নিরপেক্ষ বলে বিজ্ঞান দাবী করে। বিজ্ঞানের জগৎ বিজ্ঞানের সৃষ্টি নয়, বরং বিজ্ঞানের স্রষ্টা; কিন্তু শিল্পের জগৎ তার নিজস্ব, একান্তভাবেই তারই সৃষ্টি। রূপকথার জগতে বাস্তবের অনুসন্ধান করা অর্থহীন, কারণ সেজগৎ রূপকথাকারেরই গড়া এক আনন্দলোক। যাঁরা অবাস্তবতার কারণে রূপকথাকে বর্জন করার বিধান দেন, তাঁদের অপূর্ণ এবং নীরস জীবনবোধকে প্রত্যাখ্যান করার মতো মানুষের সংখ্যা যে কম নয়, 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র জনপ্রিয়তা তারই প্রমাণ। আসলে মানুষ কোনো মতবাদ খোঁজে না, মতবাদের জন্য বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকে আনন্দের আশায়; তার একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় হল আনন্দ। সেআনন্দ পূর্ণতার সমার্থক। প্রকৃত আনন্দ কখনো আত্মকেন্দ্রিক নয়; যাঁর বিশ্ব, যাঁর জীবনবোধ প্রসারিত নয়, সর্বব্যাপী নয় তিনি আনন্দের যোগ্য হয়ে ওঠেননি; বাইরের আরোপিত পরিচয় যাই হোক, বাঙালি, কলকাতা, যে আজও সেই আনন্দকে চিনে নিতে পারেন, প্রতি বছর শরৎকালে মহালয়ার ভোরে তারই প্রমাণ পাই। বুঝতে পারি, হুল্লোড় নয়, মানুষ খুঁজছে শান্তি। জীবনমুখী গানের সস্তা বিদেশীয়ানা নয়, মানুষ খুঁজছে প্রকৃত সঙ্গীত।

'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র বহিরাঙ্গিক বিশ্লেষণে এই প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। সঙ্গীতের ভূমিকা এই অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত পটভূমিকা হয়ে উঠেছে। নিবিষ্ট শ্রোতা ধীরে ধীরে কখন মগ্ন হয়ে যান এক দৈবী মহাজাগতিক সঙ্গীতময়তায় বুঝতে পারেন না। আসলে সমগ্র অনুষ্ঠানটি একটি এবং কেবলমাত্র একটিই সঙ্গীতের পূর্ণপ্রকাশ হয়ে উঠতে পেরেছে। কোনো বাণী নয়, কোনো ভাষ্য নয়—শুধুমাত্র এক, অখন্ড সঙ্গীত, যেখানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠও হয়ে উঠেছে, প্রথমেই বলেছি—আলোর বেণু।

এবার সেই রহস্যের গভীরে প্রবেশ করব। প্রবেশ করব, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আর পঙ্কজকুমারের সেই আশ্চর্য সুরলোকে।

আকাশবাণীরই এক প্রবীণ কর্মীর কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে অজস্র কাহিনির মধ্যে এটাও একটা। গল্পটা এইরকম।

তখনো টেপরেকর্ডিং করা অনুষ্ঠানের চলন হয়নি আকাশবাণীতে। সব অনুষ্ঠানই হত, যাকে বলে লাইভ। যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা এসে অনেক আগে থেকে বসে থাকতেন, মহড়া চলত। মহড়ার অবসরে চলত চা, পান, রঙ্গ রসিকতা। কেউ আড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন, কেউ বা ঘুরছেন, বাণীকুমার বসে আছেন রেকর্ডিং রুমে। ভাষ্য অংশ তখনও পাঠ করা হত স্বাভাবিক কথ্যভঙ্গিতে। সুর করে নয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব ধারায় চন্ডীপাঠ করছিলেন সুরেলা কণ্ঠে এবং হঠাৎ একটু অলস রসিকতার ছলেই বাংলা ভাষ্যটিও স্তোত্রের সুরের অনুকরণে বলতে শুরু করলেন এবং একটা মৃদু হাসির ছোঁয়া লাগল। কিন্তু বাণীকুমার দ্রুত

রেকর্ডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আরে আরে, কি হল? থামলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল! হোক, হোক না! ঐভাবেই'...

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আরে না না। একটু মজা করছিলাম...'

কিন্তু বাণীকুমার তখন গভীর আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'মোটেই না! দারুণ হচ্ছিল! ওইভাবেই আবার করতো শুনি।'

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আবার শুরু করলেন, 'দেবী প্রসন্না হলেন...'

দেবী প্রসন্না হলেন এবং বাংলা কথকতার ইতিহাসে সংযুক্ত হল এক নতুন মাত্রা!

নেহাৎ হাসির ছলে উঠে এলেও, ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না এবং এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যদি আমরা অনুষ্ঠানের অন্তর্গত গানগুলির রাগ নির্বাচনের সঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে ভাষ্য উচ্চারণের স্বরসমন্বয় একটু মিলিয়ে নিই।

অনুষ্ঠানের শুরু তিনবার শঙ্খধ্বনি দিয়ে এবং এরপরই সমবেত কণ্ঠে স্তোত্রগান 'যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী...' মালকোষ রাগে রচনা করে শান্ত রাত্রির এক মহাজাগতিক আবহ। মালকোষ রাগের প্রাণ স্বরূপ দুটি স্বর হল মধ্যম (মা) এবং ষড়জ (সা)। প্রতিটি রাগেরই এমন দুটি স্বর থাকে, যার শাস্ত্রীয় নাম বাদী স্বর ও সম্বাদী স্বর। বাদী স্বরটি হল প্রধানতম এবং সম্বাদী স্বরটির গুরুত্ব ঠিক তার পরেই। কিন্তু তাদের মধ্যে আরো নিগূঢ় একটা সম্পর্ক আছে, যাকে বলা হয় ষড়জ-মধ্যম ভাব, অথবা ষড়জ-পঞ্চম ভাব। অর্থাৎ যে-কোনো দুটি স্বর বাদী-সম্বাদী স্বর হতে পারে না। বাদী-সম্বাদী হতে গেলে তাদের মধ্যে ঐ ভাবের কোনো একটি থাকা চাই। যেমন সা বাদী হলে মা অথবা পা সম্বাদী স্বর হতে পারে। রে বাদী হলে পা অথবা ধা সম্বাদী হবে, গা বাদী হলে ধা অথবা নি সম্বাদী হবে।

এই যে দুটি স্বরের মধ্যে ষড়জ-মধ্যম বা ষড়জ-পঞ্চম ভাব, এর সঙ্গে আমাদের ভাবলোকের কি সম্পর্ক সে প্রশ্ন এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে। দুটি স্বরের মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকলে তাদের যুগপৎ ধ্বনি আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে যেন একটা আনন্দ অনুরণন সৃষ্টি করে। কিন্তু এই অনুরণনের সঙ্গে শব্দবিজ্ঞানের একটা স্পষ্ট যোগসূত্র বোধহয় খুঁজে পাওয়া যায়।

শব্দবিজ্ঞানের আলোয় আমরা শব্দকে বায়ুমন্ডলের ঢেউ বা তরঙ্গরূপে চিনি। এই ঢেউ-এর কম্পন যত দ্রুত, শব্দ ততই সরু, তীক্ষ্ণ। প্রতি সেকেণ্ডে বায়ুস্তর যতবার কম্পিত হচ্ছে, সেই সংখ্যাকে বলা হয় শব্দের কম্পাঙ্ক। অতএব বোঝা যায়, আদি-ষড়জ থেকে অর্থাৎ খাদের সা থেকে আমরা যতই তার ষড়জ-এর দিকে অর্থাৎ চড়া সা-এর দিকে যাব স্বরের কম্পাঙ্ক ততই বাড়তে থাকবে। প্রকৃত হিসেবে তার ষড়জ-এর কম্পাঙ্ক আদি-ষড়জের দ্বিগুণ এবং মধ্যবর্তী স্বরগুলির (রে, গা, মা, পা, ধা, নি) কম্পাঙ্ক হবে এদের মাঝামাঝি। বলাই বাহুল্য, প্রতিটি স্বরের মধ্যে কম্পাঙ্কের এক একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে। সাধারণভাবে এই অনুপাত হয় বেশ জটিল ভগ্নাংশে, শুধুমাত্র ষড়জ-মধ্যম এবং ষড়জ-পঞ্চমের অনুপাত ছাড়া। ষড়জ এবং মধ্যমের কম্পাঙ্কের অনুপাত 3:4 এবং ষড়জ ও পঞ্চমের ক্ষেত্রে এই অনুপাত 2:3; অনুপাতের এই সারল্য আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে একটা তৃপ্তির অনুভূতি সঞ্চারিত করে। আসলে যখন কোনো স্বর বেজে ওঠে, তখন আমাদের কানে তার দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ...কম্পাঙ্কের ধ্বনিগুলিও বেজে ওঠে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর প্রাবল্যে। যদি ষড়জ উচ্চারিত হয়, তবে তার সঙ্গে আমরা তার-ষড়জ, অতি-তার ষড়জ...অর্থাৎ পরবর্তী প্রতিটি স্বরসপ্তকের ষড়জকে ধ্বনিত হতে শুনব; কিন্তু তাদের প্রাবল্য যেহেতু দ্রুত হ্রাস পাবে, উচ্চতর কম্পাঙ্কের ষড়জগুলি আমাদের শ্রবণে আর ধরাই পড়বে না। ঠিক এইরকমই ঘটবে সমস্ত স্বরগুলির ক্ষেত্রে। রেখাব বাজলে তার পরবর্তী সপ্তকের রেখাবগুলি বাজবে। গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ—সবার ক্ষেত্রেও তাই। এই যে সব সহ-সুর (Over Harmonics) এদের আপেক্ষিক প্রাবল্যই বীণার সঙ্গে সরোদের, সেতারের সঙ্গে রবাবের ধ্বনিকে পৃথক করে দেয়। পৃথক করে দেয় ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর কণ্ঠকে। কিন্তু প্রতিটি স্বরের সহ-সুরগুলির মধ্যে এক লীলা চলতে থাকে, সঙ্গীতের

রসায়নে যার ভূমিকা অতি গভীর। ধরা যাক কোনো একটি স্বরের সঙ্গে আরেকটি স্বরের সঙ্গে অন্য একটি স্বর ষড়জ-মধ্যম ভাবে অবস্থান করে; অর্থাৎ তাদের কম্পাঙ্কের অনুপাত হবে 3 :4। অতএব প্রথম স্বরটির চতুর্থ সহ-সুর যেটি হবে, সেটিই হবে দ্বিতীয় স্বরটির তৃতীয় সহ-সুর!...এবং এই দুটি স্বর পাশাপাশি ধ্বনিত হলে তাদের সহ-সুরের যুগল মিলনে আমাদের শ্রবণে এক আশ্চর্য আনন্দরস সৃষ্টি হয়। ষড়জ-পঞ্চম ভাবের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু অন্যান্য যে-কোনো দুটি স্বরের মধ্যে কম্পাঙ্কের অনুপাতে সারল্য নেই বলে, প্রতিক্রিয়াটা আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে না। যেমন ষড়জ এবং শুদ্ধ রেখাবের কম্পাঙ্কের অনুপাতের কথাই ধরা যাক। এই অনুপাত প্রায় ৪ :9। অর্থাৎ ষড়জের নবম-সহ-সুর, রেখাবের অষ্টম সহ-সুরের সঙ্গে মিলে যায়; কিন্তু যেহেতু উচ্চতর ক্রমিক সংখ্যার সহ-সুরগুলির প্রাবল্য দ্রুত হ্রাস পায়, অতএব ষড়জ-রেখাব-এর ঐসব সহ-সুরের লীলা আমাদের শ্রবণে ধরাই পড়বে না। আর ঠিক এখানেই, একটি রাগে বাদী-সম্বাদী স্বরের গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে কোনো একটি রাগরূপায়ণের সমগ্র পটভূমিকাই রচনা করে ঐ যুগলস্বরের লীলা।

সমগ্র ‘মহিষাসুরমর্দ্দিনী’ অনুষ্ঠানটিই এমনি যুগলস্বরের এক লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। স্বর দুটি ষড়জ আর মধ্যম—মালকোষের সম্বাদী এবং বাদীস্বর। মালকোষ রাগাশ্রয়ী ‘যা চন্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী’...গানটির যে মধ্যম, তার সূচনা হচ্ছে প্রথম শঙ্খধ্বনিতে। হ্যাঁ, অনুষ্ঠানে মধ্যম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ঐ তিনবার শঙ্খধ্বনি দিয়ে। এরপর গান এবং গানের শেষে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে মধ্যমে ধ্বনিত হয় ‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর’। এরপর ‘ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা’ উচ্চারিত হয় কোমল ধৈবতে, ‘প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমনবার্তা’ কোমল নিখাদে এবং ‘আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীমছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নব ভাবমাধুরীর সঞ্জীবন’—উচ্চারণে তিনি স্থিত হন তার-ষড়জে। এরপর আবার ফিরে যান কোমল ধৈবতে, যখন উচ্চারণ করেন ‘তাই আনন্দিতা শ্যামলীমাতৃকার চিন্ময়ীকে’ এবং সবশেষে ‘মৃন্ময়ীতে আবাহন’ উচ্চারিত হয় সেই মধ্যমে। এই স্বরগুচ্ছ, অর্থাৎ ষড়জ, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, কোমল ধৈবত এবং কোমল নিখাদ মালকোষের আরোহণকে (এবং এর বিপরীত ক্রমে অবরোহণকে) সূচিত করে।

মালকোষ ভৈরবী ঠাটের রাগ। স্বরবিন্যাসের বিচারে মালকোষে রেখাব এবং পঞ্চম বর্জিত এবং অন্যস্বরগুলি ভৈরবী রাগের সঙ্গে এক। কিন্তু ভৈরবী একটি ‘সম্পূর্ণ’ শ্রেণিভুক্ত রাগ, অর্থাৎ এতে কোনো স্বরই বর্জিত নয়। ঔড়ব শ্রেণিভুক্ত মালকোষের স্বরগুচ্ছের সঙ্গে কোমল রেখাব এবং পঞ্চম স্বরদুটি যুক্ত হলে ভৈরবীর স্বরগুলি পাওয়া যাবে; অর্থাৎ ষড়জ, কোমল রেখাব, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত ও কোমল নিখাদ—এই হল ভৈরবীর স্বর। ...এবং অধিকন্তু, ভৈরবীরও বাদী ও সম্বাদী স্বর যথাক্রমে মধ্যম এবং ষড়জ—অর্থাৎ মালকোষের সঙ্গে হুবহু এক।

এরপরের গান ‘সিংহস্থা শশিশেখরা’ গানটিতে দুটি রাগের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আহির ভৈরব ও ভৈরবী। গানের প্রবেশ ঘটেছে আহির ভৈরবের পথ ধরে এবং অনায়াসেই; কারণ আহির ভৈরবেরও বাদী সম্বাদী স্বর মধ্যম এবং ষড়জ, যদিও এটি ভৈরব ঠাটের রাগ এবং এতে শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহৃত হয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ভাষ্য যেখানে মধ্যমে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকে ষড়জ শুরু হচ্ছে ‘সিংহস্থা শশিশেখরা’। আহির ভৈরব থেকে গানটি প্রবেশ করেছে ভৈরবীতে। এই দুটি রাগের মিশ্রণ এত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে অবাক হতে হয়। এর পরে আবার ষড়জ আর মধ্যমে কথকতা এবং তারপর সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে ভৈরবীতে বেজে ওঠে সেই অবিস্মরণীয় আলোর বেণু!

পরের গানটিও ভৈরবীতে—‘জাগো দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী’, শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। এর পরের গানগুলিও যদি ক্রমানুসারে সাজাই তবে তাদের রাগানুক্রম হবে এই রকম—মালকোষ, বিভাস, শুদ্ধকল্যাণ, দেশী, পীলু, আহিরভৈরব, ভৈরব, মাঝখাম্বাজ, সোহিনী ও পূরিয়া মিশ্রণ, ভৈরবী, আহির ভৈরব ও ভৈরবী মিশ্রণ, সোহিনী, বসন্ত, আহির ভৈরব ও পরিশেষে আবার ভৈরবী।

'তব অচিন্ত্য রূপ-চরিত মহিমা'—গানটি বিভাস রাগে, যার বাদী স্বর কোমল ধৈবত এবং সম্বাদী শুদ্ধ গান্ধার। এর আগের গানটি শিপ্রা বসুর গাওয়া 'ওগো আমার আগমনী আলো' মালকোষ রাগাশ্রয়ী, মধ্যের ভাষ্যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মালকোষের মধ্যম ও ষড়জ এবং প্রায়ই কোমল ধৈবতে বিচরণ করেছেন, যা বিভাসের বাদীস্বর। ভাষ্য শেষ করেন কোমল গান্ধারে এবং পরক্ষণেই মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থিত হন কোমল ধৈবতে, যা শুধু বিভাসের বাদী স্বরই নয়, কোমল গান্ধারের সঙ্গে যার ষড়জ-মধ্যম ভাব। ফলত এই প্রবেশ আবার হয়ে ওঠে মসৃণ, অনায়াস। এরপর অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিভাস এবং কোমল গান্ধারের স্থানাভিষিক্ত হয় শুদ্ধ গান্ধার, যা তার সম্বাদী স্বর। বিভাসের শেষেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ভাষ্য ষড়জ থেকে দ্রুত উঠে যায় মধ্যসপ্তকের শুদ্ধ ধৈবতে, যা পরবর্তী গান 'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা'র আশ্রয়ী রাগ শুদ্ধকল্যাণের সম্বাদী স্বর।

এরপরের কথকতায় প্রবেশ ঘটেছে আবার মধ্যমে ত্রয়ী শঙ্খধ্বনি দিয়ে এবং পরক্ষণেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠ বেজে উঠছে পঞ্চমে, যা পরবর্তী গান 'অখিল বিমানে তব জয়গানে'র আশ্রয়ী রাগ দেশীর বাদী স্বর। গানটির পরে আবার মধ্যমে একবার শঙ্খধ্বনি এবং তাকে অনুসরণ করে সমবেত কণ্ঠে পীলুর বাদী স্বর কোমল গান্ধারের অনুরণন—শুরু হয় 'জয়ন্তী মঙ্গলাকালী'। পীলু থেকে আবার প্রত্যাবর্তন আহির ভৈরবে সেই মধ্যমের এবং ষড়জের লীলায়। আহির ভৈরব থেকে ভৈরব, মাঝখাম্বাজ, সোহিনী, ভৈরবী, আহির ভৈরব ও ভৈরবী মিশ্র, সোহিনী হয়ে 'অমল কিরণে ত্রিভুবন মনোহারিণী'—বসন্ত এসে যায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠে।

শরতে কেন হঠাৎ এই অকাল বসন্তের আবাহন? প্রশ্ন হতেই পারে। কথিত আছে, আদিতে দুর্গাপুজো হত বসন্তকালেই। সোহিনী বা বসন্তের ছোঁয়া কি তারই স্মৃতিতে? আবার এও তো সত্যি, বসন্ত এক সুগভীর আনন্দের বার্তাবহ। শীতের রিক্ততাকে মুছে দিয়ে সেধরণীকে সাজায় নবজীবনের সাজে, নিয়ে আসে নতুন আশার আলো। মহিষাসুররূপী পাপের গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার পরে তাই হয়ত বা প্রকাশিত হয় বসন্তের আনন্দ!

বসন্তের মধ্যম তীব্র। আনন্দের এই তীব্রতাকে স্পর্শ করে বিশ্বজগত আবার ফিরে আসে আহির ভৈরবের শুদ্ধ মধ্যমে। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী—যা একবার উচ্চারিত পীলুর শৃঙ্গারে, এবার ফিরে এল আহির ভৈরবের মৃদুতায়।

সব শেষে, 'শান্তি দিলে ভরি'। ভৈরবীর রূপ এখানে প্রশান্ত, বিশ্বপরিব্যাপী!

এই অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত স্বরসঙ্গতি প্রসঙ্গে হয়তো আরো অনেক অনেক কথাই বলার থেকে গেল। কেউ হয়তো বলবেন কোনোদিন। শুধু বলা হয়নি, শুধু স্বরসঙ্গতিই নয়, রাগের পারম্পর্য নির্বাচনে ভাবের সঙ্গতিও বিস্ময়কর। মালকোষের নৈশ প্রশান্তি, ভৈরবীর আলোকাভা, তার সঙ্গে আহির ভৈরবের মৃদু শৃঙ্গারস্পর্শ, বিভাসের মন্দির-সুরভি, শুদ্ধ কল্যাণের মগ্ন উপাসনা, দেশীটোড়ির স্নিগ্ধ কুয়াশাবৃত প্রভাতী বিভা, ভৈরবের ধ্যানমগ্নতায় ভোরের জাগরণ, মাঝ-খাম্বাজ সোহিনী আর বসন্তের আনন্দশৃঙ্গার—সব মিলিয়ে এ এক আশ্চর্য আলোর বেণু। এ সুর ভোলার নয়। এ সুর আর নানা সুরের বিচ্ছিন্ন সমন্বয় মাত্র নয়, একটিমাত্র সুরের পূর্ণতায় প্রকাশিত, যার নাম 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'। তবু এও যেন হিসাবের কথাই বলা হল; শুধু একটা বিষয় কোনো হিসাবের মধ্যেই আনা যাবে না। সেটা হল আনন্দের গভীর থেকে উঠে আসা ঐ কান্নার অব্যক্ত অথচ অপ্রতিরোধ্য ভাষা, প্রতিটি শ্রোতার হৃদয়ে যা আজও অম্লান হয়ে আছে। স্মরণ করুন মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীতে আবাহনের সেই অশ্রুরুদ্ধ আর্তি, 'জাগো...জাগো মা...।'

শারদোৎসবের তখন আর শুধু উৎসবমাত্র নয়, সামাজিক সর্বজাতি সম্মিলন শুধু নয়, তার চেয়েও গভীর আরো কিছু, যার স্পর্শ পেয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, যার স্পর্শ আমাদের ভোলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে নিরন্তর, অনলসভাবে। শুধু কণ্ঠ নয়, শুধু প্রজ্ঞা নয়, শুধু সাঙ্গীতিক চেতনা নয়—একমাত্র ভক্তিই মানুষকে এত সুগভীর আবেগে সঞ্জীবিত করতে পারে। মহিষাসুর বধের কাহিনির গভীরে যে রূপকই থাক, অনুষ্ঠানটিতে

তার চেয়েও আরো অনেক বড় হয়ে উঠেছে, নিখিল বিশ্বের এক চিন্ময়ী সত্তা—যিনি আনন্দস্বরূপা, মুক্তিস্বরূপা।

এ অনুভবকে সমাজতাত্ত্বিকতার সঙ্কীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ করার চেষ্টা অর্থহীন। এর পরিমন্ডল আরো অনেক পরিব্যাপ্ত, পূর্ণ। অনন্তপ্রসারী এ অনুভবের আধার যে হিরন্ময় পাত্র, তার নাম ধর্ম। তার স্থিতি সত্যে, তাই যুগযুগান্তের আক্রমণেও তা ধ্বংস হয় না কোনোদিন। শুধু ধুলো মুছে প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে শুধু এই কাজটুকু করার জন্য ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন। সেকাজ তিনি সম্পূর্ণ করে গেছেন।

লেখকের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত